# আলোচনা-প্রসঙ্গে

## পঞ্চদশ খণ্ড

সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস

# আলোচনা-প্রসঙ্গে

( শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের সহিত কথোপকথন )

পঞ্চদশ খণ্ড

সঙ্কলয়িতা—শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস, এম-এ

প্রকাশক ঃ
শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
সৎসঙ্গ পাব্লিশিং হাউস্
পোঃ সৎসঙ্গ, দেওঘর

প্রথম প্রকাশঃ তালনবমী, ১৩৯৩

বাইন্ডার ঃ
কৌশিক বাইন্ডিং ওয়ার্কস্
কলিকাতা—৭০০ ০১২

মুদ্রাকর ঃ
কাশীনাথ পাল
প্রিন্টিং সেন্টার
১৮বি ভুবন ধর লেন
কলিকাতা—৭০০ ০১২

# আলোচনা-প্রসঙ্গে

২রা অগ্রহায়ণ, ১৩৫৫
বৃহস্পতিবার (ইং ১৮।১১।৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল বাংলোর উত্তরদিকের বারান্দায় পরম প্রশান্ত মনে পূত শুভ্র শয্যায় সুখাসীন। তিনি বাসুদেবদা (গোস্বামী)-কে দেখে উল্লসিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন—কি রে। কি খবর?

বাসুদেবদা—আজ্ঞে ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোকে দেখলে অনন্ত, তোর বাবা, মা ইত্যাদির কথা মনে হয়। পাবনার কথা মনে পড়ে। সেই সঙ্গে-সঙ্গে মা'র মুখখানা ভেসে ওঠে। তোদের দেখলে তাই ভাল লাগে। সুযোগ পেলেই চ'লে আসবি।

বাসুদেবদা—আমারও খুব আসতে ইচ্ছা করে। আপনাকে দেখলে কী যে ভালো লাগে!

শ্রীশ্রীঠাকুর—কাজকাম কেমন হ'চ্ছে?

বাসুদেবদা—দীক্ষা অল্পসল্প হ'চ্ছে। একজনকে দীক্ষা দিয়েছি, সে বড় বেয়াড়া লোক। আমাকে নানাভাবে ফাঁকি দিতে চায়। তার প্রকৃতিই অমন। আমার মন-মেজাজ খারাপ করে দেয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এমন কিছু ক'রো না যাতে তোমার প্রতি তার বা কারও শ্রদ্ধা নষ্ট হয়। সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায় নিয়ে নিষ্ঠাসহকারে এমনভাবে চলতে হয় যাতে তোমার প্রতি প্রত্যেকে আরো আকৃষ্ট হয়। একটা মানুষকে মানুষ করতে গেলে কতখানি কষ্ট করতে হয়, ত্যাগ-স্বীকার করতে হয় তার জন্য। তাতেও অনেকে ফেরে না। তবু নিজের অস্তিত্ব বাঁচিয়ে যথাসম্ভব করা লাগে। এখন তোমার কাছে যাতায়াত করে, তোমার 'পরে শ্রদ্ধা হারালে তা'ও হয়ত আসবে না। বাইবেলে আছে, হারান মেষের জন্যই তাঁর চিন্তা বেশী। কোথায় বাঘে

খায়, কি শিয়ালে খায়, কি ভালুকে খায়—সেইটেই ভাবনার বিষয়। তোমার পালে থাকলে তবু তুমি আগলে রাখতে পার। তোমার প্রতি শ্রদ্ধা যার যতখানি গভীর হয়, তোমার প্রতি অনুবর্ত্তিতা ও সেই সঙ্গে সঙ্গে ইষ্টানুবর্ত্তিতাও তার তত গভীর হতে থাকবে। তাই, মানুষের শুভ শ্রদ্ধা যাতে বেঁচে থাকে, তা' করতে হয়। 'শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্'। সেই শ্রদ্ধা দিয়েই মানুষ প্রাজ্ঞ হয়, বাঁচে অজ্ঞান থেকে, অশান্তি থেকে, বিনাশ থেকে। তোমরা যারা ঋত্বিক, এমন-কি সাধারণ সৎসঙ্গী, তাদের চালচলন, কথাবার্তা এককথায় সেবাসম্বর্দ্ধনা যত শ্রদ্ধা-উৎসারিণী হয়, তত তোমাদেরও ভাল, অন্যেরও ভাল। তোমাদের ভাল ক'রে তোলাই চাই, সে যত খাটুনিই হোক।

বাসুদেব-দা—এ ত বড় কঠিন ব্যাপার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এ ত বরং সোজা ও স্বাভাবিক। মানব-সমাজকে সুস্থ ও উন্নত ক'রে তোলবার জন্য আমি যা' যা' বলছি, তার প্রত্যেকটা যদি কাঁটায়-কাঁটায় না কর, তাহ'লে দেখতে পাবে অদূর ভবিষ্যতে এমন দিন এসে হাজির হবে, যখন জনসাধারণের অস্তিত্বরক্ষাই দুরূহ হ'য়ে উঠবে। তোমাদেরও সে-আবর্ত্ত থেকে রক্ষা পাওয়া কঠিন হবে।

প্রফুল্ল—আপনি ত বলেছেন—যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি, করলে কাটে মহাভীতি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যজন ও ইষ্টভৃতির সঙ্গে যাজনের কথাও বলা আছে। তোড়ের সঙ্গে করা লাগবে সবগুলিই। নইলে বিপর্য্যয় এড়াতে পারবে না। আর, যাজন করতে গেলে আমার সব কথাই এসে পড়বে। সেগুলি বুঝতে হবে, করতে হবে এবং সেই সঙ্গে-সঙ্গে নিরন্তর চারাতে হবে দুনিয়াময়। আমিও পরমপিতার কথাকে ছোট একটা গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ ক'রে রাখার কথা বলি নি। ভাল চাও ত, পোকাটা-মাকড়টার স্বার্থকেও নিজের স্বার্থের অঙ্গীভূত ব'লে মনে করো।

বলতে বলতে শ্রীশ্রীঠাকুর এক নির্বাক সমাহিতভাবে মগ্ন হ'য়ে

গেলেন। এক অপার্থিব জ্যোতির ঝলকে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠলো তাঁর শ্রীমুখমণ্ডল।

তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর পর পর দুটি বাণী দিলেন।

কর্ম্ম-সম্বন্ধে কথা উঠতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কাজ করতে গেলেই দেখতে হবে যাতে তা' প্রতিপদক্ষেপে ধর্ম্মের পরিপূরণী হয়, তাহ'লেই সে-কাজ সর্বতোভাবে সার্থক হ'য়ে ওঠে। প্রবৃত্তির খেয়ালমত আবোল-তাবোল করলে তা' দুর্ভোগই ডেকে আনে।

জনৈক দাদা তাঁর নানাবিধ শারীরিক উপসর্গের কথা ব'লে কাতর-ভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে একটা বিধান চাইলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—অর্জ্জুন, গুলঞ্চ, ছোট চাঁদা, বেড়েলা,হরিতকী, বয়ড়া, আমলকী, কটকী প্রত্যেকটি সিকি তোলা পরিমাণ নিয়ে আধ সের জলে সিদ্ধ করে আধপোয়া থাকতে নামিয়ে রোজ একবার কিম্বা দুবার খেলে কোষ্ঠকাঠিন্য ও লিভারের দোষসম্বলিত ব্লাড-প্রেসারে উপকার হয়। প্রত্যেকটি সিকি পরিমাণ দেওয়াতে পায়খানা যদি রীতিমত পরিষ্কার না হয়, তবে হরিতকী, আমলকী, বহেড়া চার আনা স্থলে ছয় আনা কিম্বা ততোধিক পরিমাণ নিতে হবে।

৬ঠা অগ্রহায়ণ, ১৩৫৫ শনিবার (ইং ২০।১১।৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল বাংলোর বারান্দায় ব'সে পর পর বহু বাণী দিলেন।

বেলা প্রায় ১১টার সময় বাণীগুলি অনেকের সামনে প'ড়ে শোনান হ'লো।

নিরঞ্জনদা (সেন) বললেন—আর একটু সহজ ভাষায় বললে আমরা বুঝতে পারি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সহজও ঢের আছে। আর, আখ না চিবালে রস পাবি কি করে? দাঁতে না প্যারিস্, শিলে ছেঁচে খা। শালা! ছোলা চাটলে কী হবে? চিবোতে হয়। শুধু চাটতে গেলে জিভ কেটেও যেতে

পারে। ভালো করে ধ্যান করে বোঝ্, তলিয়ে দেখ্, কী বলা আছে।

প্রফুল্ল একটা লেখা ধীরে-ধীরে কয়েকবার পড়ুক্। তুই মন দিয়ে শোন্। দেখ্ ত বুঝতে পারিস্ কিনা।

পড়া হলো—

শয়তান যখন তার রোল রাজত্ব বিস্তার ক'রে
শাসন চলাতে থাকে—
মরণকে সার্থক করতে,
নিঃশ্বাসকে নিঃশেষ করতে,
জীবনের সামহোতা যাঁরা
স্তিমিত চলনেই চ'লে থাকেন,
আর মানুষের অন্তরকে
অভিষিক্ত করে চলেন
গা ঢাকা দিয়ে আড়ালে তখনও;
মনে হয় হঠাৎ কোত্থেকে
জীবনের আগুন জ্বলে উঠলো—
নিষ্ঠার সমিধে,
হোতার ইষ্টমন্ত্রে,
ঐক্য ও সংহতি—হবিঃপ্রক্ষেপে;
অন্তর আবার স্বর্গ হয়ে ফুটে উঠলো,
পাপ পুড়তে থাকলো সেই আগুনে,
জীবন চললো উচ্চেতনায়—
সংমান্ত্রিক অভিষ্যন্দে।

দুবার পড়ার পর নিরঞ্জনদা বললেন—অভিষ্যন্দ মানে কী?

প্রফুল্ল—আধিক্য বা স্ফীতি।

নিরঞ্জনদা—আমি এখন মোটামুটি বুঝতে পেরেছি। নিজে-নিজে কয়েকবার পড়লে আরো ভালো বুঝতে পারব। ভেবে-ভেবে বার-বার পড়লে প্রধান বক্তব্যটা বোধ করা যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরমপিতার দয়ায় এমন মাল সব দেওয়া থাকলো যে যদি মাথায় ধরে, এর এক একটা নিয়ে দুনিয়া তোলপাড় করে ফেলতে পাড়বি। তাঁর মরজিতেই এগুলি আসছে। তোরা এখন কাজে লাগাতে পারলে হয়। তবে ধরা থাকছে, এইটেই মস্ত লাভ। আমার সব কিছু কওয়াই বাস্তব অভিজ্ঞতাও অনুভবের উপর দাঁড়িয়ে। তাই, জিনিষগুলি নিজের সাথে বা অবস্থার সাথে মিলিয়ে পড়লেই সহজে বোঝা যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যার পর বড়াল-বাংলোয় ঘরে আনন্দঘন ভঙ্গিমায় বসে আছেন। ভক্তবৃন্দ তন্ময় হ'য়ে তাঁকে দর্শন করছেন। তিনি মনোজ্ঞ ছন্দে হাত নেড়ে বললেন—আমি যখন বলি বেঁচে থাক, তার মানে be motile অর্থাৎ গতিসম্পন্ন থাক। আত্মস্থ থাক। জীবন মানে প্রাণন, প্রাণন মানে বাঁচন, বাঁচন মানে গতি। এই গতি ইষ্টাভিমুখী হলে মানুষ সুখসন্দীপ্ত হয়ে ওঠে। ফলকথা, সক্রিয় ইষ্টযোগযুক্ততাই সার্থক বাঁচা!

শ্রীশ্রীঠাকুর চুনীদা (রায় চৌধুরী), শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), সুধীরদা (বসু), ও প্রবোধদা (মিত্র)কে উৎসাহ দিয়ে বললেন—Play your pen rationally with all aptitude (বিহিত প্রবণতা ও যুক্তি সহকারে কলম চালাও)। লেখার প্রসঙ্গে কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), গোপালদা (মুখোপাধ্যায়), ব্রজগোপালদা (দত্তরায়), পঞ্চাননদা (সরকার), সুশীলদা (বসু), হেম কবি (মুখোপাধ্যায়), হিরন্ময়দা (মুন্সী), প্রভাসদা (চৌধুরী), হরিদা (গোস্বামী), সুরেশদা (মুখোপাধ্যায়), অশ্বিনীদা (বিশ্বাস), সতীশদা (দত্ত জোয়ারদার), করুনাদা (মুখোপাধ্যায়), পূজনীয় মণ্টুদা (মৈত্র) প্রভৃতির কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এক-একজনের মেকদার এক-এক রকমের। যার নিষ্ঠা ও প্রত্যয় যত গভীর, তার লেখা তত কার্য্যকরী হয়।

প্রফুল্ল—অল্প বয়সেই পূজনীয়া সাধনাদির লেখার ক্ষমতা খুব দেখা গিয়েছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার উপর ওর খুব নেশা ছিল। ভক্তিভাব চারানর জন্যই ও যা'-কিছু করত। আশ্রমের মেয়েদের কেমন এইভাবে একগাটটা

করে তুলেছিল। ওর কলমে যেমন জোর ছিল, স্বভাবও ছিল তেমনি মধুর ও সুন্দর। ওর উপর সবারই খুব শ্রদ্ধা ছিল। অকালে চলে গেল। ওর কথা মনে পড়লেই মন খারাপ হয়ে যায়। —বলতে বলতে তাঁর চোখে মুখে, কণ্ঠস্বরে এক করুণভাব ফুটে উঠলো।

কিছু সময় পরে মায়েদের সঙ্গে রান্না-খাওয়ার কথা উঠলো। শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—রান্না-খাওয়া একঘেয়ে রকমে হওয়া ভাল না। যা' জোটে তার মধ্যেই রকমারি করতে হয়। তাতে মাথা খোলে, রান্নার কাজটাও আনন্দজনক মনে হয়। খাদ্য যদি বৈচিত্র্যপূর্ণ, স্বাদু, সহজপাচ্য ও স্বাস্থ্যকর হয়, তবে যারা খায়, তাদের শরীর মনের পক্ষেও ভাল হয়। বিভিন্ন রসের ক্ষরণে সুপ্তগুণের বিকাশেও সহায়তা হয়।

পূজনীয়া প্রতিভা মা (ছোট খুড়ী মা)—জলখাবার ব্যাপারেও এক-ঘেয়ে রকম এসে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওতেও মাথা খাটাতে হয়। ...আমার মনে হয় মুড়ি, ঢেপের খই, ভট্টার খই, (শক্ত বাদ দিয়ে) ভুরোর খই, কাওনের খই, খই, সরু আদা কুচোন ভাজা, সরু মান কুচোন ভাজা, সরু আলু কুচোন ভাজা, সরু কাঁঠালের বীচি কুচোন ভাজা, সরু নারকেল কুচোন ভাজা, আখরোট বা কাঠবাদাম কুচোন, একটু লঙ্কা গুঁড়ো, একটু সরষের গুঁড়ো, একটু দারচিনির গুঁড়ো, খুব অল্প একটু জিরের গুঁড়ো একসঙ্গে মিশিয়ে, ভাল তেল, অল্প নুন দিয়ে খেতে বেশ ভাল লাগে।

রানীমা—এত সব জোগাড় করাই ত কঠিন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেসব জিনিষ সহজে জোগাড় হয়, তাই দিয়েই কত রকম করা যায়। মাথা খাটাতে হয়। মা-বাবার যদি স্ব স্ব ক্ষেত্রে গবেষণা বুদ্ধি থাকে, তবে ছেলেমেয়েদের মধ্যেও ঐ ভাব ঢুকে যায়।

৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫৫, রবিবার (ইং ২১।১১।৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় আছেন। সুশীলা মা (বিশ্বাস) এর ছেলে মারা গেছে। তিনি শোকাকুল হয়ে কাঁদতে-কাঁদতে

নানা কথা শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে বলছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ব্যথাহত হৃদয়ে সাশ্রু নয়নে নীরবে কথাগুলি শুনলেন। পরে দরদভরা কণ্ঠে বললেন—ভগবান ত দয়া করেন খুব, কিন্তু আমরা যে দয়ার বিরোধিতা করি বড় বেশী। আমাদের বুদ্ধি হয়ে গেছে, যে করে তার জন্য করি না। একজন করছে প্রাণপণে, খাওয়াচ্ছে, পরাচ্ছে, বাঁচাচ্ছে, কিন্তু কথা কয় না, চুপচাপ করেই চলে অক্লান্ত ভাবে। আমরাও তাই তার দিকে তাকাই না। অন্য জিনিষ নিয়ে মুগ্ধ হয়ে থাকি, কাম-কাঞ্চন মান-যশ কত কিছুর পিছনে-পিছনে ঘুরি। তার পানে আকৃষ্ট হই না, তাকে মুখ্য করে ধরি না, তাকে আমল দিই না। ওতে তার দেওয়াটা নিতে পারি না। কিন্তু তাও ত সে দেখে, কোন অবস্থায় ত্যাগ করে না, পিছনে পিছনে থাকে। ছেলে ঘুরে বেড়াত। হয়ত এখনও সে ঘুরে বেড়ায়।

সুশীলা মা—বুঝতে পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হয়ত কিছুটা বুঝতেও পারিস্, দেখতেও পারিস্, কিন্তু মন ভরে না। আমি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কতরকমে বললাম—ছেলেকে এখান থেকে নিস্ না, কিন্তু তুই বুঝলি না। তাকে পূরণ করার সুখ নিয়ে মেতে রইলি আমার কথাটা তলিয়ে গেল। তখন বেশী কওয়ার ভরসা হয় নি। কারণ, কথা না শোনার দরুণ হয়ত তোদের আরো খারাপ হতে পারত। কিন্তু আমি সন্দেহ-সঙ্কুল মন নিয়ে কাল কাটাতে লাগলাম, জানতাম দুর্দ্দৈব আছে কপালে।

সাধনাকে সেইবার শ্বশুর বাড়ী পাঠাবার ইচ্ছা আমার ছিল না, পরিণাম কী হতে পারে বুঝতাম, কিন্তু অবস্থা এমন দাঁড়ালো, যে পাঠান লাগলো। ভেল্‌কুর মাকেও বারণ করলাম ভেল্‌কুকে তখন শ্বশুর বাড়ী পাঠাতে। কিন্তু ভেল্‌কুর মার মেয়েকে শ্বশুর বাড়ী পাঠাবার সে কি ঝোঁক! আমার কথা কানেই তোলে না। আমাকে বার-বার বলতে লাগলে প্রীতি-বাধ্যতায় না-শুনে পারি না। কী করব, আমি যে নিরুপায়। অনেক দিক, অনেক দূর ভেবে আমাকে চলতে হয়। প্রত্যেকের বেলায়ই অমনি রকম দাঁড়ায়। কী করব, আমার হাত নেই।

যে যায়, সে অমনি করেই যায়। সেই তুমি এখানে এলে, কিন্তু আমাকে জখম করে এলে। তুমি ত জখম হইছই, আমাকেও জখম করিছ। আজ তুমি বলছ—কোথায় দাঁড়াব ? সে ত বড় কথা নেয় ! কত ঠকাই ঠকেছে মানুষ, পরমপিতা আমার মুখ দিয়ে যা বলিয়েছেন—তা না শোনায়। তাদের সে ঠকা মানে আমারই ঠকা। (ছলছল চোখে) তোমাদের সবার দুঃখ শোক এই বুকখানায় দুর্ব্বহ বোঝার মত চেপে থাকে। কিছুক্ষণ নির্ব্বাক থাকার পর বললেন—আসল কথা, অনুবর্ত্তী বা অনুবর্ত্তিনী না হলে পারা যায় না। কথা না শুনলে তার উপর হাত থাকে না। আমারও যেমন হাত নেই, তোমাদের আশ্রয়ে যারা আছে, তাদের উপরও তোমাদের কোন হাত নেই যদি তারা তোমাদের কথা না শোনে। তাই শ্রেয়-আনুগত্য অপরিহার্য্য।

সুশীলা মা—আমারই বুদ্ধির ভুল।

অনেকে ছিলেন। এখন প্রমথদা (দে), মহিমদা (দে), সুরেশ (রায়) প্রভৃতি এসে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করলেন। অন্য প্রসঙ্গ উঠলো।

সুরেশ—আপনার লেখাগুলি পড়ার সময় মনে একটা সদ্ভাবের উদয় হয়, পরে তা' থাকে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ব্যাস্, বশিষ্ঠ, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব, যীশু, চৈতন্য থেকে রামকৃষ্ণদেব পর্য্যন্ত কম কথা ত বলে গেলেন না। তাতে ত বিশেষ কিছু হয় না। আসল কথা মানুষের চরিত্র। আর সেই চরিত্র জাগে তাঁদের অনুরাগমুখর অনুসরণে। ছড়াই ত বললাম এক মহাভারতের মত। কিন্তু ক'টা মানুষ যদি হ'ত, যাদের চরিত্রে ওগুলি মূর্ত্ত, কথাগুলির চেহারা ফুটে উঠেছে বাস্তবে যাদের ভিতর, তাতে যা হ'তো, শুধু ছড়ায় কি তা হবে ? ছড়া বলে কথা নয়, সব লেখা সম্বন্ধেই এই কথা নিরবচ্ছিন্ন অনুশীলন চাই।

৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫৫, মঙ্গলবার (ইং ২৩।১১।৪৮)

যতিদের জন্য যে টিনের ঘর উঠছে সেখানে শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে এসে একটি চেয়ারে ব'সে কাজকর্ম দেখছেন এবং সুধীরদা (দাস)কে প্রয়োজনমত নির্দ্দেশ দিচ্ছেন। পরম পূজনীয় বড়দা কাছে আছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচায্য), রাজেনদা (মজুমদার) প্রভৃতিও উপস্থিত। দয়ালের মুখে প্রসন্ন মধুর হাসির ছটা। অপার তৃপ্তিতে ভরপুর তাঁর অন্তর। তাঁর মধুক্ষরা আয়ত আঁখিযুগলে শিশুর কৌতূহলী দৃষ্টি।

বড়দা ও কেষ্টদা কাজকর্ম্ম সম্বন্ধে কথা বলছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর আগ্রহভরে শুনছেন সে কথা। কথায় কথায় কেষ্টদা বললেন, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার নাকি রামকৃষ্ণ দেব সম্বন্ধে বলতেন—তাঁর সব ভাল, কিন্তু organising power (সংগঠনী ক্ষমতা) নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Organisation (সংগঠন) বলতে এরা বোঝে সোনার পিতলে ঘুঘু। অথচ ঠাকুর নীরবে, নিভৃতে যা ক'রে গেছেন, তার ঢেউ চলছে, চলবেও। আপনাদের ঋত্বিক-সংগঠনের কথা যা বলেছি। এখন লোকে হয়ত তার বিকশিত রূপ সম্বন্ধে কিছুই বুঝতে পারছে না, কিন্তু যদি ঠিকমত করে চলেন, দেখতে পাবেন কালে কালে কী অসম্ভব কাণ্ড ঘটে।

একটু পরে বিভিন্ন রাজ্যে প্রাদেশিকতার প্রসার সম্পর্কে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বেহারী, বাঙ্গালী, আসামী বুঝি না, চাই প্রকৃত আদর্শপ্রাণতা ও ধর্ম্মভাবের জাগরণ, যাতে সব প্রদেশের সব সম্প্রদায়ের, সব লোক পরমপিতার প্রতি অনুরাগে বান্ধববন্ধনে আবদ্ধ হয়ে ওঠে। এখন মারামারি করলে অন্যের আহার হয়ে পড়ব। যদি আত্মসংস্থ থাকতে চাই, তবে মূল ঠিক রাখতে হবে। সেই sentiment (ভাবানু-কম্পিতা) উস্কে দিয়ে সবাইকে integrate (সংহত) করতে হবে।

defect ( দোষ ) আমাদের প্রায় প্রত্যেকেরই আছে, তা' সত্ত্বেও defect ( দোষ )কে বড় করে ধ'রে ত লাভ নেই। সেটা আমাদের interest ( স্বার্থ ) নয়। আমাদের interest ( স্বার্থ ) বাঁচা। তার লওয়াজিমা ও তদনুকূল পরিবেশনের উপর জোর দিতে হবে। ভারতবর্ষ হিসাবে যদি দাঁড়াও, তবে তুমি মানে এত বড় ভারতবর্ষ। প্রত্যেকটি ভারতবাসী তোমার আপনজন, তুমি প্রত্যেকটি ভারতবাসীর আপনজন। এইভাবে inter-interested ( পরস্পর স্বার্থান্বিত ) হলে প্রত্যেকের বুকের বল বেড়ে যায়, সারা দেশ মহাশক্তিমান হ'য়ে ওঠে। একজন আসামী যদি ভারতের প্রেসিডেন্ট হন, তিনি বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, বোম্বাই ইত্যাদি সবটারই প্রেসিডেন্ট হলেন। যে-কোন প্রদেশের লোকই সারা ভারতের প্রেসিডেন্ট হতে পারেন, প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন। আমার কথা হলো—আসাম বাংলা সম্বন্ধে গৌরব করবে আমার বাংলা বলে, বাংলাও তেমনি আসামের ব্যাপারে। প্রত্যেকটা province ( প্রদেশ)কেই মনে করবে আমার province (প্রদেশ) বলে। এই সুকেন্দ্রিক প্রীতি ও উদারতার প্রসারই সৎসঙ্গের কাজ।

৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫৫, বুধবার (ইং ২৪।১১।৪৮)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর বারান্দায় তক্তপোষে মূর্ত্তিমান আনন্দরূপে আসীন। কী যেন এক দুর্নিবার আকর্ষণ তাঁর। কাছে আসলে আর উঠতে ইচ্ছা করে না। মনে হয়, সর্ব্বইন্দ্রিয় দিয়ে মনোমন্দিরে তাঁর অপরূপ রূপ নিত্যকালের জন্য মুদ্রিত ক'রে রাখি। বঙ্কিমদা (রায়), ব্যোমকেশদা (ঘোষ), প্রবোধদা (মিত্র) প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত।

প্রফুল্ল আসতেই শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন, আমি প্রবোধকে বলছিলাম একটা দিন স্মারিণী খাতা করার কথা। তার মধ্যে একপাতায় থাকবে 'কবে কী করতে হবে' এবং ঠিক তার পাশের পাতায় থাকবে 'কখন কী

করা হলো'! এই ভাবে রোজ হিসাব মিলিয়ে দেখবে—যে সময়ে যা করা উচিত ছিল, সময় মত কিংবা তার আগেই তা করে ফেলছে, না পিছিয়ে পড়ছে, দেরী করে ফেলছে। যদি পিছিয়ে চলে তবে নিজেকে adjust (নিয়ন্ত্রণ) করে, সময়মত বা উপযুক্ত ক্ষেত্রে আগাম চলার জন্য প্রস্তুত হতে থাকবে। প্রধান যারা, তাদের প্রত্যেকেরই এটা ব্যক্তিগত-ভাবে করা দরকার। আর, এই করায় পশ্চাদপসারিণী চিন্তার অভ্যাস হবে। তাতে জাতিস্মরতার পথ উন্মুক্ত হয়। পাবনায় হলে আমি কতগুলি 'স্মারিণী' খাতা ছাপিয়ে ফেলতাম।

প্রফুল্ল—সময়মত কাজ করার কথা যে বলছেন, ধরুন আপনি তিন হাজার কৃষ্টিবান্ধবের কথা বলছেন। এতে একজন হয়ত সাধ্যমত কিছু-কিছু করছে। একজন আপ্রাণ করেও ত কিছু করতে পারে না। সে হয়ত ১০০ জন কৃষ্টিবান্ধব সংগ্রহের দায়িত্ব নিতে পারে। সে যদি উপযুক্ত সময়ে তা করেও, তা হলেও আপনার উদ্দেশ্য ত যথাসময়ে সিদ্ধ হবে না। সেটা ত নির্ভর করে অনেকের সমবেতভাবে ত্বরিতগতিতে কাজ করার উপর।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি ত ১০০ করে করতে বলি নি। ৩০০০ এর কথাই প্রত্যেকের কাছে বলেছি। একজনেই নিজের উপর সংটার দায়িত্ব নিয়ে সেইভাবে অগ্রসর হতে পারে। কারণ, সেই urge (আকূতি) থাকলে, তদনুপাতিক speed, ability ও efficiency (গতিবেগ, সামর্থ্য ও দক্ষতা) বেড়ে যাবে। ঐভাবে একটায় successful (কৃতকার্য্য) হলে পরেরটায় success will approach smilingly (কৃতকার্য্যতা হাসিমুখে হাজির হবে)। এইভাবে সে becoming ও achievement (বিবর্দ্ধন ও প্রাপ্তি) এর পথে এগিয়ে চলবে।

প্রফুল্লদা (চ্যাটার্জী)—ঠাকুর! বাইরে যাব, না, এখানে থাকব?

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্যে)—যেটা profitable (লাভজনক), তাই কর, profitable to me and not to you (আমার পক্ষে লাভজনক, তোমার পক্ষে কী লাভজনক তা বিচার্য্য নয়)।

প্রফুল্লদা—কোন্‌টা ভাল, আপনি ত জা্নেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমিই ভাল বোঝ তা'। আমার প্রতি তুমি কী করবে সেটা যদি আমাকে বলতে হয়, তাহলে ত মুশকিলের কথা। আমি কি তা বলতে পারি? আমি তোমার অবস্থায় থাকলে একজন সহযোগী সৃষ্টি করে এখানে রেখে নিজে বাইরে যেতাম। তাকে maintain (পালন) করতাম, অর্থাৎ সে automatically (আপনা থেকে) maintained (পালিত) হতো তার activity (কর্ম্ম) দিয়ে। এখানে তুমি যে কাজ করছ, তা'ও চলতো। বাইরে গিয়ে যা করার, তাও করতে পারতে। ইষ্টকর্মকে প্রথম ও প্রধান করে ভাবতে অভ্যস্ত হলে সঠিক সিদ্ধান্ত স্বতঃ হয়ে ওঠে।

খগেনদা (তপাদার)—বাজারে কি যাব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি জান, আর তোমার কাজের পদ্ধতি জানে। তাইই ব'লে দেবে।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর ওখান থেকে উঠে যতি আশ্রমের টিনের চালের তলে এসে একটা চেয়ারে বসলেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), বঙ্কিমদা প্রভৃতি আসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদাকে আবার দিন-স্মারিনী সম্বন্ধে সব বললেন।

কেষ্টদা—দশজনে মিলে যে কাজ সে কাজে দেরী হবেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনাদের যে সহযোগী নেই।

কেষ্টদা—আজ দেখতে পাচ্ছি ১৫ বছর আগে যা' আমরা একক করতে পারতাম, এখন লোক বেশী থাকায় তা পারা যায় না। একক যে যা' করতে পারে, ততটুকু করতে গিয়েও opposition (বাধা) পায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Opposition (বাধা) নেই, indolence (আলস্য) আছে। অবশ্য যত বড় কাজ করতে যাওয়া যায়, তত opposition face করাই (বাধার সম্মুখীন হওয়াই) স্বাভাবিক।

কেষ্টদা—একই জিনিষ নানাভাবে interpret (ব্যাখ্যা) করা যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Interpretation (ব্যাখ্যা) ত কথা নয়। Concrete result ও materialisation (বাস্তব ফল ও কাজ) কতটুকু হল, সেইটে থেকে ধরা যায়।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর ওখান থেকে উঠে বড়াল বাংলোর-বারান্দায় চৌকিতে এসে বসলেন। বহু দাদা ও মা এসে জড় হলেন।

সরোজিনী মা বললেন—সেই দিনের কথা থেকে আমার মনে সব সময় ভয় হয়, মনে হচ্ছে খোকাকে (অরুণ দত্ত) আপনি স্বেচ্ছায় যেতে দেন নি। এখন কি ওকে চলে আসতে বলব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার হয়েছে মুশকিল। আমার কথা অনেকেই শোনে না, শুনতে-যেন পারেও না। কারণ নিজের বুদ্ধি ছাড়তে পারে না অর্থাৎ ছাড়তে চায় না। প্রায় সবার মনই স্ব স্ব ইচ্ছার দাস, ওতেই বদ্ধ। আমি ত মত দিতে চাই নি আগে, তবে অনিল (সরকার) এসে যেভাবে দায়িত্ব নিল, তাতেই ত মত দিলাম।

রাত্রে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর ঘরে শয্যায় উপবিষ্ট। পরম পূজনীয় বড়দার সঙ্গে ঘরোয়া কথাবার্ত্তা বলছেন। প্রমথদা (দে), প্রবোধদা (মিত্র), শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), বীরেনদা (ভট্টাচার্য্য), দাশুদা (রায়), রাধারমণদা (দত্ত জোয়ার্দ্দার), আশুদা (জোয়ার্দ্দার), চারুদা (করণ), গোপেনদা (রায়) প্রভৃতি আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রমথদার সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে বললেন—যখনই আপনার সামনে কোথাও কপটতা বা আদর্শবিরোধী কথা বা আচরণ কোনভাবে প্রশ্রয় পায় তখনই আপনি অন্যায় করলেন, তার ভিতর দিয়ে কপটতারূপ পাপ ঢুকলো আপনার মধ্যে। বেষ্টনী দুর্ব্বল হ'লে শত্রু প্রেষ্ঠের সর্ব্বনাশ করার সুযোগ পায়। তাই সর্ব্বদা সজাগ থাকা লাগে। শুনেছি বিভীষণ রামচন্দ্রকে পাহারা দিচ্ছিল, তার একটু অসাবধানতায় রামচন্দ্রকে চুরি ক'রে নিয়ে গেল। হনুমান যতক্ষণ ছিল, ততক্ষণ কিন্তু পারে নি। এই রকম হয়। আপনাদের সামান্যতম দুর্ব্বলতায়, আমি মানুষটা দুর্ভোগের মধ্যে পড়ব, এইটে ঠিক থাকে যেন। আপনার সামনে যেখানেই যে আদর্শকে বিসর্জ্জন করুক না কেন,

সেখানেই যদি বিহিত পরাক্রমে নির্লজ্জভাবে নিরোধ না করেন, তা হ'লে প্রতিপদক্ষেপে আমাকে বিপন্ন করা হবে।।

একটু থেমে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমরা আত্মপুষ্টির জন্য নিই, কিন্তু সঙ্ঘকে উপচয়ী করার বুদ্ধি নিয়ে চলি না, যা নিই কাজের ভিতর দিয়ে তা থেকে বেশী আনা বা সৃষ্টি করার বুদ্ধি নেই। সৎসঙ্গকে লাভবান করার ধান্ধা কম। সবাই যদি সেই স্বার্থে স্বার্থোম্বিত হতাম তাহলে এতদিনে কী কাণ্ড হ'তো। কর্ম্মীদের ইষ্টস্বার্থ প্রতিষ্ঠার নেশা প্রবল হ'লে প্রতিষ্ঠান, কর্ম্মীরা, সৎসঙ্গীরা দেশ ও দুনিয়া এক সঙ্গে উপকৃত হ'তো। পরমপিতার কাজ ঠিকমত হ'লে সবার বাঁচাবাড়ার পথ প্রশস্ত হ'তো।

তারপর প্রবোধদাকে বললেন—সৎসঙ্গীদের দিয়ে ৬০টা দোকান ক'রে এই এলাকায় একটা ভাল বাজার গ'ড়ে তোল। চারটে লোক থাকবে, তারা এদিক-ওদিক থেকে নিত্যনূতন রকমারি ভাল-ভাল জিনিষ-পত্র আমদানি করবে। তাতে লোকের কত সুবিধা হবে। কতকগুলি লোকের পেটের ভাতের ব্যবস্থা হবে। কর ত ভা'ল ক'রে কর।

প্রবোধদা—আমি ত করতেই চাই। আমার কপালে একটু ওলট-পালট হ'য়ে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ কথা শুনে আমার ভাল লাগে না। এতকাল বুঝলি কী? কপাল মানে কর্ম্মফল। 'ক' মানে জল। মাথার ঘিলু। 'পাল' মানে যে তা' পালন করে অর্থাৎ মাথার খুলি। তাই কপাল মানে মাথা। যার মস্তিষ্ক যেমনতর বিন্যস্ত হ'য়ে থাকে ও কাজকর্ম্ম যে যেমনভাবে পরিচালনা করে তাই তার কপাল। একটু থেমে বললেন—

ভাল ক'রে কর। একটু বাধায় যদি পৃষ্ঠপ্রদর্শন কর, তাহ'লে হবে না। সংঘাতকে যে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, তার nerve (স্নায়ু)ই তৈরী হয় নি।

নরেশদা (দাশ) একটা চিঠির উত্তর দেওয়া প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দ্দেশ চাওয়ায় তিনি বললেন—আমরা যা নই, সে কথা লিখলে বা বললে, তা মানুষে শোনে না

এরপর কাজকর্ম্ম সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যাঁরা মানুষকে দিয়ে কাজ করাবে তা'দের জানা চাই কেমনভাবে উচ্চেতনী ভঙ্গীতে ধমক দিতে হয়, ধমকের সঙ্গে চাই থমক্ অর্থাৎ মানুষটাকে তার কাজে ঠিকভাবে লাগিয়ে রাখা। আর চাই চাল অর্থাৎ মনোজ্ঞ ব্যবহার। প্রত্যেককে চালনা করতে হয় তাঁর বৈশিষ্ট-অনুযায়ী। উপরে যা' বললাম তার আবার রকমারি কায়দা আছে। যে যেমন তা'র ক্ষেত্রে তেমন। তাই বলে স্থান, কাল, পাত্র বুঝে চলার কথা। নিজে অসংযত হ'লে তখন আর মাত্রা ঠিক থাকে না।

৯ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫৫, বৃহস্পতিবার (ইং ২৫।১১।৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর যতি আশ্রমের জন্য নির্ম্মীয়মাণ টিনের ঘরের নীচে বসে বাণী দিচ্ছিলেন। পরম পূজনীয় বড়দা উপস্থিত ছিলেন। তিনি প্রসঙ্গতঃ বললেন—প্রফুল্লর কান ঠিক হ'য়ে এসেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওর কানটাই অন্যরকম। জন্মই এই কাজের জন্য। Blessed birth (পবিত্র জন্ম)। গণেশের মত লিখছেই। True disciple (প্রকৃত শিষ্য) এর মত discipline (শৃঙ্খলা)ও খুব। ধমক্ দিলে আবার চৈতক ঘোড়ার মত alert (সজাগ) হ'য়ে ওঠে।

এই সময় প্রমথদা (দে), প্রবোধদা (মিত্র), হরেনদা (বসু), আশুদা (রায়), উমাদা (বাগচী), জিতেনদা (রায়), কালুদা (আইচ), ঈষদাদা (বিশ্বাস), সুরেনদা (শূর), কিরণদা (মুখার্জ্জী), প্যারীদা (নন্দী) প্রভৃতি অনেকে আসলেন।

কথা প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—৩।৪ তোলা কৃষ্ণ তিল ও চার পাঁচটা কাটবাদাম একসঙ্গে খুব মিহি ক'রে লঙ্কা দিয়ে বেটে রোজ ভাতের সঙ্গে খেলে দাঁত ও স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব ভাল। এতে খুব উচ্চ-মাত্রায় প্রোটিন ও ফ্যাট পাওয়া যায়। গরীবের পক্ষে এমন আহার কমই আছে। অবশ্য সব গরীব খেতে আরম্ভ করলে কী হবে বলা যায় না।

খগেন ভপাদারদা ঘর তৈরীর কাজ পরিচালনা করেন। তিনি দেরী ক'রে আসাতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তুই এত দেরী করলি কেন?

এই ভাবে ত তুই মানুষ মাটি করবি। তুই হলি মাঝি, তোর যদি ধমক, থমক, চাল ঠিক না থাকে, কোন সময় নৌকো যে চরায় আটকে যাবে বা তলা ফেসে যাবে তার কি ঠিক আছে?

খগেনদা—বাড়ীতে চশমা ছিল আনতে গিয়েছিলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এখানে ব'সে থেকে জোগাড় করতিস। কাজের কি কোন compromise (আপোষ) আছে? চশমা হ'লো তোর চোখ, বাড়ী ফেলে আসিস কেন?

খগেনদা—জামার পকেট ছেঁড়া, প'ড়ে গিয়েছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—জামা সেলাই করিস না কেন?

খগেনদা চুপ ক'রে থাকলেন।

কিছুক্ষণ পর খগেনদার পকেট থেকে আবার চশমা প'ড়ে যাচ্ছিল।

মনোহরদা (সরকার)—আপনি পকেটটা এখনই সেলাই করেন। তা' না হ'লে কখন চশমা কোথায় পড়ে যাবে, ঠিক পাবেন না। ঠাকুরের কথামত কাজ তাড়াতাড়ি না করলে, বেকায়দায় প'ড়ে যেতে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রমথদাকে বললেন—মনোহর ঐরকম ধরে। এটা সুলক্ষণ।

খগেনদা—আমি এখনই ব্যবস্থা করছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার দাঁতের ব্যথা যাচ্ছেই না।

সুরেশ (রায়)—সুপারি খাওবার বদলে গোলমরিচ খেয়ে দেখতে পারেন।

সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর নিজের ক্ষেত্রে সুপারির উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা এবং গোলমরিচের অনুপযোগিতার কথা বিশদভাবে সবিস্তারে খুলে বললেন। তারপর বললেন—কার কি প্রয়োজন, কার গলদ কোথায় ও তার প্রতিকার কী, সেইটে ভাল ক'রে ঠিক-ঠিক বুঝে তেমনিভাবে যদি ওষুধ প্রয়োগ করার বুদ্ধিটা মাথায় গজায়, সূক্ষ্ম বিবেচনার সঙ্গে সব দিকে নজর রেখে তেমন ক'রে অনুভব ও অনুধাবন যদি করতে পার, কার system (শরীরবিধান) কিরকম। কোনটা কার

উপয়োগী হবে, কিসে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হবে না, সেইটে ধ'রে যদি ওষুধ দিতে পার, তবে কাল থেকেই তুমি বই দেখে ব্যবস্থা দিতে আরম্ভ করতে পার। বৈশ্যবুদ্ধি হ'লো অল্পের মধ্যে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে প্রয়োজন পূরণ করা। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে যেমন বৈশ্যবুদ্ধির প্রয়োগ আছে, এতেও তা প্রয়োগ করতে পার।

কথা প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন, মানুষ বিষয়ে আসক্ত হওয়া সত্ত্বেও যদি তীব্রভাবে ইষ্টানুগ সৎচলন নিরত হ'য়ে চলে—নিরন্তরতা নিয়ে,—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ তাকে প্রয়াশঃই আলিঙ্গন করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় বড়াল-বাংলোর ঘরে নিজের শয্যায় উপবিষ্ট। সুরেন পালদার সঙ্গে সহাস্যে কথাবার্ত্তা বলছেন। আসামী ভাষা সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আসামী বল, বাংলা বল, একই ভাষার রকমফের। ভারতের রাষ্ট্রভাষা করতে হ'লে সংস্কৃতই করা ভাল। কারণ, সংস্কৃতই প্রত্যেক প্রাদেশিক ভাষার জননী। শিক্ষা, এমন কি গভর্ণমেন্টের কাজ-কর্ম্ম পর্য্যন্ত প্রত্যেক প্রদেশের লোকের জন্য প্রাদেশিক ভাষাতেই হওয়া ভাল। আমার মনে হয় সংস্কৃত রাষ্ট্রভাষা হ'লে কৃষ্টি নূতনভাবে উজ্জীবিত হ'য় উঠবে।

এমন একটা আবহাওয়া সৃষ্টি করা লাগে, যাতে ভারতের যে-কোন প্রদেশের লোক, যে-কোন প্রদেশে গিয়ে নিজের প্রদেশের মত স্বচ্ছন্দে বাস করতে পারে। তা' যদি না পারে তবে পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তা-বোধ গজাবে না। টুকরো-টুকরো, ছাড়া-ছাড়া ভাব প্রবল হ'য়ে উঠবে।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর খগেনদার সঙ্গে যতি আশ্রমের ঘর সম্বন্ধে কথা-বার্ত্তা শুরু করেন।

১০ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫৫, শুক্রবার (ইং ২৬।১১।৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর বারান্দায় চৌকীতে বসে আছেন। সুশীলদা কাছে আছেন। তিনি একজনের বিষয়ে বললেন—সে লিখেছে—ভগবান পেয়েও আমার complex ( প্রবৃত্তি ) গেল না, এর প্রতিকার করতেই হবে, তার জন্য অনশন করব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Complex (প্রবৃত্তি) কি যায় ? Complex (প্রবৃত্তি) গুলি adjust ( নিয়ন্ত্রণ ) করা লাগে। ওগুলিকে interested ( স্বার্থান্বিত ) করে তোলা লাগে Idealএ ( ইষ্ট )। ওগুলি না থাকলে মানুষ জড় হয়ে যায়, আবার প্রবৃত্তির দাস হলে মানুষ পশুর মত হয়ে যায়। প্রবৃত্তির অবদমনও নানা উৎকট উপসর্গের সৃষ্টি করে। ইষ্টের প্রতি অনুরাগ যত বাড়ে, ততই সংযম স্বাভাবিক হয়ে ওঠে।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে বাণী দিলেন—তা'র মধ্যে একটি বাণী এই—

উৎসুক হ'য়ে বুঝো<br>
আর্ ধারণা ক'রো,<br>
যা ধারণা করছ<br>
ভাবরঙ্গিল হ'য়ে ওঠ তা'তে—<br>
যদি তদ্ভাবিত হ'তে চাও,<br>
মন ও মস্তিষ্ককে এই ঝোঁকা ক'রে<br>
তোল,<br>
তা'র সবদিককার চিন্তাগুলিকে সমাবেশ<br>
ক'রে বল, লেখ বা কাজে কর—<br>
বাস্তবতায় মূর্ত্তি দিতে,<br>
এতে অভ্যস্ত হ'লেই<br>
ভাবসিদ্ধ হ'য়ে উঠবে,<br>
সর্ব আবেগ নিয়ে<br>
মূর্ত্ত ক'রে তুলতে পারবে তা'কে<br>
যখনই প্রয়োজন।

এই প্রসঙ্গে বললেন,—যা'রা যাজন, কথকতা, বক্তৃতা বা ইষ্টকর্ম্মে সার্থক হতে চায়, তাদের এইগুলি ভালভাবে করা লাগে। আমার লেখা বা কথাগুলি শুধু উপরসা-উপরসা প'ড়ে বা শুনে গেলে হয় না। যেমন-যেমন বললাম ঐ ভাবে সত্তাগত ক'রে নিতে হয়, ভাব মানে হওয়া, হ'য়ে উঠতে হয় অমনতর। আর, তার পিছনে আত্মস্বার্থ প্রতিষ্ঠার বুদ্ধি থাকলে হবে না, ইষ্টস্বার্থ প্রতিষ্ঠার বুদ্ধিই হওয়া চাই নিয়ামক প্রবৃত্তি। সেইটে যদি মুখ্য না হয়, তাহলে পেশাদারী রকম হবে। যত ভাল কথাই বল না কেন, তাতে মানুষের স্থায়ী কল্যাণ হবে কম। তবে মানুষগুলিকে যদি ইষ্টের সঙ্গে যুক্ত করে অনুশীলন তৎপর করে তুলতে পার, তা'র ফল তা'রা পাবেই।

১২ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫৫, রবিবার (ইং ২৮।১১।৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় আসীন। দক্ষিণাদা (সেনগুপ্ত), গোপেনদা ( রায় ), সতীশদা ( দাস ) প্রভৃতি কাছে আছেন। প্রফুল্ল বলল—আমাকেও শচীনদা (বণিক) লিখেছেন—জীবনবৃদ্ধিই ধর্ম্ম—এই জীবন বলতে কি মাত্র বর্ত্তমান জীবনকেই বুঝায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর্ম্মের উদ্দেশ্য হ'লো জীবন যাতে উন্নতিমুখর হ'য়ে অনন্তকাল ধরে ব'য়ে চলে। তাই ইহকাল বাদ দিয়ে নয়।

আনুষ্ঠানিক পূজাপদ্ধতি প্রভৃতির সার্থকতা সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইষ্টভৃতি করলে যেসব মানসিক বিন্যাস হয়, মস্তিষ্কের বিশেষ প্রবণতা সৃষ্টি হয়, শক্তি সঞ্চিত হয়, ভাব ঠিক রেখে ধর্ম্মানুষ্ঠান, পূজা প্রভৃতি করলেও কতকটা ঐরকম ফল হ'তে থাকে। অনুষ্ঠান মানে অনুস্থান—সম্বর্দ্ধনা-অনুগ থাকা—সম্বর্দ্ধনী অনুবর্ত্তিতা। আমাদের পূজাগুলি যে কত বৈজ্ঞানিক এবং সঙ্গে-সঙ্গে শুভভাব-উদ্বোধনী তা' বলে শেষ করা যায় না। সব বৈচিত্র্য আমাদের পূজাপদ্ধতিতে ঐক্যে সমন্বয় লাভ করে। তার ভিতর দিয়ে মহামানবগণ ও মহৎ যা কিছুকে পূজা করা হয় এবং সে পূজা কেন্দ্রায়িত সার্থকতা লাভ করে

সদগুরুতে। Unity in Variety (বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য) practically (বাস্তবে) demonstrate করা (দেখান) হয়।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর যতিদের জন্য যে টিনের ঘর হচ্ছে, তার নীচে এসে ইজি চেয়ারে বসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সুশীলদাকে একটা শ্লোক বের করতে বলেছিলেন। তিনি ঠিক সেটা পান নি। তবে বিবাহই যে নারীদের একমাত্র সংস্কার এবং পতিসেবাই যে তাদের গুরু সেবা ও গৃহকর্ম্মই যে তাদের অগ্নিপরিক্রিয়া, মনুর সেই শ্লোকটা পড়ে শোনাচ্ছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অগ্নি-পরিক্রিয়া মানে বৃদ্ধি-পরিক্রিয়া, বৃদ্ধি পরিক্রিয়া বৃদ্ধি পরিচর্য্যা। অগ্নয়ে স্বাহা মানে সংবর্দ্ধনায় স্বাহা।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সিকিতোলা অশ্বগন্ধার মূল ঋতুস্নানের দিন স্নানান্তে ভিজে কাপড়ে ভিজে চুলে পরিষ্কার পাটায় (ঝালের লেশমাত্র থাকবে না) দুধ দিয়ে বেটে মাসে একবার করে খেতে হবে। এতে মেয়েদের নাড়ী ভাল হয়, জরায়ু সবল হয়, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য সারে, সন্তান সুস্থ হয়। ছেলেপেলে না হওয়ায় এবং মেয়ে বেশী হওয়ায় এ ওষুধ দেওয়া চলে।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে বড়াল-বাংলোর ঘরে তক্তপোষে বিশ্রাম নিচ্ছেন। সুশীলদা (বসু), দক্ষিণাদা (সেনগুপ্ত), প্রবোধদা (মিত্র), সুধীরদা (বসু) প্রভৃতি অনেকে উপস্থিত। আজ বড় ঠাণ্ডা পড়েছে। সুশীলদা মহেঞ্জোদাড়ো, হড়প্পা প্রভৃতির কথা উল্লেখ করে বললেন—কত বড় সভ্যতা ও কৃষ্টি আমাদের ছিল পাঁচ-ছ হাজার বছর পূর্ব্বে, আর আজ আমরা কোথায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয় এর মধ্যে আমরা যে এখনও টিকে আছি, এটা একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার।

সুশীলদা—কেন এই পতন আসলো?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইষ্টের অস্বীকৃতি এসেছিল, integration (সংহতি) নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ঋগ্বেদে দেখতে পাই প্রথম থেকে শুরু করে পর-পর

প্রধানদের মান্য দেবার কথা। তারপর পরস্পর-বিরোধী টুকরো-টুকরো ভাগ ভাগ হয়ে গেল শৈব, সৌর, গাণপত্য ইত্যাদি। আগে ছিল একটা centre (কেন্দ্র)কে ধরে সবাই একগাটটা হ'য়ে থাকত। পরে disintegration (ভাঙ্গন) এসে গেল। তারপর নানা বিজাতীয় আক্রমণ বিধ্বস্তির কারণ হ'য়ে দাঁড়াল। পূজায় দেখা যায়, দশদিকপাল, অষ্টবসু প্রভৃতিকে নতি জানিয়ে পরে ইষ্টের পূজা। এটা তান্ত্রিক বৈষ্ণব সবার মধ্যেই আছে। এর থেকে বোঝা জায়, ধারাটা ছিল Unification (ঐক্য)এর দিকে।

প্রবোধদা—শঙ্করাচার্য্য যে হিন্দুধর্ম্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেন, তিনি ত বোধগম্যভাবে Common Ideal (এক আদর্শ) দেখালেন না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধারা নষ্ট হয়েছে অশোকের থেকে। মহাযান সৃষ্টি করলো।

এরপর সুশীলদা বললেন—যীশুখ্রীষ্ট নাকি তাঁর জীবনের রহস্যময় ১৮ বছরের মধ্যে ভারতে এসে অনেকদিন ছিলেন। তিনি নাকি কাশী, পুরী প্রভৃতি স্থানে ছিলেন। কাশ্মীরে তাঁর কবর আছে ব'লে লোকে দেখায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয় না তিনি ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মারা গিয়েছিলেন। হয়ত তিনি কবর থেকে উঠে ওখান থেকে এদিকে চলে এসেছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর আজ সকালে দেওয়া নিম্নলিখিত বাণীটি প্রফুল্লকে পড়তে বললেন—

পড়া হলো—

প্রেষ্ঠস্বার্থী অচ্যুত সক্রিয়
অনুরাগ যাদের নাই, / তাদের
জানাগুলি বিচ্ছিন্ন,
সমন্বয়ী সার্থকতায় দানা বেঁধে ওঠে না,
আর অন্তর্দৃষ্টিও অনেকখানি কম।

পড়ার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—শিক্ষা, ব্যক্তিত্ব ও অভিজ্ঞতাকে যদি সুসমন্বিত ও সঙ্গতিশীল করে তুলতে হয় তাহলে তার মূলে চাই ইষ্টনিষ্ঠা।

রাত ৯টায় হরিপদদা (সাহা) আসলেন। কথা প্রসঙ্গে তিনি বাঁধান দাঁত সম্বন্ধে বললেন—প্রথম অসুবিধা হয়, কিন্তু কিছুদিন পরে টক মিষ্টি বোধ করা যায়, একটা কিছু দাঁতে পড়লে টের পাওয়া যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহলে দেখ, স্নায়ুর সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নেই, একটা বাইরের জিনিষ তবু অভ্যস্ত হ'তে-হ'তে অমনি হ'য়ে দাঁড়ায়। তাই বলে, 'আবৃত্তিঃ সর্ব্বশাস্ত্রানাং বোধাদপি গরীয়সী'। আবর্ত্তনে আবর্ত্তনে আপন হয়ে যায়।

২৪শে অগ্রহায়ণ, শুক্রবার, ১৩৫৫ (ইং ১০।১২।৪৮)

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমের জন্য নির্ম্মীয়মাণ টিনের ঘরে এসে চৌকীতে বসেছেন। চারিদিকে শাল সেগুনের গাছ। শীতের ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। সামনে লণ্ঠন জ্বলছে। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), প্যারীদা (নন্দী) প্রভৃতি কাছে বসে নানা বিষয়ে কথা বলছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর আগ্রহভরে সুনছেন। পরম শান্ত, সুখকর পরিবেশ। এমন সময় কাশীদা ও চিত্ত দত্ত জ্ঞানাঞ্জনবাবু (নিয়োগী) সহ আসলেন। জ্ঞানাঞ্জন-বাবুকে বেঞ্চিতে বসতে দেওয়া হল।

তিনি প্রণাম করে বসার পর কাশীদা (রায়চৌধুরী) বললেন—আশ্রমের পুনর্গঠনের ব্যাপারে উনি অনেকের সঙ্গে প্রাথমিক যোগাযোগ ক'রে দিয়ে গেলেন। এখন আমরা ক'রে নিতে পারলে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর কাশীদাকে দেখিয়ে জ্ঞানাঞ্জনবাবুকে বললেন—আপনি ওর উপর নজর রাখবেন। ও বেশ উৎসাহী।

জ্ঞানাঞ্জনবাবু—যোগাযোগ রাখলে আমি যতদূর পারি করব। জানুয়ারী মাসে বিহারের মন্ত্রীদের কাছে যাব। যদি সেখানে কোন কথা বলার থাকে, আমাকে তখন বলে দিতে পারেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কাশীদাকে বললেন—তুমি নিজে যোগাযোগ রেখো,

অন্যের উপর নির্ভর করতে যেওনা। রামদাস স্বামী বলেছেন—'অপরে যে নির্ভর করিল কার্য্য তাহার পণ্ড হইল।'

সঙ্গে-সঙ্গে জ্ঞানাঞ্জনবাবুর দিকে চেয়ে হেসে বললেন—সৎসঙ্গের কাজ মানে দেশের কল্যাণকামী প্রত্যেকের নিজস্ব কাজ। এ-দিকে লক্ষ্য রেখে আপনার পক্ষে যা' সম্ভব ও সমীচীন তা' করবেনই।

জ্ঞানাঞ্জনবাবু হেসে মাথা নাড়লেন। পরে বললেন—কলকাতায় যদি কোন দরকার থাকে, বিকাল ৫ টার পর থেকে রাত আটটা পর্য্যন্ত আমি ডাক্তার রায়ের (মুখ্যমন্ত্রী) ওখানে থাকি, সেখানে যেন দেখা করে।

একটু হেসে জ্ঞানবাবু বললেন, আমি ওকে বলেছিলাম—প্রকৃত বিশ্বাস থাকলেই হয়—মানুষে বিশ্বাস, কাজে বিশ্বাস, বিশ্বাসই মূল জিনিষ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—একেই অন্যভাবে বলা চলে সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা। সুযোগ মানে সৎ-এ অনুরক্ত ও সংযুক্ত হওয়া, আর সুবিধা মানে সুবিধিতে চলা।

কেষ্টদা—একই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারে যাতে আশ্রম গড়ে উঠতে পারে, নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে আপনি এব্যাপারে সাহায্য করলে ভাল হয়। ঠাকুর বলেন—'Utilise evil for good' (মন্দকে ভালর জন্য ব্যবহার কর)। এই যে দূরবস্থা, এর ভিতর দিয়ে আমাদের কাজগুলি বিহার ও অন্যান্য প্রদেশে ছড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে পারলেই এই দূরবস্থার সুযোগ গ্রহণ করা হবে।

জ্ঞানাঞ্জনবাবু—বিপদ ত মানুষকে মজবুত করে। নচেৎ অনেক সময় জিতও হার হয়ে জায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সত্তা যাতে ক্ষুন্ন হয়, তাই করাই ত পাপ। সত্তা যাতে পরিপোষিত হয়, ধর্দ্ধিত হয়, তাই করাই ত পুন্য। অবস্থা যেমনই হোক তাকেই সপরিবেশ উন্নতির সহায়ক করে নিতে হয়। সেইটেই সচ্চিদানন্দময় সত্তার নিত্যলীলা। হার মানলে পরমপিতাকে অস্বীকার করা হয়। আত্মস্বার্থপ্রতিষ্ঠার কথা বাদ দিয়ে যারা ইস্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠার নেশা

নিয়ে চলে, তারাই জীবনকে সার্থক করার কৌশল আয়ত্ত করে ফেলে। দুঃখ-বিপদের মধ্যেও তারা ভগবানের দয়া আবিষ্কার করে ধন্য হয়। এই ভক্তিই জীবনের পরশপাথর। ভগবান যেমন সর্ব্বশক্তিমান, তাঁর বাচ্চা হিসাবে ভক্তও তাঁর দয়ায় রকমওয়ারি ভাবে তাই।

বাংলার বহুমুখী কৃষ্টি ও অপূর্ব্ব অবদানের কথা জ্ঞানাঞ্জনবাবু আবেগভরে বলে চললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনারা যাদের কোলে মানুষ হয়েছেন, সে এক যুগ গেছে। সেই প্রেরণাপুষ্ট আপনারা ছাড়া, বাংলায় আজ মানুষের মত মানুষ কমই আছে। রবীন্দ্রনাথ গেলেন, কিন্তু তাঁর পরবর্তী কোথায়? বাংলা কোনদিন মানুষের দিক থেকে pauper (দৈন্যগ্রস্ত) হয়নি। আজ বাংলায় সেই সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে।

জ্ঞানাঞ্জনবাবু—অপূর্ব্ব প্রাণশক্তি বাংলার। কোথায় লুকিয়ে আছে মহাসম্ভাবনা কে জানে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাংলা তার কৃষ্টি ছেড়ে আজ বিপন্ন। নিজেদের বৈশিষ্ট্য নিয়ে গুচ্ছ বেঁধে উঠতে পারে যাতে, যেসূত্র অবলম্বন করে দানা বেঁধে উঠতে পারে, তা হারালে Pulverised (চূর্ণ) হয়ে যাব। কৃষ্টির উপর দাঁড়িয়েই জাতি বাঁচে। সেই ভিত্তিকে ধ্বংস করলেই সর্ব্বনাশ।

জ্ঞানাঞ্জনবাবু—তা হবে না। বারবার দেখেছি অন্ধকারের মধ্যে আলোকের আবির্ভাব। বাংলার বিপ্লবী শক্তিরই আবির্ভাব দেখেছি চৈতন্যদেব, বিদ্যাসাগর, রামকৃষ্ণ, রামমোহন, বিবেকানন্দ, দেশবন্ধু, নেতাজী সকলের মধ্যেই। কোন অনাগত আলোক আজও হয়ত প্রতীক্ষা করছে আত্মপ্রকাশের জন্য। রামমোহনই নবযুগের প্রবর্ত্তক। তিনি প্রাচীন ও বর্ত্তমানের প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সমন্বয় করে গেছেন। পরানুকরণমূঢ়তা ও আত্ম-অবমাননা থেকে আমাদের বাঁচিয়েছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—রামমোহনের আবির্ভাব যদি তখন না হত আরো বহুলোক খ্রীস্টান হয়ে যেত, সে-স্রোত রোধ করা কঠিন হত। তাঁরই

পিছনে-পিছনে এলেন রামকৃষ্ণ ঠাকুর। রামমোহন যে সমন্বয়ের অগ্রদূত, ঠাকুর নিজ জীবন দিয়ে তা'করে দেখালেন। তাঁর সান্নিধ্যে এসে মানুষ স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী ভাব, ভক্তি, জ্ঞান, প্রেম, সেবা ও ঈশ্বর-পিপাসায় উজ্জীবিত হয় উঠল। সনাতন ভারত তার স্তিমিত প্রাণস্পন্দন প্রবল-ভাবে ফিরে পেল।

জ্ঞানাঞ্জনবাবু—রামকৃষ্ণদেবের কথা স্বতন্ত্র। তিনি আধ্যাত্মিক শক্তির উৎসস্বরূপ। কিন্তু রামমোহনের মত জ্ঞানকল্পতরু সব শাস্ত্রমন্থন করে যে একেশ্বরবাদকে তুলে ধরলেন ঐ যুগে, সে কম ব্যাপার নয়।

কিছু সময় চুপচাপ কাটল।

মৌনতার পর অন্তরঙ্গতার স্পর্শ যেন নিবিড়তর হয় উঠল।

জ্ঞানাঞ্জনবাবু—আমি নিজে কোন নিরাশা দেখি না। জাতির বিপ্লবশক্তিতে আমি বিশ্বাসী। ভাঁটার সময় ভাবতে পারি জোয়ার আসবেই। ইংরাজীতে উক্তি আছে—**If winter comes, can spring be far behind ?** ( যদি শীত আসে, তাহলে কি বসন্তের আগমন খুব দূরবর্তী হতে পারে ? )

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি বলি, আশাকে ফলবতী করে তুলতে আমাদের-ও করণীয় আছে।

জ্ঞানাঞ্জনবাবু বিদায় নিতে চাইলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিষণ্ণ সুরে বললেন—আপনি যাবেন খারাপ-খারাপ লাগছে। কাছে ছিলেন।

২৫ অগ্রহায়ণ, শনিবার, ১৩৫৫ (ইং ১১।১২।৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর টিনের ঘরের সামনে সকালে এসে চৌকিতে বসে-ছেন। দক্ষিণাদা (সেনগুপ্ত), প্রকাশদা (বসু), হরিদাসদা (ভদ্র) প্রভৃতি কাছে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তন্ময়ভাবে নিম্নলিখিত বাণীটি বললেন—

তুমি যাতে যেমন আত্মোৎসর্গ করেছ,
পেয়েছও তাকে তেমনি;
ঈশ্বরে বা ইষ্টে আত্মোৎসর্গ কর,
পাবে তাঁকে ধর্ম্মে, অর্থে, কামে, মোক্ষে
—সর্ব্বতোভাবে।

পরে পাগলুদা একটা শাল গাছের পাশে এসে দাঁড়ালেন। শ্রীশ্রীঠাকুর কিছু সময় তাঁর দিকে সস্নেহে তাকিয়ে থেকে বললেন—আমি ওদের নিজের ছেলের মত দেখি। আমার ইচ্ছা ছিল ওদের এবং সৎসঙ্গীদের দিয়ে এমন একটা গুচ্ছ সৃষ্টি করব, গোষ্ঠী সৃষ্টি করব যা' একেবারে non-breakable (অভঙ্গনীয়)। সেটা হবে একটা বিরাট tower of strength (শক্তির দুর্গ)। কিন্তু ওরা তা চাইলে না। বড় খোকা প্রভৃতির সঙ্গে এব্যাপারে ভিড়ল্ না। নিজের গোষ্ঠীর integrity (সংহতি) শক্ত না হলে সব integrity (সংহতি) একটা হাস্যাস্পদ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। কথায় বলে—charity begins at home (বদান্যতা বাড়ী থেকে শুরু হয়)। দেখ এদের প্রত্যেকের efficiency (দক্ষতা) অসাধারণ। বড় খোকা ত চুপচাপ থাকে, কিন্তু দায়িত্ব মাথায় নিয়ে কেমন সুন্দর চালাচ্ছে। ওরও যথেষ্ট দক্ষতা।

প্রকাশদা—আপনার পরিবারের লোকেরা কাজের নেতৃত্বে থাকলে সবারই শ্রদ্ধা ও আস্থা হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তথাকথিত নেতাদের অনেকে মানুষকে শোষণ ক'রে নিজেরা দাঁড়াতে চায়, মোড়লী করতে চায়। আমার ইচ্ছা সংগঠন এমনভাবে গড়ে তোলা যাতে প্রত্যেকটি মানুষ তার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সুগঠিত ও পরিপূরিত হয়। ইষ্টপ্রাণ সেবাবুদ্ধি না থাকলে এ কাজ করা যায় না।

এরপর পাগলুদার চাকরী সম্বন্ধে কথা উঠল।

পাগলুদা—নিজত্ব বজায় থাকলে করব, নচেৎ করব না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিজত্ব বজায় থাকে কম, atmosphere (আব-হাওয়া)ই অজ্ঞাতসারে নিজত্ব বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য করে। তাছাড়া চাকরী করলে পরবর্ত্তী বংশধরদেরও চাকরী করার ঝোঁক হয়। তারা স্বাধীনভাবে কিছু করার কথা ভাবতে পারে কম।

পাগলুদা—আপাতত ত চাকরী করার দরকার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি যাবে কেন চাকরী করতে? যারা pauper (দারিদ্র্যব্যাধিগ্রস্ত), তারা যেতে বাধ্য।

প্রকাশদা—যারা চাকরী করে তারা বোধহয় তার কুফল বুঝতে পারে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কষ্ট বোধ করে কিন্তু পথ পায় না। শচীনদা (সামনে উপবিষ্ট) যে সময় জজসাহেব, তখনও বলেছে 'চাকরী ভাল লাগে না'। ...পাগলু ইচ্ছা করলে স্বাধীন ব্যবসা ও করতে পারে। বঙ্কিম ওরা ত কিছুই জানত না। বই-টই ঘেঁটে ঘেঁটে experiment (পরীক্ষা) করে ব্যাটারী তৈরী করতে শিখে গেল। চেষ্টা থাকলে কাজ শিখতে অসুবিধা হয় না। আর ও তো পাশ-করা বড় ইঞ্জিনিয়ার। অধীত বিদ্যাটা কিভাবে মানুষেব সেবায় লাগান যায়, সেইদিকে মাথা খাটালেই কত কী পেরে যায়! কে জানে কার মাথা থেকে কী বেরিয়ে যায়! পরমপিতার দয়ায় কাকে দিয়ে দেশের দশের কী উপকার হয়! ওর ভিতর কত শক্তি লুকিয়ে আছে তা ওই কি জানে? Sincere active surrender (আন্তরিক, সক্রিয় আত্মনিবেদন) যদি থাকে, লোকমঙ্গল সাধন করে মানুষের অভর্জী হতে কিছু লাগে না। টাকার দাম কিছুই না। চরিত্রের দামই বেশী। টাকাটা বড় করে ও মুখ্য বলে যারা ভাবে তারা টাকা পায় না। ব্যক্তিত্বকে যারা বড় ব'লে বোঝে তারা তা সংহত করা ও যোগ্যতা বাড়িয়ে তোলার দিকে নজর দেয়। যোগ্যতা বাড়াতে আবার অভ্যাস-ব্যবহার ঠিক করা লাগে। তার ভিতর দিয়ে পরিবেশ যেমন উপকৃত হয়, তাদের প্রাপ্তিও তেমনি অবাধ ও অবারিত হয়। সবার জীবনমূল হলেন ইষ্ট, তাই ইষ্টস্বার্থ

প্রতিষ্ঠাপন্ন হলে একসঙ্গে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। এইই তুক।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় অসম্পূর্ণ নূতন টিনের ঘরে এসে একটা চেয়ারে বসেছেন। সুধীরদা (দাস), খগেনদা (তপাদার), মনোহর ভাই (সরকার) প্রভৃতিকে কাজকর্ম্ম সম্বন্ধে নির্দ্দেশ ও উৎসাহ দিয়ে বলছেন—দেখতে হয় কাজ কত তাড়াতাড়ি, নিখুঁত ও সুন্দরভাবে সাশ্রয়ে করা যায়। কাজ একটা তপস্যা। কাজের লক্ষ্য থাকবে ইষ্টের মুখে হাসি ফোটান। একে বলে নিষ্কাম কর্ম্ম। সব কাজ এইভাবে করতে থাকলে মানুষ অনাসক্ত, কৃতী ও মুক্ত হয়। ইষ্টের উপর টান যত বাড়ে, তত টানটা সবার উপর ছড়িয়ে যায়। ক্ষুদ্র অহমিকা বা স্বার্থের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। টানের এই কেন্দ্রায়িত বিস্তারে সুখের সাগর উথলে ওঠে।

প্যারীদা ( নন্দী ), বিজনদা ( সিংহ ), দক্ষিণাদা (সেনগুপ্ত), শরৎদা (সেন), শৈলেনদা ( ভট্টাচার্য্য ), সরোজিনীমা, আশালতাদি ( হালদার ), সেবাদি, রেণুমা, রাণীমা, সৌদামিনীমা প্রভৃতি অনেকেই সমবেত হয়েছেন। বালক-বালিকারাও অনেকে এসেছে। ভক্তবৃন্দ একমনে প্রভুর সুমধুর কথামৃত আস্বাদন করছেন। বিজনদা তাঁর পারিবারিক ও চাকরী জীবনের নানা সমস্যার কথা বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ নিয়ে চলতে সব সময় দেখতে হয় কিভাবে তার মন জয় করা যায়। নইলে শুধু কাজ দেখিয়ে মানুষকে খুশী করা যায় না। গুণগ্রহণমুখরতা দরকার কিন্তু খোসামুদী ভাল নয়।

শীতের বেলা হঠাৎ সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। শ্রীশ্রীঠাকুর আপনভাবে সমাহিত।

ভক্তবৃন্দ তাঁর দর্শনে তন্ময়। পরে একে একে অনেকেই প্রণামান্তে বিদায় নিলেন।

২৬শে অগ্রহায়ণ, রবিবার, ১৩৫৫ (ইং ১২।১২।৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে চৌকীতে বসে যতি-আশ্রম তৈরীর কাজ পরিদর্শন করছেন। পূজ্যপাদ বড়দা কাছে আছেন। কালিদাসী মা শ্রীশ্রীঠাকুরকে তামাক, জল, সুপারি দিচ্ছেন, মাঝে-মাঝে দয়ালের শ্রীচরণ যুগলে হাত

বুলিয়ে দিচ্ছেন। চাদরখানি যাতে সরে না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখছেন। কয়েকটি পাখী আপনমনে কিচির-মিচির করছে। শ্রীশ্রীঠাকুর আগ্রহ-ভরে চেয়ে-চেয়ে দেখছেন। চন্দ্রনাথদা (বৈদ্য), দক্ষিণাদা (সেনগুপ্ত), প্রবোধদা (মিত্র), ব্যোমকেশ ভাই (ঘোষ) প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত হ'লেন। দুঃসাহসিক কার্য্যপ্রবণতা সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Adventurous (দুঃসাহসী) হ'লেই যে সব সময় ভাল হয়, তা নয়। ইষ্টানুগ যদি না হয়, তাহ'লে ভাল হয় না। কত বিশ্ব-পর্য্যটক আছে। কত পরিশ্রম ক'রে সারা দুনিয়া ঘোরে কিন্তু কোন purpose (উদ্দেশ্য) বা principle (আদর্শ) fulfilled (পরিপূরিত) হয় না। যার যতগুণই থাক, দেখা লাগে কিভাবে তা'র ইষ্টানুগ ব্যবহার হয়। নইলে তথাকথিত সদ্‌গুণও বিধ্বস্তির কারণ হ'তে পারে। এই কথাটা মানুষ বোঝে না। তা'তেই বেঘোরে পড়ে যায়।

এরপর পাগলুদা আসলেন। তিনি অল্পক্ষণ শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে নিভৃতে আলোচনা করলেন।

প্রফুল্ল—পাগলুদা এখানে থাকলে একটা যোগাযোগ হ'য়ে যেত।

পাগলুদা—অন্যভাবে হয়, সেই ভাল। জ্যাঠামশার করতে হ'লে তাঁর মর্য্যাদা ক্ষুন্ন হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অন্যকে দিয়েই করাতাম। মানুষ ছাড়া মানুষের উপায় নাই। মানুষ ধ'রেই মানুষের ওঠা লাগবে। জলের মধ্যে থেকে কুমীরের সাথে বাদ করা চলে না। তাই এই মানুষকে যে যত সুন্দর ভাবে tackle (চালনা) করতে পারে, সেই তত কৃতী হয় জীবনে।

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর পাগলুদাকে বললেন—তুই যদি আমার অজ্ঞাতেও কোথাও চাকরী করিস, তাতেও আমার মান থাকে না। আমি এর বিরুদ্ধে বরাবর ব'লে এসেছি। এটা আমার পছন্দই হয় না। ওর চাইতে তুই, কি বড় খোকা, কি মণি যদি হকারিই করিস, তাতেও আমার মাথা হেট হয় না। এতজনকে আমি চাকরীর বিরুদ্ধে বলার পর, তুই যদি আজ চাকরী করতে যাস, আমার কথার মূল্য থাকে কোথায়?

প্রফুল্ল—আপনি ত বলেন, চাকরীর থেকে বরং ভিক্ষা করা ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ। সবাই অবশ্য তা অপছন্দ করে। কিন্তু আমার কথার উদ্দেশ্য হ'লো, ভিক্ষা করতে হ'লে অন্ততঃ মানুষের তুষ্টির মধ্যে দিয়ে তা করতে হয়, মাথা খাটাতে হয় সে জন্য, নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করতে হয় সেইভাবে। কত সময় দেখা যায়, অতি সাধারণ লোক কেমনভাবে কথাটা বলে যা'তে মানুষের সহানুভূতির উদ্রেক হয়। অবশ্য সামর্থ্যের অপলাপ ক'রে ভিক্ষা করা ঠিক নয়। মানুষকে স্বতঃস্বেচ্ছভাবে এমন সেবা করতে হয়, যাতে পাওয়াটা আপনা থেকে উচ্ছল হয়। চাকরী যে করে, তারও এমন সামর্থ্য থাকা লাগে, যাতে চাকরী গেলেও সে সৎ ও স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জন করতে পারে। এতে ব্যক্তিত্ব ঠিক থাকে।

পাগলুদা কথা প্রসঙ্গে বললেন—আগ্রা সৎসঙ্গের ধাঁজে কতকগুলি বড় শিল্প-প্রতিষ্ঠান করলে অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান হ'তে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এখানকার বেশ কিছু কর্ম্মী তেমন উদ্‌বুদ্ধ, যোগ্য ও সক্রিয় নয়। আর আমাদের প্রধান জিনিষ হ'লো revival of culture ( কৃষ্টির পুনর্জ্জাগরণ )। Industry ( শিল্প ) করল, খেল, তার দাম কী যদি culture ( কৃষ্টি ) না জাগে, প্রত্যেকটা মানুষ, প্রত্যেকটা পরিবার, প্রত্যেকটা সমাজ, প্রত্যেকটা রাষ্ট্র যদি তা'র অন্তর-বাহিরের সম্পদ নিয়ে সপারিপার্শ্বিক বেড়ে না ওঠে ইষ্টানুগ সঙ্গতিতে। আর এটা চারান চাই ব্যাপকভাবে, সমগ্র মানব সমাজকে mould ( গঠন ) করা লাগবে এইভাবে। তাই লোকসংগ্রহ। Progressively (ক্রমোন্নত-ভাবে) বংশপরম্পরায় চলবে এইভাবে। নচেৎ কতকগুলি নাগা সন্ন্যাসীর দাম কী? এক অভিন্ন আদর্শকে ভালবেসে সবৈশিষ্ট্যে পরস্পর সক্রিয় সেবা-সহযোগিতা ও প্রীতিতে সম্বদ্ধ হ'য়ে ওঠা কেন্দ্রেরই পরিপূরণে—তাকেই বলে organisation ( সংগঠন )। এমনতর organised ( সংগঠিত ) যখন, তখনই আমরা স্বাধীন। আর সেই organisation (সংগঠন)ই গ'ড়ে তুলছি, যাতে দুনিয়া সত্যিকার স্বাধীনতার স্বাদ পায়।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর ছাত্রজীবনের নানা দুঃখের কাহিনী

বললেন। কথায় কথায় বললেন—সমস্ত কষ্ট যেন concentrated (কেন্দ্রীভূত) হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল ডাক্তারি পড়ার সময়। কতদিন কলের জল খেয়ে ফুটপাথে শুয়ে দিন কেটেছে।

পাগলুদা—আপনি আমাদের এমনভাবে মানুষ করেছেন, যে কষ্ট বলতে কি তা' টের পাই নি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার কষ্টের স্মৃতি ঐ রকম করিয়েছে। আমার মত সেই কষ্টের আঁচড় তোমাদের গায় না লাগে। সুবিধা-সুযোগের মধ্য দিয়ে তোমরা মানুষ হও, তাই ভেবেছি। সুযোগ পেলে আমার পক্ষে বড় বড় ডিগ্রী পাওয়া কঠিন ছিল না, অবশ্য তা' না হ'য়ে একদিক থেকে ভালই হয়েছে। তা' হ'লে বাঁধা ধরা পথে চ'লে যেতাম। হয়ত সেই কলের মধ্যে আটকে পড়তাম। Independent thinking (স্বাধীন চিন্তা) নষ্ট হ'য়ে যেত। যা দিয়েছি, তা' দিতে পারতাম না।

পাগলুদা—তবে আমাদের এ education (শিক্ষা) কেন দিলেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাবলাম যাই হো'ক, সব কিছুর মধ্যে আমি ত আছি তোদের সামনে, তাই আটকাবে না।

প্রফুল্ল—আপনার অপূর্ব ভাব ও কর্ম্মধারা এবং ব্যক্তিত্ব যে দুনিয়ায় সব চাইতে বড় জিনিষ সে-সম্বন্ধে একটা গৌরবময় চেতনা আপনার পরিবার বর্গের মধ্যে থাকলে, তাঁরা সবার কাছে প্রেরণার উৎস-স্বরূপ হ'য়ে উঠতে পারেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি কিছু জানি না। দুনিয়ায় যা' আছে, তা pick up (তুলে ধরে) দিয়েছি। এটা অজর অমর। চিরন্তন। Law ব'লে, বিধি ব'লে কিছু থাকতে এর ব্যত্যয় নেই। এ পরমপিতার অমোঘ দান।

আজ পাগলুদা চাকরী নিয়ে পাঞ্জাব চ'লে গেলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের মন খারাপ। তাঁর শরীরও অসুস্থ হ'য়ে পড়লো।

শ্রীশ্রীঠাকুর কয়েকদিন হ'লো অসুস্থ। উচ্চ রক্তচাপ ও অন্যান্য উপসর্গে কষ্ট পাচ্ছেন। প্যারীদা প্রভৃতির সঙ্গে দেওঘরের ডাক্তার অনিলবাবু (ব্যানার্জ্জী)ও দেখছেন।

১লা পৌষ, বৃহস্পতিবার, ১৩৫৫, (ইং ১৬৷১২৷৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে গোল তাম্বুতে বিছানায় শুয়ে আছেন। শরীরে শ্বস্তি পাচ্ছেন না। একটু-একটু কেঁকাচ্ছেন। কাছে আছেন পূজনীয় বড়দা। তা' ছাড়া সুধীরদা (বসু), প্যারীদা (নন্দী) বঙ্কিমদা (রায়), মায়া মাসীমা, সরোজিনীমা প্রভৃতিও আছেন। সেবকবৃন্দ তাঁকে শ্বস্তি দিতে সচেষ্ট। এমন সময় ডাক্তার অনিলবাবু আসলেন।

অনিলবাবু—কেমন বোধ করছেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাল না। আজকাল খুব দুশ্চিন্তা হয়। একজনের ভালর যন্য হয়ত খুবই করি। সে অন্যরকম চলে। সন্দেহ হয়। কিন্তু বিশ্বাস হয় না আমার সন্দেহকে। পরে হয়ত একদিন সে আমাকে একটা মার দিয়ে গেল। এই সব ব্যাপারে খুব কষ্ট হয়। আবার আমাকে ঐভাবে কষ্ট দিয়ে সে কত কষ্ট পাচ্ছে, তা'ও দুঃসহ লাগে। তা'র কষ্টটাকে নিজের কষ্ট ব'লে মনে হয়। শরীর খারাপ থাকাকালীন ঐ সব দুশ্চিন্তা এক-এক সময় এত বেশী হয় যে ঘুম আসতে চায় না।

অনিলবাবু—আপনি ত সব বোঝেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বুঝলেও আমার প্রকৃতি আমাকে বাধ্য করে মানুষের কষ্ট দূর করতে। কিন্তু যা'র ভাল করব সে যদি সহযোগিতা না করে তা'হলে কিছু করা যায় না। কত-কত মানুষের সঙ্গে আমি জড়ান, তাদের কতজনের কত দুঃখ, কষ্ট, অসুখ, অশান্তি। নিজের কষ্টবোধের সঙ্গে-সঙ্গে তাদের কষ্টও যেন চেপে ধরে। কত ক্লিষ্ট মুখের ছবি ভেসে আসে। অস্থির লাগে।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর দালানে পূতঃশুভ্র শয্যায় শুয়ে ছিলেন। বিকালে অপেক্ষাকৃত ভাল ছিলেন। উপস্থিত সবাইকে বলেছিলেন—পারিবারিক যাজন একান্ত প্রয়োজন, বলতে হয়—মানুষ ভালই চায়। শরীর ভাল থাকে যাতে, মন ভাল থাকে যাতে, সকলকে নিয়ে সুখে বাঁচতে পারে যোতে তাই চায়, তারই পথ খোঁজে মানুষ আর তাই ত ধর্ম। এই ধর্ম পূর্ণমাত্রায় জীবন্ত থাকে ইষ্টে। তাঁকে

কায়মনোবাক্যে ভাল বাসলে ও অনুসরণ করলে ধর্ম্ম জেগে ওঠে জীবনে। এটা শুধু বললে হয়না। ক'রে দেখাতে হয়। মা-বাবা যদি ইষ্টপ্রাণ হয়, তবে তাদের দেখে ছেলেমেয়ে আপসে আপ মাতৃভক্ত, পিতৃভক্ত ও ইষ্টপ্রাণ হ'য়ে ওঠে। এইই উন্নতির তন্ত্রধারক।

এর একটু পরে হরিদাসদা (সিংহ) একটা বড় শতরঞ্চ ও তার চাদরের জন্য ভাল মারকীন নিয়ে এসে দেখাচ্ছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর দেখে প্রীত হ'য়ে ডগমগভাবে বললেন—আমরা গরীব হ'তে পারি, পরমপিতার দয়ায় সকলে মিলে থাকি কিন্তু রাজার মত। যতই নগণ্য হও। এ দরবারে তোমরা যারা আছ, তোমাদের প্রত্যেকেই এক-একজন এক-একটি বায়ু, বরুণ, ইন্দ্র, চন্দ্রের মত। না ক'রেই এতখানি। করলে কী যে হ'তে পারত, ভেবে দেখ। পরমপিতাকে যারা ধ'রে থাকে, তারা সব অবস্থার মধ্যে তাঁর অপার দয়ায় টেরপায় যে তিনি তাদের সর্ব্বদা আগলে রেখেছেন। এর পরক্ষণেই কাশীদা (রায় চৌধুরী) শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্য ওযুধ কিনে নিয়ে আসলেন।

কাশীদা বসার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—চিকিৎসক হ'তে গেলে পর্য্যবেক্ষণ চাই। রোগীর আপাদমস্তক এক নজরে দেখে ধ'রে ফেলা চাই—তার মোচটা কেমন, ভ্রূর রেখাটা কেমন, চোখের ভঙ্গীটা কেমন, কানটা কিরকম, চুলের বিন্যাস কেমনতর, প্রথম কী কথা কয়, কথাটার ভাব ও কায়দা কেমন, পাটা ফেলে কেমনভাবে—এর থেকে বিশিষ্ট লক্ষণ ঠিক করে নিতে হয়। এমন ক'রে বই পড়া চাই, ওষুধের চরিত্র চেনা চাই। আয়ত্ত করা চাই, ওযুধের চেহারা জানা চাই, যাতে রোগীর হাঁটাটা পর্যন্ত ক'য়ে দেবে সে কী ওষুধ চায়। এইগুলি যে যত এস্তামাল করবে সে তত হবে স্বাভাবিক চিকিৎসক, সাজান চিকিৎসক নয়। প্রথম গুচ্ছের ওযুধ দিতে নাই। তুমি যেমন ১২০টা ওযুধওয়ালা মেটেরিয়া মেডিকাটা পড়ছ। ওইটের উপর ভিত্তি ক'রে অগ্রসর হওয়া লাগে। তা' না ক'রে এক সঙ্গে কতকগুলি বড় বড় বই পড়তে গেলে তা' হজম

হয় না। কোনটার উপর দখল হয় না। হাতুড়ের মত হ'য়ে থাকে।

কাশীদা—ডাইলিউশন এবং সময়ের ব্যাবধান সম্বন্ধে আপনার কী মত?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দীর্ঘস্থায়ী অসুখ হ'লে উচু মাত্রা দিয়ে লক্ষ্য করতে হয়। রোগের চরিত্র যদি ধ'রে থাক এবং যদি বোঝ ওষুধ নির্ব্বাচন ঠিক হ'য়েছে অথচ সময় মত কোন কাজ হ'চ্ছে না, এমন ক্ষেত্রে প্রয়োজনমত ঐ ওষুধের উচ্চতর মাত্রা দিতে পার। যে কোন মাত্রাই দাও, ওষুধের চরিত্র ঠিক হ'লে কাজ দেবেই, সময় কম-বেশী নিতে পারে। বিশিষ্ট লক্ষণই মাত্রা ব'লে দেয়।

এরপর বললেন—কতকগুলি গ্রহের চরিত্র যদি ঠিক ক'রে রাখ এবং তার সঙ্গে ওষুধের মিল ক'রে রাখ ওতেও ফল পেতে পার। এভাবে এস্তামাল করলে জ্যোতিষ যদি নাও জান, জ্যোতিষমতে ফলাফল ক'য়ে দিতে পারবা। আর আছে পুরোন একখানা চটিবই নাড়ীবিজ্ঞান ব'লে। সেই বই প'ড়ে ও সঙ্গে-সঙ্গে রোজ ২০।২৫টা হাত দেখে নাড়ী জ্ঞানটা যদি আয়ও ক'রে নিতে পার, তখন নাড়ী দেখেই বুঝতে পারবে কি রোগ, কিব্যাপার।

৩রা পৌষ, শনিবার, ১৩৫৫ (ইং ১৮।১২।৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে গোল তাঁবুতে আছেন। পূজনীয় বড়দা আছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), প্যারীদা (নন্দী) প্রভৃতিও উপস্থিত। ডাক্তার অনিল-বাবু (ব্যানার্জী) এসেছেন, শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখছেন। কথায়-কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আগের মত ডাক্তার আজকাল আর দেখা যায় না।

বড়দা—আমাদের দেশে একই ডাক্তার হয়ত দাঁতও দেখছে, চোখও দেখছে, অস্থিও দেখছে, হার্টও দেখছে, লাঙস্‌ও দেখছে, তাই পাশ্চাত্ত্যের ডাক্তারদের মত বিশেষজ্ঞ হ'তে পারে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সবটা দেখতে পারে সেই ত প্রকৃত চিকিৎসক। মানুষের চিকিৎসক সে। শুধু চক্ষু-চিকিৎসক নয়।

অনিলবাবু—রাশিয়ায় রোগ নিরূপণ মূলক বিশেষ পরীক্ষা ও তার বিবরণ ছাড়া কোন ডাক্তার চিকিৎসায় হাতই দেয় না। তাদের নিজস্ব রোগ নির্ণয় ব'লে কিছু নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওতে power of intuition (অন্তর্দৃষ্টির ক্ষমতা) ক'মে যায়।

সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর দালানে নিজের ঘরে বিছানায় বালিসে ঠেস দিয়ে বসেছিলেন। রাজেনদা (মজুমদার), প্রবোধদা (মিত্র) প্রভৃতি এবং মায়েদের মধ্যে অনেকে ছিলেন।

পূজনীয় বড়দা আসলেন।

তিনি প্রসঙ্গতঃ বললেন—আমাদের অমন সুসজ্জিত প্রেস ও কারখানা যদি কলকাতায় আনা যেত, ওর থেকে কতটাকা উপার্জ্জন হত, কতলোক প্রতিপালিত হ'তে পারত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সবই করা যেত। আমি ভেবেছিলামও। কিন্তু মানুষের কথা ভেবে সাহস পাই নি। যখনই মনে হয়েছে, তখনই ভেবেছি মানুষ কোথায়! যখনই দেখলাম মর্য্যাদাওয়ালা লোক আমার জিনিষ চুরি ক'রে অস্বীকার করে, এতখানি insincere (কপট), তখনই আমি স্তব্ধ হ'য়ে গেলাম। আমি যতদিন আছি খেতে পারবে পরমপিতার নাম ভাঙ্গায়ে, স'রে গেলে এমনতর এক একজনের ৫০্ টাকা এমন কি ১৫্ টাকা দাম হয় কিনা সন্দেহ। যা হোক, যা' গেছে ওসব ভাবি না। পরমপিতার দয়ায় তোমরা যদি বেঁচে থাক, কাজ কর, ইঙ্গিতে কত প্রেস, কত কারখানা হ'য়ে যাবে। আসল কাজই যে আমরা করি না। ৩০০০ কৃষ্টিবান্ধবের কথা বলেছি। এতদিন মাত্র ৫০০ হ'লো। কৃষ্টিবান্ধব হ'লে বিশিষ্ট দেড়লাখ দীক্ষার সুবিধা হতো। আর তেমন দেড়লাখ দীক্ষা হ'লে পাকিস্তান, হিন্দুস্থানের সমস্যা সমাধানের চৌদ্দ আনা সম্ভাবনা ছিল। আর তা' যদি না হয়, প্রেস দিয়ে বা কী করব? আর কোনটা দিয়েই বা কী হবে? মানুষের জন্যই ত সব। মানুষ যাতে ভালভাবে বেঁচে থাকে, সেইটুকুই ত চাই। আমার কী লাগে। ক'পয়-

সাই বা খাই ? পরমপিতার দয়ায় তা জুটবেই। করি যা' তা' তোমাদের সবার জন্য। ...যে টাকাগুলি খরচ না করলে পারতাম, তা' থাকলে এত-দিনে হলার-টলার কেনা যেত। আরো বেশী লোক খাওয়াতে পারতাম। কিন্তু না ক'রে কী করি ? মানুষের মর্য্যাদার দাম বেশী মনে করি।

খানিকটা বাদে ডাক্তার অনিলবাবু আসলেন। তাঁকে কথা প্রসঙ্গে বললেন—রাত্রে ঘুম ভাঙ্গলে মনে হয়, আমি আছি কিন্তু যাদের ভিতর জন্মে ছিলাম, যাদের নিয়ে চলতাম, তাদের অনেকেই নেই। তারপর আর একটা জিনিষ, আমার কথা কওয়ার লোক নেই।

অনিলবাবু—কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনার সমান কর্ম্মী যদি কেউ না থাকে, আশ্রিত যদি হয়, তার কাছে কি আপনি সব কথা বলতে পারেন ? মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপ্যালের কাছে আপনার যে কথা আসে, আপনার কম্পাউণ্ডারের কাছে সে কথা বেরুবে না। আমাকে অনেকখানি suppress ( নিরোধ ) ক'রে চলতে হয়। আবার suppression ( নিরোধ ) আমার পক্ষে ত খারাপ।

৪ঠা পৌষ, রবিবার, ১৩৫৫, (ইং ১৯।১২।৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে গোল তাঁবুতে।

কলকাতা থেকে ডাক্তার সি০ সি০ সাহা এসেছেন শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখতে। তিনি অনিলবাবুর জন্য অপেক্ষা করছেন। পূজ্যপাদ বড়দা সহ কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), সুশীলদা (বসু),প্যারীদা (নন্দী), প্রবোধদা (মিত্র), কিরণদা (মুখার্জ্জী), বীরেনদা (ভট্টাচার্য্য), পরেশ ভাই (ভোরা) প্রভৃতি আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রফুল্লকে বললেন—সকালের লেখাটা পড়বি নাকি ? পড়া হ'লো—

যা' করতে যা' যা' লাগে,
বা যা' যা' দিয়ে সে-কাজ করতে হয়,
করবার পূর্ব্বাহ্নেই সেগুলি

যথাবিহিত পরীক্ষা ক'রে দেখে নিও—
যথাযথ কার্য্যক্ষম আছে কিনা—
এমনি ক'রে কাজে নেমো,
অনেক ঝক্রঝাটের দায় থেকে এড়াবে,
নাকাল হবে কম,
কৃতকার্য্য ও হবে—
যদি তেমনি ক'রে কর তা;
সঙ্কল্প মানেই এতখানি।

পড়ার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সঙ্কল্প মানে শুধু মনে মনে ঠিক করা নয়; করা, সৃষ্টি করা, যোগাড় করা, সমাধা করা-এতখানি।

তারপর ডাক্তারবাবু (ডাঃ সাহা)র সঙ্গে হিন্দুস্থান-পাকিস্তান সম্বন্ধে কথা উঠল। ডাক্তারবাবুর বাড়ী পূর্ব্ববঙ্গে। তাই বলছিলেন এরপর যদি কখনও ফিরে পাওয়া যায়, তাও সুধু জমিটুকু পাওয়া যাবে। যা' করা হয়েছিল, সবই ত নষ্ট হ'য়ে যাবে ততদিনে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাও লাভ। যে ধুলি দিয়ে গজিয়ে উঠেছেন, সেই ধুলির মহিমায় আপনি আবার গজিয়ে উঠবেন, এই বিশ্বাসটুকু আছে।

ডাক্তারবাবু—বহু বাধা বিঘ্নই ত মানুষের জীবনে আসে। আত্ম-বিশ্বাসের বলে সব অতিক্রম ক'রে জয়ী হওয়ার মধ্যেই ত মানুষের কৃতিত্ব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ চলে, একটা খুটো থাকে। তাই ধ'রেই এগিয়ে চলে। সেই খুটোটা হাত থেকে স'রে গেলেই সে বিকল হ'য়ে পড়ে। আমার রোগের মূলও তাই। আমার জীবনের ভালবাসার খুটো চ'লে গেছে। মা না থাকায়, আজ আমার এই দশা।

ডাক্তারবাবু—সেটা দুঃখের, তবে আপনি অধীর হ'লে চলবে কেন? আমার জীবনে কত বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়ে আসতে হয়েছে। বিলেতে একবার ফেল করলাম। তখন পড়া ছেড়ে দিয়ে, ডাক্তারী ক'রে টাকা জমিয়ে পরে আবার প'ড়ে পাশ করতে হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাই আপনার ঠিক-ঠিক শেখা হয়েছে, পাশ করাটা ত আর শিক্ষা নয়। বাস্তব করাটাই আপনার জানাকে পাকা ক'রে দিয়েছে।

ডাক্তারবাবু—পাশেরও একটা মূল্য আছে। কিছু না জানলে পাশ করা যায় না। তবে পরীক্ষায় পাশেই শেষ হয় না। প্রত্যেকটি রোগীকে যখন হাতে নিই, তখনই এক-একটা পরীক্ষা। ক'রে-ক'রে অভিজ্ঞতা বাড়ে। সেটা আমাদের কাজেও যেমন, আপনাদের কাজও তেমনি। আপনি কত লোককে guide (চালনা) করেন, আমার মনে হয় যতদিন যাচ্ছে, তত আপনার অভিজ্ঞতা বাড়ছে। কিংবা আপনার জ্ঞান হয়ত ঐশ্বরিক। আমি ত দেখতে পাই অনেক রোগীকে সুস্থ করতে গিয়ে মানসিক চিকিৎসাও করতে হয়। শুধু ওষুধে হয় না। ওষুধ শুধু তা'কে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করার জন্য।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কতকগুলি deficiency (খাঁকতি) এর দরুণ disturbance (গোলমাল) হয়, food (খাদ্য), medicine (ওষুধ) সেটা make-up (পূরণ) ক'রে দেয়। আদৎ জিনিষ হ'লো নিজের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করা। আর তাই হ'লো ধর্ম্মদান।

ডাক্তারবাবু—তখনও মাঝে-মাঝে সাহায্য করতে হয় যাতে প'ড়ে না যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—করাই লাগে—তার দাঁড়ানটা যদি আমার interest (স্বার্থ) হয়। পয়সা মানে কী? পয়সা মানে ত মানুষ। আর মানুষ interest ( স্বার্থ ) হ'লেই সব হয়।

ডাক্তারবাবু—যাদের ভিতর ধর্ম্মভাব আছে, তাদের কাছে ধর্ম্মের কথাও বলতে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর্ম্ম সম্বন্ধে বলা ছাড়া উপায় নেই। মানুষ বাঁচতে চায়, বাড়তে চায়, সুখে থাকতে চায়, আর তাকেই বলেই ধর্ম্ম। যাই হন চিকিৎসক হন, উকিল হন, ব্যাবসাদার হন, ঐটে যদি basis (ভিত্তি) না হয়, একটা মানুষকে ৫ কোটি টাকা দিলেও কিছু হবে না তার। ধর্ম্ম তাই চিৎকার করছে অমৃতত্বের জন্য চিরবর্দ্ধনশীল হ'য়ে অনন্তজীবন ও উপভোগই সত্তার একমাত্র আকুতি।

ডাক্তারবাবু—তাই ত, নচেৎ বাঁচার জন্য পাগল হয় কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাঁচার জন্য পাগল মানে মানুষ ধর্ম্মের জন্য পাগল।

প্রফুল্ল—(ডাক্তারবাবুকে) আপনি যে মানসিক চিকিৎসার প্রসঙ্গে বলছিলেন, একজন কোন পেশায় অকৃতকার্য্য হ'লে তাকে তার উপযোগী পথ বলে দেন। সেটা কেমনভাবে বলেন ?

ডাক্তারবাবু—ইউরোপে যেমন পেশা সম্বন্ধে নির্দ্দেশদানের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আছে, সেই অনুযায়ী চেষ্টা করি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের সহজাত সংস্কারগত কাজের organic adjustment ( বৈধানিক সংস্থিতি ) থাকে, মস্তিষ্কের স্নায়ুবিধানের বিন্যাস তেমন থাকে, বিশেষগুনের nodule ( পিণ্ড ) থাকে, তার উপযোগী ও পোষণী environmental impulse ( পারিবেশিক সাড়া ) পেলে বা সেইটের কাছে গেলে তা' জাগ্রত ও জ্বলন্ত হ'য়ে ওঠে। যেমন অতসী ফুলের বিভিন্ন রকম আছে, তার প্রত্যেকটার পোষণ আলাদা। সেগুলি ওলটপালট ক'রে একাকার করতে গেলে হয়ত ফল পাওয়া যাবে না। প্রত্যেকটার ধরনই অলাদা, বৈধানিক সমাবেশ স্বতন্ত্র, সার্থকতা ও উপযোগিতাও বিশিষ্ট, তাই যা-কিছুর সংযোগও ঘটাতে হবে বিহিতভাবে, নয়ত ফল ভাল হবে না।

কেস্টদা—বর্ণ কী ? ওকে কী বর্ণ বলে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই-ই বর্ণ। সুপ্রজননের জন্যও বর্ণ ও অন্যান্য জিনিষ দেখা লাগে। কার সঙ্গে কার মিল হতে পারে, দেখতে হয়। আর প্রত্যেককে তার instinct (সহজাত সংস্কার) অনুযায়ী কাজে engage (নিযুক্ত) করাই ভাল। (প্রফুল্লকে দেখিয়ে) ও যেমন এখানে ভিড়ে গেল, এখানকার কথাবার্তাগুলি গুছিয়ে সামঞ্জস্য ক'রে লেখে, এতে taste (রস) পায়। এম এ পাশ, ইচ্ছা করলে অন্য কাজও করতে পারত। কিন্তু এইটেই পছন্দ করে। ওকে এটা থেকে সরিয়ে অন্য কাজে দিলে কিন্তু ঠিক হবে না। প্রত্যেকের সংস্কার অনুযায়ী বৃত্তি নির্ব্বাচন হ'লে জাতটার efficiency (দক্ষতা) বেড়ে যায়। এখানেও ঐ বর্ণ। আর chastity (সতীত্ব) জিনিষটা একান্ত প্রয়োজন। ঠিক-ঠিক ক্ষুধা যদি

হয়, এবং তখন পচ্ছন্দসই উপাদেয় খাদ্য যদি পাওয়া যায়, তা' খাবার সময় যেমন উপযুক্ত লালাক্ষরণ হয় এবং হজমও ভাল হয়, স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হয়। তেমনি বিহিত পরিণয় যদি হ'য়ে থাকে এবং স্ত্রীর যদি থাকে স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধাবিভোর সুকেন্দ্রিক অনুরাগ অর্থাৎ তার সমগ্র সত্তা দিয়ে স্বামীর সেবা ক'রে সে যদি নিজেকে ধন্য ও কৃতার্থ বোধ করে তাহলে তেমনতর দম্পতির বিধিমাফিক উপগতির সময় স্ত্রীর দেহ থেকে এমন সুষ্ঠু বৈধানিক ক্ষরণ হয় যা' সন্তানকে ক'রে তোলে সর্ব্বাংশে পুষ্ট। সতী স্ত্রীর সেবা ও প্রেরণায় স্বামীও বেড়ে ওঠে সব দিক দিয়ে এবং স্ত্রীর জীবনও সার্থক হয়ে ওঠে এর ভিতর দিয়ে। সমগ্র পরিবারেও শান্তি ও সমৃদ্ধি আসে। সতীত্বের তাই এতখানি প্রয়োজন।

ডাক্তারবাবু—স্বামীরও ভালবাসা থাকা চাই স্ত্রীর প্রতি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—স্বামীর যদি আবার স্বামী না থাকে, তার যদি surrender (আত্মসমর্পণ) না থাকে তাঁতে, সে যদি স্ত্রীকে খুশী করতে ছোটে, তাতে ফল হবে বিপরীত। আপনার যদি ডাক্তারীতে surrender (আত্মদান) না হয়, তবে আপনি ভাল ডাক্তার হ'তে পারবেন না, কিন্তু এতে আত্মদান যদি থাকে, আপনার জেল্লা বেড়ে যাবে। সমগ্র ব্যক্তিত্বের উৎসর্গ যদি থাকে কোন সুনিয়ন্ত্রিত উন্নত ব্যক্তিত্বে, তা'হলে তো কথাই নেই। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে যদি তাঁতে কেন্দ্রায়িত হ'য়ে চলে, সন্তান হয় এক-একটি সূর্য্য বগলে করা হনুমান।

কথা বলতে-বলতে শ্রীশ্রীঠাকুরের চোখমুখ আবেগে বিস্ফারিত হ'য়ে উঠল।

একটু থেমে বললেন—ব্যাঘাত হয়, emotionally (আবেগের সঙ্গে) বলতে পারি না। আমার এই অবস্থাটা ঠিক ক'রে দেন। আগে অনবরত এই সব কথা বলতাম। এতেই আমার ভাল লাগে। এখন যেন পেরে উঠি না।

ডাক্তারবাবু—আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনুন। আপনি সব পারবেন আগের মত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিজে নিজের শরীরের উপর বিশ্বাস করতে পারছি না। আপনি যদি বলেন আমি সারিয়ে দেব, ভার নেন, তবে বিশ্বাস হয়।

ডাক্তারবাবু—সাহায্য করব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মা ছিলেন আমার main prop ( প্রধান অবলম্বন )। মা যাবার পর দেখি আমি বহুর prop ( অবলম্বন ) হয়ে আছি, আমার prop (অবলম্বন) কেউ নাই। কতরকমের shock ( আঘাত ) গেল পরপর। কত অবাঞ্ছিত, অপ্রীতিকর ঘটনা। ভোলা রায়ের মোকর্দমা যখন চলতে লাগল, আমার মনে হল Blood pressure ( রক্তের চাপ ) তবু একটা আশ্রয়, ও সব থেকে aloof ( আলগা ) হ'য়ে ভুলে থাকা যায় যতক্ষণ।

ডাক্তারবাবু—অনেক সময় এমন হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ বলে মরে গেলে বাঁচি—মেয়েছেলেরা খুব বলে। তার মধ্যেও বাঁচার ইচ্ছা। বাঁচার চেষ্টা সবটার মধ্য দিয়ে।

ডাক্তারবাবু—আপনি নিজের কথা মোটে ভাববেন না, নিজের কথা ভাবতে গেলেই খারাপ হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Otherwise engaged ( অন্যথা ব্যাপৃত ) থাকলে ভাল থাকি, তাও সবসময় ভাল লাগে না। ওগুলি জেগে ওঠে।

ডাক্তারবাবু—আমাদের অচেতন ও অবচেতন স্তরে যা আছে তা চাপ দিতে থাকে। একটা conflict ( দ্বন্দ্ব ) এর মত হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এইসব অপ্রীতিকর স্মৃতি ও অনুভূতি বেশি হতে থাকলে unconscious mind refuses to exist (অজ্ঞাত মন বাঁচতে চায় না)। Extreme unbearable suffering-এ ( চরম অসহনীয় কষ্টে) রামচন্দ্রকে সরযূর জলে ঝাঁপ দিতে হয়েছিল।

এরপর অনিলবাবু আসলেন। তখন ডাক্তারবাবু শ্রীশ্রীঠাকুরকে পরীক্ষা করলেন। পরে ডাক্তারবাবু, অনিলবাবু ও প্যারীদা পরামর্শ করতে অন্য ঘরে গেলেন।

বিকালে তখন বেলা পড়ে এসেছে। শ্রীশ্রীঠাকুর, পূজনীয় বড়দা ও কেষ্টদা, দক্ষিণাদা, প্যারীদা, প্রমথদা প্রভৃতি সহ রোহিণী রোডে বেড়াতে বেরিয়েছেন। হাঁটতে-হাঁটতে গুরুদয়ালদার বিষয় বললেন—নামধ্যান ভাল করে না করে যদি কেউ ভজন করে, তবে তাঁর হৃৎপিণ্ড ও স্নায়ু দুর্বল হতে পারে। তাই, ভাল করে নামধ্যান করে পরে ভজন করতে হয়। ভজন হল শব্দের। শব্দের ভজন মানে শব্দের সেবা, পরিচর্য্যা, অনুসরণ। অবিহিত পন্থায় ভজন করাজনিত যে হৃৎপিণ্ড ও স্নায়ুর দুর্বলতা, তা শঙ্খপুষ্পী ও অর্জুনের গুঁড়ো দুধ ও চিনি দিয়ে খাওয়ায় প্রায়ই সারে।

রাত্রিবেলায় অনিলবাবু শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখতে আসলেন। তাঁর দাঁতে ব্যথা।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—ঐ ডাক্তারবাবু খুব ভাল লোক। সকালে আপনি আসবার আগে ওঁকে বলছিলাম—সত্যিকার ক্ষুধা যদি থাকে এবং তখন পছন্দসই, ভাল, আগ্রহউদ্দীপী খাবার যদি পাওয়া যায় তাতে যেমন লালাক্ষরণ ও হজম ভাল হয় তেমনি স্ত্রীরও স্বামীর প্রতি যদি শ্রদ্ধাবিভোর ক্ষুধা থাকে, অচ্যুত কেন্দ্রায়িত অনুরাগ থাকে, তবে তাদের মিলনের সময় স্ত্রীর দেহ থেকে এমনতর রসক্ষরণ হয় যা পুংবীজকে সর্বতোভাবে পোষণ দিয়ে সুসন্তানের জন্ম সম্ভব করে তোলে। এ কথা উনি স্বীকার গেলেন। অবশ্য বিয়ে ঠিকমত হওয়া চাই। বৈশিষ্ট্যকে নষ্ট করে বিরুদ্ধ মিলন ঘটাতে গেলে বিপর্যয় হয়। উদ্ভিদ জগতে, মানুষের জগতে, জীবজন্তুর জগতে সর্বত্র এটা খাটে। মিলন হওয়া চাই সঙ্গতিশীল। আবার ইষ্ট, কৃষ্টির অনুসরণও চাই। তাতে বংশগত গুণাবলী অটুট ও বর্দ্ধনশীল থাকে। জন্মগত সংস্কার ও অর্জিত গুণের মধ্যে পার্থক্য ঢের। একজন বৈশ্য যত বড়ই হোক না কেন, সে কিন্তু বিপ্রকন্যাকে বিয়ে করতে পারে না। কারণ তার বীজ বিপ্রকন্যার ডিম্বকোষকে পরিপূরণী রসদ যোগাতে পারে না। তাই, প্রতিলোম বিবাহ নিষিদ্ধ।

৫ই পৌষ, সোমবার, ১৩৫৫ (ইং ২০।১২।৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে গোলতাঁবুতে শুভ্রশয্যায় উপবিষ্ট। তাঁর শরীর আজ অপেক্ষাকৃত ভাল। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), প্রবোধদা (মিত্র), ব্যোমকেশ ভাই (ঘোষ), গোপেনদা (রায়), মহেন্দ্রদা (হালদার), সরোজিনী মা প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত। কেষ্টদা মনুসংহিতার একটা বিষয় পড়ে সোনাচ্ছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রসঙ্গত বললেন, লক্ষী কথা এসেছে লক্ষ্ ধাতু থেকে। তার মানে আলোচন, চিহ্নীকরণ, অঙ্কন, জ্ঞান, দর্শন এইসব গুণ যাদের আছে তারাই লক্ষী। মেয়েদের সব দিক দিয়ে দক্ষ করে তুলতে হয়, যাতে তারা মুর্তিমতী লক্ষ্মীরূপে গড়ে উঠতে পারে।

খানিকটা পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার লেখা ও বলাগুলি হল emblem of my activity (আমার করার প্রতীক)।

এরপর ডাক্তার অনিলবাবু আসলেন শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখতে।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে বললেন—রাত্রে ঘুম ভাঙ্গলে কত কথা ভিড় করে মনে আসে। বলতে পারি না, বলার জায়গা নেই। মা গিয়ে আমি নিঃস্ব। লোক ত কত আছে, কিন্তু এমন লোক যদি না থাকে, যার কাছে বললে নিরাকরণ করতে পারে, তবে যার তার কাছে বললে ত হয় না। তেমন ভাই-বন্ধুও নেই যার কাছে খুলে মনের ব্যথা বলতে পারি, তাই suppression (নিরোধ)ই হয়েছে আমার সম্বল। দেখুন মানুষ হল লতার মত। কাউকে ধরে তাকে উঠতে হয়, দাঁড়াতে হয়। টাকা-পয়সা ধনৈশ্বর্য্য কোনটাই কিছু নয় যদি ঐ জিনিস না থাকে।

দুপুরে সেবা সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল।

প্রফুল্ল—কাউকে যদি আমি সেবা দিই, সে যদি পরে তার সামর্থ্য অনুযায়ী স্বতঃদায়িত্বে অন্যকে সেবা দেয়, তাহলে ত ভালই। নচেৎ তাকে অন্যের জন্য কাজে লাগান ত সঙ্গত। তাহলেই ত জিনিসটা চারায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি সেই জন্য থেকে-থেকে মানুষের মুখের দিকে

তাকিয়ে এটা চাই, ওটা চাই। সবার কাছে চাই না। ২৫ জন বসে রয়েছে, তার মধ্যে একজনের কাছে চাইলাম। সে হয়ত অক্ষম।

প্রফুল্ল—মুখের দিকে তাকিয়ে চান কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখি কার উৎসাহ, উদ্যম কম। তাকে হয়ত কই—'পাঁচটা টাকা নিয়ে আয় ত'। সবসময় যে এই জন্য চাই, তা নয়। যা হোক কথামত যে সংগ্রহ করে আনে, তারপর দেখবে তার অনেকটা খুলে গেছে।

৬ই পৌষ, মঙ্গলবার, ১৩৫৫ ( ইং ২১।১২।৪৮ )

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে গোল তাঁবুতে বিছানায় অর্ধশায়িত। শীতের মিঠে রোদ এসে পড়েছে বিছানায়। বাইরে অনেকে রোদে আরাম করছেন। প্রমথদার ( দে ) হাতে সিবা কোম্পানির একটা ডাইরি দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমাদেরও ঐরকম সাইজ, ঐরকম বাইণ্ডিং বই ছাপান লাগে।

খানিকটা পরে কেষ্টদা এসে কাছে দাঁড়াতেই শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আপনি যেমন করে আমার কাজের জন্য নানা বিষয় পড়েন, জানেন, ভাবেন, আয়ত্ত করেন, ঋষিরাও বোধ হয় ঐভাবে চেষ্টা করে একইসঙ্গে চিকিৎসক, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক ও শিল্পী হয়ে উঠতেন।

প্রফুল্ল—কেমন করে সম্ভব ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সুকেন্দ্রিক অনুশীলনের ফলে সমস্ত জ্ঞানটা integrated (সংহত) হত। সর্বজ্ঞত্ববীজ স্ফুরিত হত।

রাত্রে শ্রীশ্রীঠাকুরের খুব দাঁতে ব্যথা। গোল তাঁবুতে বিছানায় শুয়ে আছেন। খুব কনকনে ঠাণ্ডা পড়েছে। পর্দা ফেলে দেওয়া হয়েছে। পেছন দিকের আলোটা জ্বালান। পূজ্যপাদ বড়দা এবং আরও কয়েকজন পাশে বসে আছেন।

প্রফুল্ল প্রশ্ন করল—একক উচ্চৈঃস্বরে নাম করা সম্বন্ধে আপনার কী মত ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তপস্যা করব যে-জিনিষ নিয়ে তার যদি sanctity (পবিত্রতা) না রাখি, এলোমেলোভাবে করি, তবে concentric (স্বকেন্দ্রিক) রকমটা কমে যায়। ইষ্টমন্ত্র যত মনে-মনে করা যায়, তত জোর বাড়ে। উচ্চৈঃস্বরে করলে যে একেবারে ফল হয় না তা নয়। তাই, সম্পূর্ণ নিষেধ না করে, কোনটায় ফল ভাল হয় সেইটে বলাই সঙ্গত।

৮ই পৌষ, বৃহস্পতিবার, ১৩৫৫ (ইং ২৩।১২।৪৮)

সকালে বেশ রোদ উঠেছে। শ্রীশ্রীঠাকুর গোল তাঁবুতে উপবিষ্ট। বড়াল-বাংলোর মাঠে রোদের মধ্যে কয়েকজন ঘোরাফেরা করছেন। অদূরে আর একটা তাঁবুর মধ্যে ফরাসে পূজ্যপাদ বড়দা কয়েকজনকে নিয়ে বৈঠক করছেন। কেষ্টদা প্রমুখ কয়েকজন তাঁবুর পাশে দাঁড়িয়ে। কেষ্টদা নাড়ীবিজ্ঞান বই পড়ছেন। সেই সম্বন্ধে কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পড়তে হয়, আর পড়ার সঙ্গে নাড়ী দেখে পড়ার বিদ্যেটা পরখ করতে হয়। ভূয়োদর্শন ছাড়া এসব জিনিস হবার নয়।

কেষ্টদা—ডাক্তারী মতে দেখাও কি চলে এই সঙ্গে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা দেখবেন।

কেষ্টদা—একটা মিশ্রণ হয়ে যাবে, দুটোর দুই রকম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যা পড়েছেন, তার পুরশ্চরণ হয়ে যাবে। ওর মধ্য দিয়ে রীতি এসে যাবে। সার্থক সমন্বয় ঠিক পাবেন।

জনৈক দাদা শ্রীশ্রীঠাকুরকে বললেন—আমার ছেলেকে আশীর্বাদ করবেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেটা ত আমার স্বার্থ।

একটু বাদে একজন সরকারী কর্মচারী আসলেন। তাঁর বাড়ী সাহাবাদ। তিনি বাংলায় কথা বলছিলেন।

প্রফুল্ল—আপনি ত বাংলা বেশ বলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাংলা ভাষাই হিন্দী হয়ে গেছে, এ ভাষাই বাংলা হয়ে গেছে। বাংলার সাথে খুব তফাৎ নেই।

বিকালে বেড়িয়ে এসে শ্রীশ্রীঠাকুর গোল তাঁবুতে বিছানায় বসলেন। অন্ধকার হয়ে এসেছে, তাই আলো জ্বালিয়ে দেওয়া হল। অল্প কয়েকজন কাছে ছিলেন।

কমলা মা (রায়) বললেন—একটি মেয়ে আমাকে খুব ভালবাসে। সে আমার সদাচার দেখে বলে 'আজকাল অতো চলে না'।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বলতে হ'য়—'জীবন ত চালাতে হবে, কোন্ ফাঁক দিয়ে, কোন্ অছিলায় রোগ, মৃত্যু ঢোকে তার ত ঠিক নেই। তার লক্ষ রন্ধ্র। তাই ত হুঁশিয়ার হয়ে আচার মানা'। সদাচার মানে বাঁচার আচার। এটা স্বাস্থ্যের জন্য, জীবনের জন্য প্রয়োজন। বাঁচতে ত চাই ভাই আমরা সবাই। বাঁচার বাড়া পূণ্যি নেই। বাঁচ ভাল করে লক্ষী। আর সকলকেও বাঁচার পথ দেখাও।

কমলা মা—মা আপনার কথা খুব বলেন, তাই সে বলে—মাসিমা গল্প করতে ভালবাসেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বলতে হয়—যে যাকে ভালবাসে, সে তার কথাই কইতে ভালবাসে, বলেও আনন্দ পায়, অবশ্য সে ভালবাসায় যদি কলুষ না থাকে।

কমলা মা—ওর আপনার প্রতি খুব শ্রদ্ধা। ওর দিদিমাকে আপনার সম্বন্ধে বলে—তিনি ভগবান।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বলতে হয়—তিনি ভগবান কি না জানি না ত ভাই। তবে তাঁকে সে ভালবাসে, বড় করে দেখে, তাকে ভাল লাগে। আর ভগবান মানে ষড়ৈশ্বর্য্যবান—ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, জ্ঞান, যশ, শ্রী, বৈরাগ্য—এই ষড়গুণ আছে যাঁতে। কায়দামত টুকটাক একটু বলেই আবার হয়ত অন্য কথা পাড়লি।

কেস্টদা (ভট্টাচার্য্য) ও রাজেনদা (মজুমদার) আসলেন।

জনৈক বিহারী দাদা বললেন—আমার সঙ্গে অনেকে শত্রুতা করে। আর আমার শরীর মনেও সুখ নেই। কী করব?

শ্রীশ্রীঠাকুর কেস্টদাকে দেখিয়ে বললেন—ওই বাবুর সঙ্গে ভাল করে

কথা বলো। ...মানুষের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবে যাতে শ্রদ্ধা হয় তোমার উপর। আর হরদম নাম করবে, ওর মত অস্ত্র নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর হাউজারম্যানের জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে অপেক্ষা করছিলেন। বার-বার জিজ্ঞাসা করছিলেন—কটা বাজলো ?

আসার যময় হয় নি ?

যা হোক রাত্রি ৮-৩০টার সময় হাউজারম্যান ও হেনরী আসলেন। উভয়ে প্রণাম করলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সহ সবাই আনন্দে উচ্ছল।

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্য বদনে)—দেরী হলো কেন ?

হাউজারম্যান—হাওয়াজাহাজ পেতে দেরী হলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাংলা মনে আছে ?

হাউজারম্যান—জসিদি থেকে বাবুর সঙ্গে বলতে-বলতে আসছিলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শরীর ভাল ত ?

হাউজারম্যান—হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মা কেমন আছেন ?

হাউজারম্যান—ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সব ভাল ?

হাউজারম্যান—হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ডুভ্যাল, স্পেন্সার।

হাউজারম্যান—হ্যাঁ। ভাল আছে। স্পেন্সারের বিয়ে হয়ে গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বৌ কেমন হয়েছে ?

হাউজারম্যান—খুব ভাল বৌ হয়েছে। মা বলছিলেন স্পেন্সারকে—এমন মেয়ে পাওয়া খুব luck (ভাগ্য)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হেনরী বাংলা জানে ?

হাউজারম্যান—না।

হাউজারম্যানের বাংলা বলা শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর হাসতে-হাসতে বললেন—ঠিক আছে।

হাউজারম্যান — আপনার শরীর কেমন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর — ভাল না তত, আছে একরকম। মার শরীর ভাল ত ?

হাউজারম্যান হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এইবার গোলাপবাগ গিয়ে খাও, দাও, বিশ্রাম কর গিয়ে। পরে গল্প হবে। দেখো হেনরীর যেন অসুবিধা না হয়।

ওরা প্রণামান্তে বিদায় নিলেন।

৯ই পৌষ, শুক্রবার, ১৩৫৫ (ইং ২৪।১২।৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে গোল তাঁবুতে বিছানায় অর্ধশায়িত। বিছানার উপর রোদ এসে পড়েছে। বাইরে অনেকে দাঁড়িয়ে আছেন। এমন সময় পূজ্যপাদ বড়দা সহ হাউজারম্যান ও হেনরী এসে প্রণামান্তে রকমারি মধু, চকোলেট, একজনের প্রেরিত ছবি প্রভৃতি দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর মমতামধুর কণ্ঠে সহাস্যে বললেন — বড় বৌকে দাও গিয়ে।

ওরা প্রীত হয়ে শ্রীশ্রীবড়মার কাছে গেলেন।

আর একটু বেলা হয়েছে। পূজ্যপাদ বড়দা আছেন। তাছাড়া কার্তিকদা ( পাল ), গোপেনদা ( রায় ), সন্তোষদা ( সাহা ), কালীষষ্ঠী মা প্রভৃতি উপস্থিত।

কালীষষ্ঠী মা একজনের সম্বন্ধে বললেন—সে আগে সন্তোষকে ভয় করত। কিন্তু সন্তোষ আজকাল একটু বেশী আদর দেখানতে তার সমীহ কমে যাচ্ছে।

সেই কথা শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর সন্তোষদাকে বললেন—সম্ভ্রম গেলে তোমাকে দিয়ে ওর কোণ উপকার হবে না।

কালীষষ্ঠী মা কথায়-কথায় বললেন—আমরা নিরামিষাশীরা বাইরে অন্য জায়গায় গেলে বড় অসুবিধা হয়। আত্মীয়স্বজনরা বিরক্ত বোধ করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিরক্তি কী? ভক্তি বেড়ে যায়। সুশীলদাকে

মাদ্রাজের গোঁড়া বামুনেরা পর্যন্ত কত সমাদর করত। তারা যে সদাচার পালন করে না, সুশীলদা তা করে। সুশীলদাকে একটু তরকারি খাওয়াবার জন্য কী আগ্রহ। সুশীলদা হাতজোড় করে বলে—আমি ত খাই না। পরিবারশুদ্ধ সকলে অবাক্ হয়ে ভাবে, এমন কায়েত ত দুনিয়ায় দেখি নি, বামুন কোথায় লাগে? যারা অব্রাহ্মণের ছায়া মাড়ায় না বললে চলে তারাই তাকে দোতলায় নিয়ে গিয়ে সেরা ঘরে স্থান করে দেয়, সেবার জন্য পাগল হয়ে ওঠে।

এরপর বেলা গোটা এগারটার সময় কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), কাশীদা (রায়চৌধুরী) প্রভৃতি আছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ বললেন, রামকৃষ্ণ ঠাকুরের লগ্নে বুধ আছে কি না কি জানি। আমার সঙ্গে অনেকটা মিল আছে। রামকৃষ্ণ ঠাকুর ভক্তদের কাছে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করতেন—কে কী বলল তাঁর সঙ্গে কথা বলে। আমারও ধরন আছে ঐ রকম।

প্রফুল্ল—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব যদি কাউকে গাড়ু আনতে বলতেন এবং তিনি যদি না আনতেন তাঁর পায়খানাই হতে চাইত না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমারও ঐরকম হয়।

এরপর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কোষ্ঠীর ছক আনা হলো। শ্রীশ্রীঠাকুরের ছক সম্বন্ধেও কথা উঠল।

সেই প্রসঙ্গে আলোচনাচ্ছলে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার একটা রকম আছে, concrete (বাস্তব) না হলে ভাল লাগে না—যেমন পরজন্ম সম্বন্ধে, অমরত্ব সম্বন্ধে আমি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তব নিদর্শন দেখতে ও দেখাতে চাই। সৃষ্টি করতে চাই তেমনতর বাস্তব নজির। তাই সুশীলদাকে পাঠিয়েছিলাম জাতিস্মরদের সম্বন্ধে সঠিক তথ্য আহরণ করতে। হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধেও আমার মনে হয় অনেক কিছু করবার আছে। আবার আমার ভাল লাগে প্রত্যেকটা জিনিস accurately (সঠিকভাবে) দেখে-শুনে ঠিক করা। কারও কথা শুনে বা উপরসা দেখে পরখ না করে একটা বিষয় সম্বন্ধে কোন theory (তত্ত্ব) খাড়া করা আমার ভাল লাগে

না। অনুভূতি সম্বন্ধে আমি যা বলেছি, তা একেবারে প্রত্যক্ষ। যে কোন মানুষ বিধিমত করলে, তার মত করে ঐসব উপলব্ধির অধিকারী হবেই। আমি যত কথা বলি, তা বাস্তব অভিজ্ঞতার উপর দাঁড়িয়ে। ধর্ম আর বিজ্ঞান আলাদা নয়। বিহিতকরণের ভিতর দিয়েই বিহিত ফল-লাভ হয়। তা যে কোন ক্ষেত্রেই হোক না কেন।

কেষ্টদা—আপনি যেমন বলেন বিশ্বাস নিয়ে বিজ্ঞানসম্মত পন্থায় সত্যানুসন্ধান করতে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ। তা না হলে বঞ্চিত হই। অনেক কিছু আমাদের চোখ এড়িয়ে যায়। বিধিমত করা চাই। করাটা বিধিমাফিক হচ্ছে কিনা, সে সম্বন্ধে আত্মবিশ্লেষণ চাই। কেন কী হচ্ছে বা হচ্ছে না, তার কারণ অনুধাবন করা চাই। নিজের জীবনটা যে ভালভাবে পড়তে পারে, সে মহাজ্ঞানী হয়ে যায়। মূর্ত্ত আদর্শরূপ মানদণ্ড না থাকলে আত্ম-বিচার হয় না। তিনিই হলেন জীবনদাঁড়া। তাঁকে বাদ দিয়ে বৃত্তি-অভিভূত হয়ে চললে নিজেকে বা কোন কিছুকে যথাযথভাবে দেখা হয় না। আদর্শ যিনি, বৃত্তির অধীশ্বর যিনি, তাঁর প্রতি অনুরাগ যত বাড়ে ততই মানুষ বৃত্তিঅভিভূতিমুক্ত হয়। এর ভিতর দিয়েই সত্যের পথে চলার সামর্থ্য গজায়। সত্য মানে সত্তার ধৃতিকে যা বজায় রাখে।

কাশীদা শ্রদ্ধার্হ চলন সম্বন্ধে কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিজে concentric (সুকেন্দ্রিক) থেকে, মানুষের প্রতি স্বার্থান্বিত ও সহানুভূতি সম্পন্ন হয়ে inquisitive auto-initiative service (অনুসন্ধিৎসু স্বতঃদায়িত্বপূর্ণ সেবা) নিয়ে নটের মত যেখানে যেমন প্রয়োজন চলালাগে আর দেখা লাগে কিভাবে প্রত্যেকে তার জীবন চলনার ক্ষেত্রে তোমাকে দিয়ে তার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পরি-পূরিত হতে পারে। এমনতর উন্নত চলন দেখলে, তোমার প্রতি স্বতঃই সশ্রদ্ধ হয়ে উঠবে সবাই। আদৎ কথা, যেমন করে তোমার শ্রেয়শ্রদ্ধা পুষ্ট হয় ও অন্যের শ্রদ্ধার উদ্বোধন হয় তেমনি করতে হবে। নচেৎ কারও উপকার করতে পারবে না। তুমি একজনের জন্য লাখ করলেও

তার যদি তোমার প্রতি শ্রদ্ধা না থাকে, সে তার benefit (উপকার) পাবে না। আদৎ কথা, মানুষের উন্নতি হয় উৎকৃষ্ট গতির ভিতর দিয়ে। তোমার প্রতি যদি কারও শ্রদ্ধা হয়, তাহলে তা সঞ্চারিত হবে তোমার ইষ্টে। এইভাবেই শ্রদ্ধা মানুষকে তরিয়ে দেয়। তাই বলে 'শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানম্'।

প্রফুল্ল—আমি একজনকে বিপদে সাহায্য করলাম, সে যদি আমার প্রতি সশ্রদ্ধ নাও হয় তাহলেও ত সে অসময়ে উপকৃত হলো?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার যদি শ্রদ্ধা না জাগে, তাহলে ত শ্রদ্ধাহীনতা যা কিনা মানুষের বিপন্নতার অন্যতম কারণ, তার মধ্যেই সে থেকে গেল। অবশ্য মানুষের জন্য তোমাদের করাই লাগবে। এই সেবা যত ইষ্টপ্রাণ হয় ততই মানুষের কল্যাণ। আত্মপ্রতিষ্ঠামুখর সেবার ভিতর দিয়ে সেবিতের মনে শুভভাবের সঞ্চারণা হয় কমই। চরিত্র জিনিসটাই চারায়। তাই আমি ইষ্টপ্রাণতার কথা অত করে বলি। যা হোক, সেবাবুদ্ধি জিনিসটাই ভাল। পারস্পরিক সেবা ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না।

কথা হচ্ছে এমন সময় মোহন ভাই ( রাধামোহন ব্যানার্জি ) এসে দাঁড়ালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর স্নেহল কণ্ঠে বললেন—সদাচারে চ'লে, কাজের মধ্যে থেকে ওর দৃষ্টি মিষ্টি হয়ে গেছে, চেহারা মিষ্টি হয়ে গেছে।

মোহন ভাই—আমিও একটু একটু বুঝতে পারি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুইও মানুষকে বুঝিয়ে দিবি যে এতে লাভ বই লোকসান নেই।

এরপর কলোনীর prospectus ( অনুষ্ঠান পত্র ) সম্বন্ধে কথা উঠতে আমাদের কাজের ধরন সম্বন্ধে বললেন—আমরা expansive ( প্রসারণশীল ) নই—expensive ( অপব্যয়ী )।

১০ই পৌষ, শনিবার, ১৩৫৫ ( ইং ২৫।১২।৪৮ )

শ্রীশ্রীঠাকুর গোল তাঁবুর চৌকিতে অর্ধশায়িত অবস্থায় আসীন। অনেকেই কাছে আছেন। বেলা সাড়ে দশটার সময় হাউজারম্যানদা

কিছু কাগজপত্র হাতে করে নিয়ে এসে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করলেন। প্রণাম করে উঠতে না উঠতেই পরম দয়াল আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বললেন—

আজকে আমাদের তাঁরই দিন যিনি দুনিয়ায় এসেছিলেন দুনিয়ার দুঃখ ঘোচাতে—সেই Divine the Great (দিব্য মহাপুরুষ) এর জন্মদিন—যাঁকে আমরা বিদায় দিয়েছি দুঃখে, কষ্টে, যন্ত্রণায়, অনাদরে, অপঘাতে।

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর ইংরাজীতে ঐ ভাব অবলম্বনে বাণী দিলেন—

This day is verily the day of Him
Who is ours,
Who came on earth
to remove the misery of the world
The birthday of that Divine the Great,
Whom we have seen off
in sorrows, sufferings, woe and anguish
in uncared negligence
and bleeding tyranny

বাণীটি বলে শ্রীশ্রীঠাকুর বিষাদগম্ভীর হয়ে গেলেন, তাঁর চোখ দুটি ছলছল।

১৭ই পৌষ, শনিবার, ১৩৫৫ (ইং ১।১।৪৯)

আজ ইংরাজী নববর্ষ। ঋত্বিক অধিবেশন চলছে। প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর গোল তাঁবুতে বিছানায় বসে আছেন। চতুর্দিকে কর্মীবৃন্দ বড়াল-বাংলার প্রাঙ্গণে রোদের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কোথাও ছোট ছোট তাঁবুতে উদ্দীপনাপূর্ণ যাজন চলছে। অনেকেই শ্রীশ্রীঠাকুরের তাঁবু ঘিরে দাঁড়িয়ে আছেন। অপলক নেত্রে তাঁকে দর্শন করছেন। এমন সময় যামিনীদা (রায়চৌধুরী) ওখানে আসলেন।

প্রফুল্ল—২ দিনেই আপনার শরীরের একটু পরিবর্তন হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে বললেন—যে গোয়ালের গরু সে গোয়ালে আসলে ঐরকম হয়।

এরপর জনৈক দাদা যৌথ ব্যবসায়ের অনুমতি চাইলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—উভয়ের প্রতি উভয়ের কারও যেন অবিশ্বাসের সৃষ্টি না হয়, গোলমালের কারণ যেন না ঘটে—তেমনভাবে করতে যদি পার, তবেই ভাল।

এর অনেকক্ষণ পরে অনিলবাবু ( ব্যানার্জি ) শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখতে এলেন। তিনি কথাপ্রসঙ্গে বললেন—বড় মোটরগাড়ি চালাতে সুবিধা, গাড়ি ছোট হলে খুব হুঁসিয়ার হয়ে চালাতে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সাধারণের ধারণা এর উল্টো। করে জানা আর আন্দাজে উপরসা জানা অনেক তফাৎ। করে জানাটাই শিক্ষা।

১৮ই পৌষ, রবিবার, ১৩৫৫ (ইং ২।১।৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে গোল তাঁবুতে আছেন। ননীদা ( চক্রবর্তী ), হরেনদা (বসু), মুরারীদা (দাঁ), অজিত ভাই (গাঙ্গুলী) প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত।

ননীদা বললেন—অনেকে বলে কারও উপর নির্ভর করতে গেলে deficiency ( ঘাটতি ) আসে এবং নিজত্বও বুঝিবা লোপ পায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নির্ভরতা মানে তাঁকে ভরণ করব এই বুদ্ধি। Surrender ( আত্মসমর্পণ ) মানেও তাই। এতে efficiency ( দক্ষতা ) বই deficiency ( ঘাটতি )র কোন scope ( অবকাশ ) নেই। "আমারে ঈশ্বর ভাবে আপনারে হীন তার প্রেমে আমি কভু না হই অধীন।"

ইষ্টভরণ ধান্দায় সব শক্তি-নিয়ন্ত্রিত, উন্নীত ও সংহত হয়ে ওঠে। নির্ভরতার মধ্যে আছে তিনি যা বলেন তা thoroughly ( সম্পূর্ণভাবে ) করা, তাঁর ইচ্ছাগুলি পরিপূরণ করা। এতে passion (প্রবৃত্তি)গুলির concentric adjustment ( সুকেন্দ্রিক বিনায়ন ) হয়। নিজত্ব লোপ পাওয়া ত দূরের কথা, নিজত্বের সন্ধানই মেলে অমনি করে। সত্তাটা সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে।

১৯শে পৌষ, সোমবার, ১৩৫৫ (ইং ৩।১।৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে গোলতাঁবুতে শুভ্রশয্যায় সমাসীন। তাঁর প্রসন্ন আননে দিব্য আনন্দের দ্যুতি। সুশীলদা (বসু), শচীনদা (গাঙ্গুলী), অনিলদা (গাঙ্গুলী), ননীদা (দে), যামিনীদা (রায়চৌধুরী), প্রবোধদা (মিত্র), মন্মথদা (দে), হাউজারম্যানদা, হেনরী প্রভৃতি বহু ভক্ত উপস্থিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর নিম্নলিখিত বাণীটি বললেন—

আত্মম্ভরী, আত্মপ্রতিষ্ঠ বুজরুকবাজ
লহমায় ভগবান বা দেব দেবী
দেখায়
বা ভেল্কীতে রোগ সারায়,
বড়লোক করার বাহানা করে,
অনাচারী,
ইষ্টপ্রতিষ্ঠ নয়,
ধাপকী ভড়ংওয়ালা—
এমনতর পোষাকী সাধু
সমাজের দুষমন—
মানুষকে বিভ্রান্ত করার আড়কাঠি—
অজ্ঞতার পরম পরিবেষক।

লেখাটি পড়ার পর সেই সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছিল। শচীনদা বললেন—ছলে বলে-কৌশলে মানুষকে সৎপথে আনাই ত ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ছলে-বলে-মানে through proper manipulation (বিহিত নিয়ন্ত্রণের ভিতর দিয়ে)। বুজরুকিতে মানুষের conception (ধারণা)টাই blunt (ভোঁতা) হ'য়ে যায়। ওতে না-করে পাওয়ার বুদ্ধিই প্রবল হয়। ইষ্ট বা আদর্শে মানুষের অনুরাগের উদ্বোধন হয় না, তাই মঙ্গল ও হয় না। Religious life (ধর্ম্মজীবন) education (শিক্ষা) ত। Educationএরই (শিক্ষারই) মাথা যদি খাই কী হবে তা' দিয়ে?

মানুষ miracle monger ( সিদ্ধাই-প্রিয় ) হ'য়ে পড়ে। ক্রাইস্টের স্পর্শে অন্ধ চোখ পেয়েছিল, তখন ক্রাইস্ট বলেছিলেন তা'কে এটা আমার বাহাদুরি নয়। তোমার faith (বিশ্বাস)ই তোমাকে cure (আরোগ্য) করেছে। Mechanism (মরকোচ)টা ধরিয়ে দিয়ে, মানুষের চলার পথ বাতলে দিয়ে সেই পথে আকৃষ্ট করতে হয় নচেৎ সৎপথে আনা হয় না।

একটু থেমে শ্রীশ্রীঠাকুর আবার বললেন—ভক্তি, সাধনা, যোগ, ইত্যাদির অনুশীলন করতে করতে বহুক্ষমতা জাগে, ওদিকে attentive ( মনোযোগী ) হওয়া বা তা apply ( প্রয়োগ ) করতে যাওয়া ভাল নয়। শুনেছি বাইবেলেও আছে endowment (বিভূতি) ও vision (দর্শন) এর কথা।

২২শে পৌষ, বৃহস্পতিবার, ১৩৫৫ (ইং ৬-১-৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে গোল তাঁবুতে সর্ব্বাঙ্গ চাদর দিয়ে ঢেকে একটা তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বিছানায় বসে আছেন। রাত্রে বিজলী বাতি জ্বলছে, তাঁর চোখমুখ এক অপূর্ব্ব বিভায় উজ্জ্বল। প্যারীদা ( নন্দী ), উমাদা (বাগচী), বীরেনদা (পাণ্ডা), মায়া মাসীমা, সরোজিনী মা, ননীমা, হেমপ্রভা মা প্রভৃতি আছেন। টুকটাক কথাধার্তা হচ্ছে। এমন সময় হাউজারম্যানদা ও হেনরী আসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করে তাঁরা বসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর স্নেহকোমল কণ্ঠে মধুর হাসিমাখা মুখে বললেন—কী খবর ?

হাউজারম্যানদা—খুব ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হেনরীর ?

হাউজারম্যানদা হেনরীকে বুঝিয়ে বললেন। হেনরী ইংরাজীতে যা বললেন তার অর্থ—সুন্দর। বড়দার বাড়ীতে থেকে মনে হয় যেন নিজের বাড়ীতে আছি। এখানকার লোকজনের ব্যবহার ও প্রাকৃতিক দৃশ্য বেশ ভাল।

হাউজারম্যানদা ও প্রফুল্ল উভয়ে মিলে দোভাষীর কাজে রত। খাওয়াদাওয়া সম্বন্ধে কথা হলো।

তারপর কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কোন জিনিষ repeatedly (বারবার) achieve (আয়ত্ত) ক'রতে করতে system (দেহবিধান) এর তেমনতর adjustment ( বিন্যাস ) হয়। অর্থাৎ অনুরাগের সঙ্গে করতে করতে সেই trait (গুণ) সত্তাসঙ্গত হয়। Marriage (বিবাহ) ঠিকমত হলে children (সন্তানেরা) ঐ special aptitude (বিশেষ যোগ্যতা) inherit করে ( উত্তরাধিকার সূত্রে পায় )। এই aptitude (যোগ্যতা) এর classification ( শ্রেণীবিভাগ ) আছে। মানুষের ভিতর, গাছের ভিতর, পশুর ভিতর, ফুলের ভিতর, সবজায়গায় different classes of aptitude ( বিভিন্ন শ্রেণীর যোগ্যতা বা প্রবণতা ) আছে। Aryans call it Varna ( আর্য্যরা একে বর্ণ বলেন )। বর্ণ মানে Grouping of the Varieties of similar instincts ( বিভিন্নপ্রকার সমজাতীয় সংস্কারের গুচ্ছীকরণ )। এর সঙ্গে আছে adjustment of functions according to special aptitude ( বিশেষ যোগ্যতা অনুযায়ী কর্ম্ম বিন্যাস )। তাই রকমারি variety ( বৈচিত্র্য ) দেখা যায়। আমের ভিতরই কত জাতীয় আম আছে। আবার আছে sour type ( টক জাতীয় )। Sweet type ( মিষ্টি জাতীয় ) flavoury type ( গন্ধওয়ালা )। যে যেমন তার কাজও তেমন এবং তার থেকে জন্মায়ও তেমন। এই যে inheritance ( উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্তি ) তা কোথায়ও কম কোথায়ও বেশী হতে পারে। আমার মনে হয় A well-adjusted habituated smith can beget a good smith ( একজন সুনিয়ন্ত্রিত অভ্যস্ত ধাতুশিল্পী একজন ভাল ধাতুশিল্পীর জন্মদান করতে পারে )।

দেখা যায় Vaidyas are normal physicians ( বৈদ্যরা স্বাভাবিকভাবে চিকিৎসক )। অবশ্য eugenic law ( সুপ্রজননের নিয়ম ) পালন করা চাই।

হাউজারম্যানদা—Normal aptitude ( স্বাভাবিক যোগ্যতা ) জানা যায় কি ভাবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Normal inclination (স্বাভাবিক ঝোঁক) দেখে।

হাউজারম্যানদা—অনেক রকমের inclination (ঝোঁক) দেখা যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Normal inclination controls everything (স্বাভাবিক ঝোঁক সব কিছুকে নিয়ন্ত্রিত করে)। Mathematic aptitude takes everything mathematically (গাণিতিক প্রবণতা সব কিছুকে গাণিতিকভাবে নেয়)। Vaisya aptitude thinks in terms of Pound, shilling and pence. He will understand something well if it is explained in that fashion. (বৈশ্য প্রবণতা সব কিছুকে টাকা, আনা, পাইয়ের দৃষ্টিতে দেখে। কোন জিনিস যদি সেইভাবে বোঝান যায় তবে সে ভাল করে বোঝে)। If a fisherman goes to a clergyman he will understand his teachings, if they are explained in terms of fishing. (কোন জেলে যদি কোন ধর্ম্মযাজকের কাছে যায় সে তাঁর নীতিকথা বুঝতে পারবে, যদি তা মাছ ধরার ব্যাপারের মধ্য দিয়ে বোঝান হয়)।

হেনরী—That is due to education and habit (তা শিক্ষা ও অভ্যাসের দরুন)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—That is again transmitted if his being is touched thereby (সত্তাস্পর্শী শিক্ষা ও অভ্যাসও আবার পরবর্তী বংশধরে সঞ্চারিত হয়)।

তারপর ওঁরা প্রীতিমনে বিদায় নিলেন।

২৩শে পৌষ, শুক্রবার, ১৩৫৫ (ইং ৭-১-৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে গোল তাঁবুতে আসীন। শরৎদা (হালদার), শচীনদা (গাঙ্গুলী), হেমদা (মুখার্জী), সুরেনদা (শূর), বীরেনদা (মিত্র), পণ্ডিত ভাই, ননীদা (চক্রবর্ত্তী), প্রকাশদা (বসু), কেদারদা (ভট্টাচার্য্য),

মণি ভাই (সেন), নরেনদা (মিত্র), যামিনীদা (রায় চৌধুরী), শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), আশুদা (জোয়ার্দ্দার), চারুদা (করণ), কালিদাসদা (মজুমদার), মণিদা (কর), নিরাপদদা (পণ্ডা), ভাটুভাই, যজ্ঞেশ্বরদা (সামন্ত), করুণাদা (মুখার্জী), বিশুদা (মুখার্জী), দাশুদা (রায়), জ্ঞানদা (দত্ত), মানিকদা (মৈত্র), সুরেনদা (বিশ্বাস), তারকদা (ব্যানার্জী), গোপেনদা (রায়), হাউজারম্যানদা, হেনরী প্রভৃতি অনেকেই শ্রীশ্রীঠাকুরকে বেষ্টন করে তাঁবুর ভিতরে ও বাইরে উপবিষ্ট ও দণ্ডায়মান। শ্রীশ্রীঠাকুর ভাবমুগ্ধ হয়ে বাণী বলে চলেছেন।

একবার বললেন—সত্তা যে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে বেঁচে থাকে তারই পরিপোষণ ও পরিচারণই হচ্ছে স্পিরিচুয়ালিজ্‌ম্ (আধ্যাত্মিকতা)।

ঐ কথা ইংরাজীতে বললেন—To maintian and nurture that which makes the existence breathe is spiritualism. পরে বললেন—সত্তার সুষ্ঠু ও সর্ব্বাঙ্গীণ সংরক্ষণই মুল কথা। তার জন্য লাগে আদর্শনিষ্ঠা, স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য পরিপালন এবং পারিপার্শ্বিকের সেবা। আমরা যা কিছু করি, তা সপরিবেশ সত্তাপোষণী হওয়া চাই। এই জন্যই যা-কিছু। এতে স্বার্থ ও পরমার্থ দুইই ঠিক থাকে। সত্তাপোষণী সুকেন্দ্রিক চিন্তা, বাক্য ও কর্ম্মই ধর্ম্ম। তাই আমি বলি যজন, যাজন, ইষ্টভৃতির কথা।

প্রফুল্লকে বললেন ইংরেজীতে কথাগুলি তর্জ্জমা করার কথা যাতে হেনরীর বোঝার পক্ষে সুবিধা হয়। তা করা হলো।

এমন সময় অদূরে একটি ছেলে পেয়ারা গাছে উঠছিল। হাউজারম্যানদা ও হেনরীর দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট করে শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্যে বললেন—The boy seeking spiritualism is climbing the treo to seek guava (অধ্যাত্মকামী বালকটি গাছে চড়ছে পেয়ারার খোঁজে)।

যামিনীদা—এটা ত নিছক আত্মস্বার্থের জন্য, এরমধ্যে অধ্যাত্মিকতা কোথায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কারও ক্ষতি না করে বিহিতভাবে আত্মপোষণের জন্য

যা করা যায় তাও ধর্ম্মসঙ্গত, আধ্যাত্মসঙ্গত। ওর যদি অভিপ্রায় থাকে যে ভাল পেয়ারা পেলে মা-বাবাকে, ঠাকুরকে ও বন্ধুবান্ধবকেও দেব, তাহলে ত কথাই নেই।

শরৎদা—এটা সত্যযুগ, না কলিযুগ ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সত্যযুগ মানে কৃতযুগ, যত কৃতযুগের advent (আবির্ভাব) হবে, তত সত্যযুগ আসবে।

শরৎদা—সত্যযুগের তাৎপর্য কি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে যুগে বেশীরভাগ মানুষ বিহিতভাবে কর্ম্ম ক'রে পেতে চায়, সত্তাপোষণী কর্ম্মে আনন্দ পায়, না করে পেতে চায় না, অলস হয়ে বসে থাকতে চায় না, সৎ কর্ম্মমুখর শ্রেয়ার্থী জীবন যাপন করে, সেইটেকে সত্যযুগ বলে জানবেন। এইগুলি হলো সত্যযুগের বৈশিষ্ট্য।

শরৎদা—নাম ত অনাহতভাবে ভিতরে হচ্ছেই, আবার নাম করা কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—করে মাথায় যেগুলি চরা পড়ে গেছে, যার দরুন অনুভূতি রুদ্ধ হয়ে আছে সেটাকে ফাটিয়ে নিজেকে উন্নত স্তরে নিয়ে যেতে হয়। অর্থাৎ উৎসবিমুখ চলার দরুন যে আবরণের পলি পড়ে গেছে, সেটাকে অপসারণ করে উড়িয়ে দিয়ে নিজেকে তেমনভাবে adjust (নিয়ন্ত্রণ) করতে হয়, যাতে মূল জিনিসটা বোধ করা যায়।

সুরেনদা—চক্রটা কি বরাবর করতে হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—চক্রটা একটা external push (বাইরে থেকে ধক্কা) দেবার জন্য। এটা না হলেও যে চলে না, তা নয়।

শচীনদা—কত সময় চক্র করা উচিত ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দুই এক মিনিট।

শচীনদা—দৃষ্টি শক্তি বাড়ে কিসে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নামধ্যান করলে চোখের দৃষ্টি বেড়ে যায়। নামধ্যান ক'রে green distant horizon (সবুজ দূরদিগন্ত)এর দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকলে দৃষ্টিশক্তি বাড়ে। Regularly (নিয়মিতভাবে) করতে হয়।

যোগেনদা (হালদার)—ওষুধপত্র না খেয়ে নামধ্যান করলেই ত অসুখ সারে, তবে ওষুধ খাওয়া কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তেমন করে করে কে ? করলে ত হয়। তবে রোগ সারার ব্যাপারে ওষুধ ও খাদ্যেরও একটা প্রভাব আছে।

যোগেনদা—একাকী থাকলেও উচ্চৈঃস্বরে নাম করা চলে না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মনে-মনে নাম করলে nerve ( স্নায়ু )এর উপর pressure (চাপ) পড়ে। Effect (ফল) বেশী হয়, শব্দ করে করলে ততখানি হয় না।

২৪শে পৌষ, শনিবার, ১৩৫৫ (ইং ৮।১।৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে গোল তাঁবুতে বিছানায় অর্দ্ধশায়িত। বেশ শীত পড়েছে। কাশীদা ( রায় চৌধুরী ), হরিপদদা ( সাহা ), শান্তুদা (শ্রীশ্রীঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র) এবং মায়েরা কয়েকজন উপস্থিত। শান্তুদার সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—হোমিওপ্যাথিক, এ্যালোপ্যাথিক, কবিরাজী, এইসব মূলতঃ আলাদা নয়। সবগুলি একই চিকিৎসা-বিজ্ঞানের নানা দৃষ্টিভঙ্গী। বাহ্য অসঙ্গতির মধ্যে অন্তর্নিহিত সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য কোথায়, ভেবে দেখা লাগে। তাতে লাভ বই ক্ষতি নেই। বরং পরস্পরকে পরস্পরের পরিপূরক ও সহায়ক করে তোলা যায়।

কয়েকদিন হলো প্রমথদার ( দে ) শরীর খুব অসুস্থ। শ্রীশ্রীঠাকুর সেজন্য খুবই চিন্তান্বিত।

২৫শে পৌষ, রবিবার, ১৩৫৫ (ইং ৯-১-৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে গোল তাঁবুতে আসীন। ননীদা ( চক্রবর্ত্তী ), ব্রজেনদা (চ্যাটার্জ্জী), যোগেনদা (হালদার), দক্ষিণাদা ( সেনগুপ্ত), প্রবোধদা (মিত্র), শৈলেশদা (ব্যানার্জ্জী), সুধীরদা (বসু), প্রভৃতি কাছে আছেন।

প্যারীদা রোগী দেখতে যাচ্ছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর প্যারীদাকে ডাকতে বললেন—সঙ্গে-সঙ্গে বললেন পাছডাক দিস না। শৈলেনদা সে

কথা শুনতে না শুনতে হঠাৎ ডাক দিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তখন বললেন—পাছডাক দিলে একটা mood (ভাব) থাকে, সেটা ভেঙ্গে যায়। একমুখী চিন্তার ভাব নষ্ট হয়ে যায়। আমার যেমন কথার সময় বাধা পড়লে কেটে যায়।

ননীদা—হাঁচি পড়লে বাধা মনে করে ঐ জন্য বোধ হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে বাধা মনে করে তা'র পক্ষে।

দক্ষিণাদা—যাত্রার সময়—আগের থেকে পাছে ভাল, যদি ডাকে মায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে যাবার দরকার নেই।

একটু থেমে আবার বললেন—আবার আছে—ডাক্তার কবিরাজকে ঘুমের সময় বা খাবার সময় ডাকতে নেই। তার কারণ তার মনের tranquillity (শান্তি) ভেঙ্গে যায়।

যোগেনদা—কালিদাসের লেখার মধ্যে যৌনতা ঢের আছে, তৎসত্ত্বেও তা উৎকৃষ্ট কাব্য বলে বিবেচিত হয়। কিন্তু ঐ কারণে বর্ত্তমানযুগের কোন কোন শক্তিমান সাহিত্যিকের রচনার বিরূপ সমালোচনা হয় কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কার লেখা কেমন তাও আমি পড়ে দেখিনি। আর সমালোচকেরও ভুল হতে পারে। একযুগে যার লেখার নিন্দা হয়, আর একযুগে তার প্রশংসাও হতে পারে। দেখতে হয় যৌনতাকে কোন দিক থেকে নিয়েছে। তার শুভ পরিণতিও হতে পারে। অশুভ পরিণতিও হতে পারে। একটা নেয় দেবত্বের দিকে, আর একটা নেয় বিধ্বস্তি ও প্রবৃত্তিঅভিভূতির দিকে। যেমন করে হোক সাহিত্যের মধ্য দিয়ে সত্য, শিব, সুন্দরের প্রতিষ্ঠা ও পরিবেষণ হওয়া চাই। সাহিত্যের মধ্যে, আছে হিত। হিত, শিব, মঙ্গল একই কথা। লেখার ধরণ এমন হওয়া চাই যাতে মানুষ জীবনীয় প্রেরণা পায়—তা ভালমন্দ সব কিছুর ভিতর দিয়ে।

আমার কী বলা আছে পড়ে শোনাত প্রফুল্ল। খুঁজে বের করে পড়া হলো—

বিষয়বস্তু বা ব্যাপারের
রসব্যঞ্জনার ভিতর দিয়ে

ভাবের রূপ ভাষায় এঁকে তুলে
আগ্রহমন্দির করে
অন্যতে সেই ভাবের
প্রতিধ্বনন করে তোলে সাহিত্য,
সাহিত্য-সত্তার তাৎপর্য্যই সেখানে,
আর তা যেমনতর হিতী-সুন্দর—
তার কদরও তেমনি
শিল্পকলার তাৎপর্য্যও ওতেই।

পড়ার পর শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—বোঝা গেল ?

যোগেনদা—আজ্ঞে হ্যাঁ।

ব্রজেনদা—আমরা ত জানি আমাদের সাধ্য নাম সর্ব্বোচ্চ। এখানেই কি 'ক্রমোন্নতি' থেমে যাবে ? অন্য মহাপুরুষ এসে আরো বড় জিনিস কি দেবেন না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রয়োজন হলে আরো হবে। তবে এর মধ্যে আছে স্পন্দনের মরকোচ। স্পন্দন থেকেই সৃষ্টি। তাই, নিষ্ঠাসহকারে সাধন করে এই স্তরে পৌছালে জানার কিছু বাকী থাকে না। ওসব বেশী বিচার করতে গেলে অবতারপুরুষের মধ্যে পার্থক্য করার প্রবৃত্তি আসে। একই চাঁদ আমরা বিভিন্ন তিথিতে বিভিন্ন রকম দেখি। তাই বলে প্রতিপদের চাঁদ, দ্বিতীয়ার চাঁদ আলাদা চাঁদ নয়।

ব্রজেনদা—এক জন অবতারকে explain (ব্যাখ্যা) করবার জন্য আর একজন আসেন। আপনাকে explain (ব্যাখ্যা) করবার জন্যও পরবর্ত্তী আসবেন ত ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ। আসাই ত সম্ভব। তবে বহু বহু দিনের খোরাক দেওয়া থাকল।

অনেকক্ষণ বড়াল-বাংলোর পিছন দিকের বারান্দায় প্যারীদা ও হরিপদদা শ্রীশ্রীঠাকুরকে তেল মাখাচ্ছিলেন। পূজনীয় শান্তুদা একজন রোগী দেখে এসে তার বর্ণনা দিচ্ছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর কথা শুনে খুশী

হয়ে বললেন—তুই যে এমন করে কথা বলতে পারিস, এটা কম কথা নয়। তোর সঙ্গে যুক্তি বুদ্ধি করা যায়। বুদ্ধি কিছু হয়েছে। এটা যেন আমারই একটা achievement (প্রাপ্তি)। ওই রোগী সম্বন্ধে তুই যা বললি যতদূর শুনেছি আমারও সেইরকম মনে হয়। স্নান করার পর শ্রীশ্রীঠাকুর চৌবাচ্চার পাশের মুলোফুল এবং সরষেফুল লক্ষ্য করে বললেন —মুলোফুল ও সরষে ফুল প্রায় একরকম। সরষের বৈধানিক adjustment (বিন্যাস) এমন যে তার ফুল হলদে হবে। আবার মূলোর বৈধানিক adjustment (বিন্যাস) এমন যে তার ফুল সাদা হবে, অথচ দেখতে অন্য সব দিক থেকে একরকম। এদের বীজ থেকে যে গাছ হবে তাদের ফুল আবার অমনি হবে।

শাস্তুদা—বোধহয় এক groupএর (গুচ্ছের)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এক groupএর (গুচ্ছের) different variety (পৃথক রকম)। জাতি এক, variety (রকম) আলাদা। মানুষের মধ্যেও তেমনি আছে, তাকে বলে বর্ণ। বৈশিষ্ট্যসম্পদের বিশিষ্টতা নিয়ে বর্ণ। যেমন ছোট অতসী ও বড় অতসী। যার biological adjustment (জৈবীসংস্থিতি) যেমন তার চেহারা তেমন, তার বীজ থেকে গাছ ও ফুলও হবে তেমন। বড়টাকে দিয়ে ছোটটাকে বিধিমাফিক cross (সংমিশ্রণ) করাতে পারলে, আবার ছোটটা বড়র পথে চলবে। একেবারেই লাফ দিয়ে খুব বড় হবে না। সংমিশ্রণ থেকে জাত যা', সেটার আবার বড়টার সঙ্গে বিহিত সংযোগ ঘটাতে হবে। এইভাবে ক্রমান্বয়ে ধারাবাহিকভাবে কয়েক পুরুষ করাতে হবে। তাতে ধীরে-ধীরে বৃদ্ধির পথে যাবে। এই-ভাবেই ত ছোট যে সে বড় হয়। অনুলোম বিয়েতেও এই ব্যাপারটা ঘটে।

২৬শে পৌষ, সোমবার, ১৩৫৫ (ইং ১০-১-৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর গোল তাঁবুতে উপবিষ্ট। আজ সকাল থেকে প্রমথদার (দে) খুব রক্তবমন হচ্ছিল। সেই সংবাদ পেয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর খুব চিন্তাকুল

হয়ে পড়লেন। কেষ্টদাকে দিয়ে ইণ্ডিয়ান মেটেরিয়া মেডিকা এবং অন্যান্য বই দেখাতে লাগলেন রক্তরোধন ওষুধ কী ভাল আছে তা খুঁজে বের করবার জন্য। প্যারীদাকে নির্দ্দেশ দিয়ে দিয়ে বারবার পাঠাচ্ছিলেন। একবার প্রমথদার ছেলে রুণু আসতে তাকে দিয়ে বলে পাঠালেন—আয়াপানের ওষুধটা যেন দেওয়া হয়।

অসুখ হবার সঙ্গে-সঙ্গে কলকাতায় লোক পাঠিয়ে শত-শত টাকার ওষুধ আনিয়েছিলেন। সেগুলি প্রয়োগ করা হচ্ছে কি না, খোঁজ নিলেন। সারা সকাল এই ভাবে উৎকণ্ঠার ভিতর দিয়ে কাটলো। সব চেষ্টা সত্বেও কোন ফল হলো না। বিকালে প্রমথদা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তীব্র-বেদনার্ত্ত হৃদয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। লোকসঙ্গ পছন্দ হচ্ছিল না। মাঝে-মাঝে 'মা! মা! দয়াল! দয়াল!' বলে আর্ত্তভাবে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলছিলেন। প্রমথদার বাড়ীর সবাই একটু শান্ত হয়েছেন কিনা সে বিষয়ে সন্ধ্যার পর নানাজনের কাছে বারবার খোঁজ নিলেন এবং সেখানে কয়েকজনকে থাকার জন্য বার-বার বলে দিলেন। ব্যথিত কণ্ঠে বললেন—এখন ত melted (বিগলিত) অবস্থা, যাতে মনে জোর পায় তেমনতর কথা বলা লাগে। তেমন ব্যবহার করা লাগে।

আবার করুণভাবে বললেন—কতদিন থেকে পিছনে লেগেছিলাম, কিন্তু ঠেকান গেল না।

২৭শে পৌষ, মঙ্গলবার, ১৩৫৫ (ইং ১১।১।৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে ভক্তবৃন্দ-পরিবেষ্টিত হয়ে গোল তাঁবুতে সমাসীন। প্রমথদার (দে) কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার বরাবর ঐ সন্দেহ ছিল। চেষ্টাও করে এসেছি সেইভাবে। সেই জন্য ফাঁকে রাখতে চাইতাম না বেশী।

কেষ্টদা—মানুষের আয়ু কি নির্দ্দিষ্ট?

শ্রীশ্রীঠাকুর—জন্মগত সম্ভাব্যতা অনেকটা সীমিত। তার পরিপূর্ণ

সুযোগ গ্রহণ করা বা না-করা আমাদের চলন সাপেক্ষ। প্রবল সক্রিয় ইষ্ট নেশা থাকলে অনেক সময় life prolonged (জীবন দীর্ঘায়িত)ও হয়।

কেষ্টদা—যদি কারও আকস্মিক মৃত্যু হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে আলাদা কথা। তাও আমার মনে হয়, যদি কারও বৃত্তিভেদী ইষ্টানুরাগ থাকে, তার সহজ চলন স্বতঃই তাকে দুর্ঘটনা এড়িয়ে চলতে সাহায্য করে। তবে কর্ম্মফল এড়ান খুব কঠিন। কিন্তু প্রবৃত্তির উপর টানের থেকে ইষ্টের উপর টান stronger ( প্রবলতর ) হলে তাও সম্ভব।

সন্ধ্যাবেলায় শ্রীশ্রীঠাকুর গোল তাঁবুতে শুভ্রশয্যায় উপবিষ্ট। পূজ্যপাদ বড়দা এবং হাউজারম্যানদা প্রভৃতি উপস্থিত। এমন সময় প্রমথদার স্ত্রী এসে আর্ত্তনাদ করে বিলাপ করতে লাগলেন 'বাবা! আমি যে একা। আমি যে সইতে পারিনা।'

শ্রীশ্রীঠাকুর ছলছল নেত্রে ব্যথাভরা কণ্ঠে ধীরে-ধীরে বললেন—তোরও গেছে, আমারও গেছে। তোর যা' গেছে তার তুলনা নেই। আমার যা' গেছে তারও তুলনা নেই। কিন্তু তোর ত আমি আছি, আমার কে আছে বল্ত?

ফুলমালা মা কাঁদছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কী করব মা? সওয়া ছাড়া আর পথ কী আছে? …বড় কষ্ট মা—কী করব? তোর স্বামী গেছে, বাবা আছে। আমার কে আছে? অমন করে কে করবে দুঃখে, কষ্টে, বিপদে, আপদে? ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর্—যারা আছে, তারা বেঁচে থাকে, সুখে থাকে, সুস্থ থাকে …।

কষ্ট করিস না। যতটা পারিস্ আমার কাছে-কাছে থাকিস।

এইভাবে অন্তরের সমস্ত মমতা ঢেলে প্রবোধ দিতে লাগলেন। বেশ কিছু সময় মাটির দিকে তাকিয়ে চুপচাপ বসে থাকলেন।

ফুলমালা মা ধীরে-ধীরে একটু শান্ত হয়ে গাত্রোত্থান করলেন।

এরপর হাউজারম্যানদা একটা চিঠি পড়ে শোনালেন।

বৃত্তান্ত এই যে একটি শিক্ষিত রাশিয়ান পরিবার এখানে আসতে চায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভালই ত। তবে ওর (বড়দা) সঙ্গে নিরিবিলি আলোচনা ও যুক্তিবুদ্ধি করে উত্তর দিস। আর চেষ্টায় থাকিস যাতে একজন খুব ভাল physician & surgeon ( চিকিৎসক ও সার্জ্জন ) যোগাড় করতে পারিস।

পূজ্যপাদ বড়দা—একাধারে দুইদিকে পাকা লোক পাওয়া ত কঠিন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—একই লোকের দুইদিকে পারদর্শিতা থাকলে খুব ভাল হয়।

হাউজারম্যানদা—চেষ্টা করব।

২৮শে পৌষ, বুধবার, ১৩৫৫ (ইং ১২।১।৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে গোল তাঁবুতে আসীন। কেষ্টদা ( ভট্টাচার্য্য ), চুনীদা (রায় চৌধুরী), বীরেনদা (মিত্র), কিরণদা (মুখার্জ্জী), পণ্ডিত ভাই, প্রফুল্লদা (চ্যাটার্জ্জী), দক্ষিণাদা ( সেনগুপ্ত ), প্রবোধদা ( মিত্র ) প্রভৃতি অনেকে তাঁবু ঘিরে দণ্ডায়মান। এমন সময় প্রমথদার বড় ছেলে বিণু (কলকাতা থেকে কাল এসেছে) এবং মেজ ছেলে এসে দাঁড়াল।

শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—কখন আসলি ? শরীর ঠিক আছে ত ?

বিনু—কাল এসেছি। শরীর মোটামুটি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোর মা ?

বিনু—মা বড় ভেঙ্গে পড়েছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মাকে তোরা সাহস দিবি। কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে দয়াল ! দয়াল ! বলে দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করতে লাগলেন।

আক্ষেপ করতে লাগলেন। আক্ষেপ করে বললেন—মহামায়া কী কাণ্ড ঘটে গেল। আর একটু চুপ করে থেকে বললেন—তোরা ঘাবড়াস্

না। আমি ত আছি। বাবা গেল এই যা। কিছু ঘাবড়াস না, আমি ত এখনও বেঁচে আছি। লেখাপড়া শেখার চেষ্টা দেখ্। যা যা করণীয় সেগুলি কর। কোন ভাবনা নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুরের দরদী ভরসায় ওরা উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলো।

২৯শে পৌষ, বৃহস্পতিবার, ১৩৫৫ ( ইং ১৩।১।৪৯ )

শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর কাল বিকাল থেকে আবার খারাপ করেছে। বুকের মধ্যে অস্বস্তি বোধ করছেন।

বিকালে বেড়িয়ে এসে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর প্রাঙ্গণে ইজিচেয়ারে বসে তামাক খেতে খেতে কেষ্টদাকে বললেন—মা যাবার পর থেকে আমি ভাল নেই।

কেষ্টদা—সেই থেকে আঘাতগুলি লাগতে লাগল খুব।

শ্রীশ্রীঠাকুর – Shield ( বর্ম ) ব'লে কিছু নাই। মা থাকতে মাঝে মাঝে এমন ধমক দিতেন। তা'তেই কত উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা উড়ে পালাত। মা আমার সঙ্গে রুক্ষ ব্যবহারও কত করেছেন। কিন্তু তা আমার গায়েই লাগে নি, সবই ভাল লাগত।

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর গোল তাঁবুতে এসে বসলেন। তখন সন্ধ্যা। হাউজারম্যানদা শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে নিভৃতে কথা বললেন। তারপর অনেকেই সেখানে গেলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর হাউজারম্যানদা কে 'সলোমন' কথার ধাতুগত অর্থ দেখতে বললেন। ওয়েবস্টারের অভিধান দেখে এসে তিনি বললেন, সলোমনের root meaning ( ধাতুগত অর্থ ) peace ( শান্তি )।

হাউজারম্যানদা—যত attachment ( অনুরাগ ), তত adjustment ( নিয়ন্ত্রণ ), তাইত !

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ। Unrepelling attachment (অচ্যুত অনুরাগ) চাই। তা থাকলে তা'র দরুণ both elation and depression ( উদ্দীপনা ও অবসাদ ) দুইই adjusted ( নিয়ন্ত্রিত ) হয়। এটা এতই

বড় জিনিষ যে, এতে সুখ-দুঃখ সবই utilised ও adjusted ( সদ্ভাবে ব্যবহৃত ও নিয়ন্ত্রিত ) হয়। তাই কেষ্ট ঠাকুরের এক নাম ছিল অচ্যুত, তাঁর গুরু তাঁকে এ নাম দিয়েছিলেন।

হাউজারম্যানদা—Wisdom ( প্রজ্ঞা ) ও peace ( শান্তি ) তাহলে একসঙ্গে থাকে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ।

প্রবোধদা ( মিত্র )—জ্ঞান ও শান্তি যদি একসঙ্গে থাকে, তবে মহাপুরুষদের প্রত্যেকের জীবনে এত অশান্তি কেন ?

প্রফুল্ল—Unsolved complex ( অসমাহিত প্রবৃত্তি )এর conflict ( দ্বন্দ্ব )এর দরুণ যে অশান্তি হয়, সে অশান্তি তাঁদের নাই। তাছাড়া সব অশান্তিময়, পরিস্থিতির মধ্যে সবটার কারণ ও নিরাকরণ জানা থাকার দরুণ তাঁদের অশান্তি কম হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর ঘাড় নেড়ে সেকথা অনুমোদন করলেন এবং বললেন—তবু পরিবেশের উপর হাত থাকে না ব'লে কষ্ট হয়ই। রামচন্দ্র ত লক্ষ্মণবর্জ্জন আর সহ্যই করতে পারলেন না, সরযূর জলে আত্মবিসর্জন করলেন।

পরম পূজনীয়া ছোটমা ও রাঙ্গামা পূজনীয় কাজল ভাই সহ এলেন, তাছাড়া শচীনদা ( গাঙ্গুলি ), ব্যোমকেশ ভাই ( ঘোষ ), কালীদাসী মা প্রভৃতি ছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর আদর ক'রে কাজল ভাইকে নানা কথা বলছিলেন যাতে তাঁ'র অন্তর্নিহিত সদ্‌গুণগুলি বিকশিত হ'য়ে উঠে। এরপর একটু সময় চুপচাপ থেকে শচীনদার দিকে চেয়ে হঠাৎ বললেন—আমার একটা tendency ( ঝোঁক ) আছে—মানুষের খারাপ দিকটা জানতে চাই না, মানতে চাই না, ভাল ব'লে যা' বুঝ আছে তা' স্বীকার কবতে চাই, তা নিয়ে মত্ত হ'য়ে থাকতে চাই। তবু মানুষ আমাকে বুঝিয়ে দেয়ই সে কী এবং কেমন। হয়ত আপনার একটু ব্যবহারই বুঝিয়ে দিল আপনি কী, কিন্তু তা যদি খারাপ হয়, তা মানতে চাই না। স্বীকার করতে চাই তাই,

যা' আপনাকে নিয়ে মত্ত হ'য়ে থাকার অনুকূলে। উল্টোটা বাদ দিতে চাই। আবার আছে, বেশ বুঝি লোকটা গোলমেলে, কিন্তু তা' স্বীকার করি না।

আর একটা রকম আছে—কারও জন্য হাজার ক'রেও মনে হয় না যে যা' করণীয় তা' করতে পেরেছি। কী করলে আরো ভাল হ'তো সেই কথাটাই ভাবি। নিজেকে কেবলই দেখি। Analyse ( বিশ্লেষণ ) করি। কারও জন্য চরম ক'রেও মনে হয় সবটা বোধহয় করা হয়নি।

এই সীমাহীন মমতা ও দায়িত্ব বোধের জন্য সব সময় কষ্ট লেগেই থাকে।

১লা মাঘ, শুক্রবার, ১৩৫৫ (ইং ১৪।১।৪৯)

সন্ধ্যায় গোল তাঁবুতে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে হাউজারম্যানদা, হেনরী, কেষ্টদা ( ভট্টাচার্য ), শচীনদা ( গাঙ্গুলী ) প্রভৃতি উপস্থিত।

'জু' দের উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছিল।

হাউজারম্যানদা—ওরা নাকি এ্যাব্রাহামের সন্তান, এ্যাব্রাহামও নাকি জু!

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার তা' মনে হয় না। আমাদের পূর্ব্বপুরুষরা ব্রহ্মাকে আদিপুরুষ ব'লে বলতেন। আমার মনে হয় এ্যাব্রাহামের সঙ্গে তা'র মিল আছে। আমাদের mythology ( পুরাণ ) ও পাশ্চাত্যের mythology (পুরাণ)তে অনেক মিল আছে। ভাল করে দেখা লাগে।

হাউজারম্যানদা—এ্যাব্রাহামের উৎপত্তি কিভাবে বের করা যায়? অতো পুরনো কোন record ( নথি ) ত' পাওয়া যাবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এখানে একটু, ওখানে একটু বিভিন্ন জায়গায় পাওয়া যেতে পারে, সেইটে থেকে বের করতে হয়। খোঁজা লাগে। Scripture ( ধর্মগ্রন্থ ) দেখতে হয়। Excavation ( খনন )এর relic ( ধ্বংসাবশেষ ) থেকে যেমন কত জিনিস বের করে। আমরা যেভাবে আরম্ভ করেছিলাম অব্যাহতভাবে সেইরকম চলতে পারলে এবং আরো উপযুক্ত মানুষ পেলে সব বের করা যেত। আগে কী জিনিস ছিল!

পশুপক্ষীর ভাষা পর্যন্ত শেখবার ব্যবস্থা ছিল। চিকিৎসা শাস্ত্রেরও কী অসাধারণ উন্নতি হয়েছিল। মানুষ কত উন্নত ধরণের ছিল!

হাউজারম্যানদা—সেই দিন কি আবার ফিরে আসবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা যদি সেই পথে চলি, প্রার্থনা করি, পরিবেষণ সেভাবে করি, তাহ'লে আসতেও পারে।

অশোকের সময়ের যে বিবরণ পাওয়া যায় তা heaven (স্বর্গ)এর ছায়া যেন নিয়ে আসে!

আলাপ আলোচনা হ'চ্ছে এমন সময় কয়েকজন ভদ্রলোক এলেন। দেশবিভাগে আশ্রমের ক্ষতি সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মত ক্ষতি কত লোকের হয়েছে।

জনৈক ভদ্রলোক—আমরা একটু আশার কথা আপনার কাছে শুনতে চাই। আবার কি নিজের দেশকে আগের মত পাওয়া যাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি ত বুঝি না। আপনারা করলেই পারেন। আমরা সবাই চেষ্টা করলে হয়। আমরাই ত এগিয়ে দিয়েছি। অন্যের দোষ কি? শুনেছি ডমিনিয়ন স্ট্যাটাস দিতে চেয়েছিল সি. আর. দাশের সময়। সে কতদিন আগে! তখন আমরা বুদ্ধি ক'রে নিলাম না। পরে সেই ডমিনিয়ন স্ট্যাটাসের মত জিনিষই নিলাম with divided India (খণ্ডিত ভারত সহ)।

ওঁরা আমাদের সমাজের সংহতির অভাব সম্বন্ধে বলছিলেন। ঐ প্রসঙ্গে ওঁরা বললেন—আমাদের মিল হ'বে কি করে? কত রকম sect (সম্প্রদায়) ও creed (মত)?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Sect (সম্প্রদায়) ও creedএ (মতবাদে) কিছু আসে যায় না। একটা common platform (অভিন্ন মঞ্চ) থাকলেই হয়। আর ধর্ম্ম, যা' দিয়ে মানুষ বাঁচে বাড়ে, তাইই হ'লো সেই platform (মঞ্চ)। আমরা হিন্দু কিসে তা জানি না। ওরা মুসলমান কেন, তা কিন্তু বলতে পারে সহজে। আমরা হিন্দু, আমরা মানি এক অদ্বিতীয়, আমরা মানি পূর্ব্বপূরয়মাণ প্রত্যেক মহাপুরুষ, আমরা মানি পিতৃপুরুষ, আমরা মানি বর্ণাশ্রম অর্থাৎ জন্মগত সংস্কারানুগামী শ্রেণী

বিন্যাস ও বৃত্তি নির্বাচন। আরো মানি পূর্ব্বপুরয়মাণ যুগ পুরুষোত্তমকে—এইই সার কথা, এর মধ্যে সব সম্প্রদায়ের সবাই পড়ে যায়। এই ভিত্তিতে পৃথিবীর সব মানুষ স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখে সংহত হ'তে পারে। এসব মূল কথা আমরা জানিই না, ধর্ম্ম কথাটার মানেই জানি না।

ওঁরা অন্যের সঙ্গে তুলনা ক'রে বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের হীন অবস্থার কথা উল্লেখ ক'রে নৈরাশ্য প্রকাশ করছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বললেন—সবরকম সম্পদে আপনাদের সঙ্গে পারার জো নাই, যদি আপনারা তা জাগিয়ে তোলেন। একতায়ও অদ্বিতীয় আপনারা, যদি করেন। শাশ্বত সনাতন আপনাদের জিনিস। অপনাদের ভগবান এসেছিলেন ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপনের জন্য, আর আপনারা করতে চাচ্ছেন বৈষয়িক রাষ্ট্র। ধর্ম্ম ত' আর কিছু নয়, উৎসমুখী হ'য়ে সর্ব্বতোভাবে বেঁচে থাকা ও বেড়ে ওঠাই ধর্ম্ম। আব্রহ্মস্তম্বপর্যন্ত সব কিছু এর অন্তর্গত। কিছুই বাদ পড়ে না এতে। ইষ্ট, ব্যষ্টি ও পরিবেশের সবৈশিষ্ট্য সঙ্গতিই ধর্ম্মের মূল কথা। পরিপূর্ণভাবে বাঁচতে যদি না পারিস প্রবৃত্তিরদাস হ'য়ে যদি থাকিস্ তাহ'লে বৈষয়িক রাষ্ট্র দিয়ে কী হবে বাবা?

তোর অনিয়ন্ত্রিত প্রবৃত্তিই ত তোকে খেয়ে ফেলবে, একটা পোকা-মাকড়, কীটপতঙ্গও ত একথা নিজের মত ক'রে বোঝে। একটা ঢিল মারলে তা'র থেকে বাঁচতে চেষ্টা করে, এটা কাউকে ক'য়ে দিতে হয় না। কিন্তু ইষ্টনিষ্ঠা বাদ দিয়ে তুই প্রবৃত্তিকে চিনবি কি করে? তার মরণ-কামড় থেকে রেহাইই বা পাবি কিভাবে? এই জন্য সদ্‌গুরুর আশ্রয় নেওয়া জীবনে এতই প্রয়োজন। তাঁর অনুশাসন মত চলাটাই ধর্ম। ঈশ্বর যেমন এক, ধর্মও তেমনি এক, এবং প্রেরিত পুরুষগণও একবার্তা-বাহী। প্রকৃত হিন্দু, প্রকৃত মুসলমান ও প্রকৃত খ্রীস্টানে কোন ভেদ নেই। প্রত্যেকেই ঈশ্বর তথা ইষ্টের পূজারী, সত্তার পূজারী, তাই তাঁরা পরস্পর পরস্পরের বান্ধব। আবার সত্তার বিরোধী যা, তা তাঁরা কখনও বরদাস্ত করেন না। এক কথায়, তাঁরা অসৎ-নিরোধী। ধার্মিক যাঁরা,

তাঁদের চরিত্রগত লক্ষণ হল নিষ্ঠানন্দিত উদারতা। তাই, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের কোন স্থান নেই তাঁদের মধ্যে। ধর্ম বলছে ছোটকে বড় করে তোল, বড়কে ছোট করো না। প্রতিলোম বিয়ে দিও না। নীচু ঘরে তোমার মেয়ে দিও না, বরং তা'র মেয়ে তুমি নিতে পার। কেষ্ট ঠাকুরকে আমরা ভগবান বলে মানি, তিনি বহুবিবাহ করেছেন, কিন্তু একটাও বামুনের মেয়ে বিবাহ করেন নি। বুদ্ধদেব বিয়ে করে সন্ন্যাসী হলেন, তিনিও প্রতিলোম করেন নি, বলেনও নি করতে। বৈশিষ্ট্য নষ্ট করার কথা কোন মহাপুরুষই বলেন না। সবটার একটা বিধি আছে। বুনো আমের কলম দিতে হয় ভাল আমেরসঙ্গে। গরুটা পাল দেওয়ার সময় ভাল ষাঁড়ের খোঁজ করে, যাতে দুধ বেশী দেয়, বাচ্চাটা ভাল হয়। কুকুর ভেড়ার বেলায়ও তা করে। মানুষের বেলায় ছেড়ে দিলাম, যেমন খুশি করলেই হল। বিয়ে একটা মস্ত জিনিষ। সবর্ণ ও অনুলোম বিয়ে দিতে গেলেও বিধিমাফিক দিতে হবে। এসব ঠিকমত না করলে কষ্ট পেতেই হবে। স্বাধীন হয়েছি, কিন্তু তার একটা আঁচও বোধ করতে পারলাম না। এক রাজা চলে যাবে, অন্য রাজা হবে, ভারতের সিংহাসন কভু শূন্য নাহি রবে। তাই মনে হয়, হস্তান্তর হয়েছে মাত্র। তথাকথিত independence (অনধীনতা) হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু প্রকৃত freedom ( স্বাধীনতা ) হয় নি, যার ভিতর দিয়ে ভারত আবার দেব ভারতে পরিণত হতে পারে।

এর পর ওঁরা বিদায় নিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদাকে জিজ্ঞাসা করলেন—বেতাল কিছু বলি নি ত?

কেষ্টদা—আমরা সবাই মুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম। ওদের চোখমুখ দেখে মনে হচ্ছিল, কথাগুলি ওদের খুব ভাল লেগেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিজে বুদ্ধি করে ত কই না। পরমপিতা যা কওয়ান।

২রা মাঘ, শনিবার, ১৩৫৫ (ইং ১৫।১।৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে গোল তাঁবুতে নয়ন-রঞ্জন-মোহন-ভঙ্গীতে উপবিষ্ট। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য), শরৎদা (হালদার), প্রবোধদা (মিত্র), সুরেনদা (বিশ্বাস), হরেনদা (বসু), ব্রজেনদা (চ্যাটার্জি) প্রভৃতি পাশে আছেন।

ব্রজেনদা জিজ্ঞাসা করলেন—বিভিন্ন গোত্রের একই প্রবর দেখা যায়, তার কারণ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কেষ্টদা জানে।

কেষ্টদা—এক বংশেই গোত্রকারক বিভিন্ন ঋষি হয়ত ছিলেন, তাই তাঁদের প্রবর এক। সম প্রবর যাদের, বিভিন্ন গোত্র হলেও তাদের মধ্যে বিবাহ হয় না।

পরে কেষ্টদা শ্রীশ্রীঠাকুরকে বললেন—আপনি বলেছিলেন যম, নিয়ম, আসন প্রভৃতির দরকার আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ।

কেষ্টদা—মুদ্রার প্রয়োজন কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ জিনিষটা বোধহয় বিশেষ attitude (মনোভাব) induce (প্রবুদ্ধ) করে।

সুরেনদা—কর্ম, ভক্তি, জ্ঞান কোন্‌টা আগে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নেশা না হলে করে কি করে? টান হলে তাঁর জন্য করা আসে। করার সঙ্গে চলে জানা বা জ্ঞান।

শ্রীশ্রীঠাকুর সাড়ে নটার সময় ইংরাজিতে একটি বাণী দিলেন—Generosity that invites danger is the harbinger of sufferings. (বিপদ-আমন্ত্রণী উদারতা দুর্ভোগের অগ্রদূত)।

শৈলেনদা (ভট্টাচার্য)—উদারতা অনেক সময় কিছু কিছু বিপদ এনে থাকে, তা হলে ত ঐ বিবেচনায় কেউ আর উদার হতে যাবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—উদারতা যাতে বিপদ না আনে সে বিষয়ে সাবধান হতে হবে, তাই ঐ ভাবে বলা হয়েছে। Wisely generous

( বিজ্ঞভাবে উদার ) হওয়ার বাধা নেই। সেইভাবে যদি না চল তবে উদারই হতে পারবে না। নিজে না চলতে পারলে, অন্যকেও চালাতে পারবে না।

শৈলেনদা—বিপদ মানে কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাতে সত্তার হানি হয়। যেমন মনে কর, তুমি টাইফয়েডের রোগীকে সেবা করছ, কিন্তু প্রতিষেধী আচার অবলম্বন করছ না, সাবধান হয়ে সংক্রমণ এড়িয়ে চলছ না, তাতে তুমি অসুস্থ হয়ে পড়লে। তার থেকে তোমার পরিবার আক্রান্ত হল। এই ভাবে সাবাড় হয়ে গেলে। সেবা করার পথও রুদ্ধ হল।

শৈলেনদা—একজন টিবি রোগী, তার কাছে আমি হয়ত কৃতজ্ঞ, তার কাছে আমি কি যাব না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাবে না কেন ? Danger ( বিপদ ) না আসে এমনভাবে precaution ( সতর্কতা ) নিয়ে যাবে। Generosity ( উদারতা ) আর foolishness ( বোকামি ) এক জিনিস নয়।

শচীনদা—সাবধানতা অবলম্বন করার পথও ত সবাই জানে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাই ত wise ( বিজ্ঞ ) হতে হয়।

বেলা ১২টার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর একটি বাণী দিলেন—

শ্রদ্ধা যাতে যেমন
পরিণতিও তাতে তেমনি।

তারপর বললেন—শ্রদ্ধা একটা গুণব্যঞ্জনা। শ্রদ্ধাতেই চরিত্রের পাক হয়। গীতায় আছে—"শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ"। এর একটা রকম আছে। শ্রদ্ধা হলে তৎপর হয়, তৎপর হলে সংযতেন্দ্রিয় হয়, আর তা থেকেই জ্ঞানলাভ হয়।

কাশীদা ( রায় চৌধুরী )—একজন প্রফেসারের উপর মানুষ হিসাবে যদি শ্রদ্ধা না থাকে, অথচ তার পড়ানটা যদি ভাল হয়, তাহলে ছাত্র কি তা গ্রহণ করে না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—শ্রদ্ধা কিছু লাগেই, interest ( অনুরাগ ) না থাকলে কানের কাছে ঢাক বাজালেও তা কানে যেতে চায় না।

কাশীদা—তার পড়ানর কায়দাটা যদি খুব মনোজ্ঞ হয় অথচ মানুষটাকে যদি ভাল না লাগে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ দিক থেকে শ্রদ্ধা ও ভাল লাগা থাকে। একটা মানুষ ভাল লাগে না, কিন্তু তার গান ভাল লাগে, তার মানে, তার গানের মধ্য দিয়েই তার প্রতি একটু শ্রদ্ধা ও অনুরাগ থাকেই। তদনুযায়ী তৎপর ও সংযতেন্দ্রিয় হয়, তাই গানটা উপলব্ধি করতে পারে নচেৎ সে সম্বন্ধে যথাযথ বোধ বা জ্ঞান হয় না।

পাবনা থেকে আগত দুজন মুসলমান ভাইয়ের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় বলছিলেন,—যারা খেটে খায় তারা মানুষ হতে পারে। যারা ধাপ্পা দিয়ে খেতে চায়, তাদের মানুষ হওয়া খোদার খাতায় নেই।

বৃদ্ধ মুসলমান ভাই—কাজও আছে, আর আপনি দেশে যান কিনা, এই বুড়ো বয়সে আর দেখা হয় কিনা, তাই আসলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাল করেছ। বেঁচে যদি থাকি, আর তোমরা নিতে যদি পার, ওখানে যাবই ত। ও মাটির মত মিঠে মাটি আর কোথায় পাব বল। ওখানে যেতেই ত চাই।

কয়েকজনের বিশ্বাসঘাতকতা সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আচ্ছা এত নেমক হারামির কারণ কী বলতে পার ? আমি ত নিজের ছেলের মত পালন করেছি, কোন ত্রুটিই ত করি নি। অসুখে, বিসুখে, আপদে, বিপদে, প্রয়োজনে, ফূর্তিতে সমানে টেনে এসেছি।

পুরনো দিনের কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হেমাইতপুরের গাঁও কি আবার তেমন করা যাবে ? সেই লোকজন, সেই হাটবাজার, সেই আমোদ ফূর্তি। মনে পড়লে এখনও আমার প্রাণ আনচান করে ওঠে।

আসাবদা আসলেন। তার সঙ্গে কথায় কথায় দুর্গানাথদার কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সান্যাল মশায়কে দেখিস। ও মানুষ বড় উপকারী মানুষ। তার উপকার শোধ করা যায় না। মানুষটা আজ বড় বিধ্বস্ত। ছেলেমেয়ে, জামাই মারা গেল, কতকগুলি অপোগণ্ড শিশু ও বিধবা তাঁর ঘাড়ে। …মডেল কোম্পানি যখন আমাদের সব সম্পত্তি নিলাম করে নেবার উপক্রম করেছিল, তখন আমার ত কিছু ছিল না। সেই অবস্থায় কিছু না বলতেই আমার মুখ দেখেই, সে ঘর থেকে এক থোকে ১৫০০ না কত টাকা একসঙ্গে এনে আমাকেদিয় সব উদ্ধার করেছিল। দেখিস ও যেন কষ্ট পায় না মোটেই।

আর তোরা থাকতে কষ্ট পাবেই বা কেন? তার বুক ভাঙ্গা, বল দিস, সাহস দিস।

আসাবদা—লক্ষ্য রাখব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওদিকে সব ঠিক আছে ত?

আসাবদা—কেউ যাতে ফাঁকি দিতে না পারে, শোষণ করতে না পারে, ভাল ব্যবহারের সুযোগ নিতে না পারে সেই চেষ্টা করছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মমতার ঠেলায় আমি না দিয়ে পারতাম না। ভাবতাম, আমি যদি একমুঠো না দিই, ওর ছেলেটা বা মেয়েটার কী হবে? দুটো খেয়ে বাঁচুক ত! এই ভেবে দিতাম, ভালর জন্যই দিতাম, কিন্তু করত উল্টো। আমারই সর্বনাশ করতে চাইত। আয় না করে, ফাঁকি দিয়ে ও ক্ষতি করে খাওয়ার মতলবই আঁটত। আমি যেভাবে করেছি, তাতে ওরা মানুষ হতে পারে নি—নিজেদেরই দুষ্ট বুদ্ধির জন্য। তোমরা যেভাবে করছ, ফাঁকি দেবার সুযোগ দিচ্ছ না, বুঝে নিচ্ছ, কাজ করিয়ে নিচ্ছ, তাতেই ভাল হবে।

এরপর ওঁরা চলে গেলেন। শরৎদা (হালদার) আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—লেখাগুলি পড়ছেন ত?

শরৎদা—হ্যাঁ! বিশ্বাস করে ঠকলাম বলে যে বাণীটা আছে, ঐ পর্যন্ত পড়েছি।

কাশীদা—একজনের উপর বিশ্বাস করা সত্ত্বেও ত ঠকায় সে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিশ্বাস করতে গেলে তার বিহিত ব্যবস্থাগুলি actively ( সক্রিয়ভাবে ) materialise ( বাস্তবায়িত ) করে তোলা ত চাই। বিশ্বাস কম কথা নয়। তুমি যদি ঠক অর্থাৎ কেউ যদি তোমাকে ঠকাবার সুযোগ পায়, তার জন্য তুমিও কম দায়ী নয়।

শরৎদা—আপনি যে রকম বলেন, সে রকম করাই ত মুশকিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঠকেন ক্ষতি নেই, কিন্তু ব্যাপারটা আপনার জানার পাল্লার বাইরে যেন না যায়, এইটেই বড় কথা।

শরৎদা—সবটাই পারা যায়, কিন্তু আত্মপ্রতিষ্ঠার বুদ্ধিটাই যেন মানুষের শেষ পর্যন্ত যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ যদি বোঝে যে আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে চায় যে পথে, সে পথে আত্মপ্রতিষ্ঠা হয় না, বরং উল্টো ফল হয়, resistance ( প্রতিরোধ ) বেড়ে যায়, ওটা আত্মপ্রতিষ্ঠা ব্যাহত হবারই পথ এবং প্রতিষ্ঠার সত্যিকার পথই হল ইষ্টপ্রতিষ্ঠা, তখণ নিজের ভুল নিজের কাছে ক্রমেই আরো আরো ধরা পড়ে এবং তা শুধরে নিতে পারে। ইষ্টপ্রতিষ্ঠার একটা মস্ত সুবিধা এই যে ঐভাবে তন্ময় হয়ে ঐ বুদ্ধি নিয়ে, নিরভিমান, অকপট অন্তরে যেই আপনি কারও কাছে গেলেন, অমনি তার শ্রদ্ধার কর্কটা খুলে গেল, আপনার মাধ্যমে সে আপনার ইষ্টের স্পর্শই পেয়ে গেল। অজ্ঞাতসারে আপনার ইষ্টের ছাপ তাঁর মাথায় পড়ল, আপনি যেন ইষ্টবাহী একটি যন্ত্র মাত্র, তিনিই সঞ্চারিত ও প্রতিফলিত হচ্ছেন আপনার ভিতর দিয়ে। এই সঞ্চারণার ফলে আপনার ইষ্টের উপর তাঁর টান যত গভীর হবে, আপনিও ততখানি প্রতিষ্ঠিত হবেন তাঁর কাছে।

ইষ্টপ্রতিষ্ঠা যারা চায় তারা বিধ্বস্ত হয় কমই। যারা আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে যায় তারা সহজেই বিধ্বস্ত হয়। হিটলার, মুসোলিনির মত মানুষ পড়ে গেল। স্ট্যালিন লেনিনের প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে কিন্তু দাঁড়িয়ে গেল। ক্রাইস্ট ও তাঁর বিশিষ্ট শিষ্যদের স্মৃতি কি দুর্দান্ত

প্রভাবে আজও reign (রাজত্ব) করছে। অমুক ক্যাথিড্রাল তমুক ক্যাথিড্রাল সারা পৃথিবীতে ছেয়ে আছে। ইষ্টস্বার্থ প্রতিষ্ঠায় যে যত স্বার্থপর হয়ে ওঠে, সে হয় তত অনাসক্ত, তার প্রবৃত্তি ও অহমিকার resistance (বাধা) তত কমে যায়। আর তার চলনাও তত accelerated (তিব্র গতিসম্পন্ন) হয়ে ওঠে। তখন হয় "নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বর।" ঐ যতটুকু হলো, ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ তাকে ততটুকু আলিঙ্গন করবেই। ২৫টার বেশি ঋত্বিকী করাতে পারলাম না, তার কারণ অন্তরায় আমার নিজের মধ্যেই। তেমন হলে ঋত্বিকী নিয়ে পারবেন না, refuse (প্রত্যাখ্যান) করতে হবে। ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠাপন্নতায় কথা এমন হবে, ব্যবহার এমন হবে যে মানুষ দিতেই উদগ্র হয়ে উঠবে। তখন ঠাকুরের একপয়সা একলাখ টাকা বলে মনে হবে। তাঁর স্বার্থটাই প্রবল, কিছুতেই তাঁর এতটুকু ক্ষতি যেন না হয়।

শরৎদা—একেবারে চচ্চড়ি বনে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ চচ্চড়ি ছিল নিজের স্বার্থে, তাঁর স্বার্থটাই যে এখন নিজের স্বার্থ হয়েছে। এত কথার মধ্যে কথা ইষ্ট-স্বার্থপ্রতিষ্ঠা, এমন কথা আর হয় না।

সুরেনদা—আত্মস্বার্থ, আত্মপ্রতিষ্ঠা, নিয়েই ত মানুষ চলে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাই ত হয়ে না তা, মানুষ repelled (প্রতিহত) হয় তার কাছে।

কাশীদা—একজন চেয়ে পায় না, আর একজন চায় না, পায়, তার মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাকে দিয়ে তৃপ্ত হয়। দেওয়ার উৎসরণ হয়, তার attitudeএ (মনোভাবে)। সে নিজের জন্য চায় না, তার সংস্পর্শে দেওয়াটাই খুলে যায়॥

কাশীদা—চেয়েও পায় না কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Self-centric (আত্মকেন্দ্রিক) হলো, মানে একজনের দেওয়ার প্রবৃত্তির গলা টিপে ধরল। কথাই কইতে জানে না সে।

যার নিজেকে উজাড় করে দেওয়া আছে ইষ্টে, তার উজাড় করা কথা যোগায়, উজাড় করা হাত নাড়া আসে, উজাড় করা চলন ও ভঙ্গী ফুটে ওঠে আপনা হতে, মানুষ তখন আপনা থেকে ঝুঁকে পড়ে তার দিকে। আবার আছে, কথা কয়ে ঠাকুরকে ছাড়ব কখন তার হিসাব চাই। যখন দেখব অবসর হয়েছে, ক্ষেত্র হয়েছে, শ্রদ্ধা এসেছে, ঠাকুরকে তখন বের করব টেকের থেকে। গীতায় আছে, অশুশ্রূষু এবং ঈর্ষাপরায়ণ যারা তাদের কাছে আমার কথা বলবে না। তার আগে পর্যন্ত মনোবিজ্ঞান যা জানা আছে, সেইভাবে চল, স্বকেন্দ্রিক রকমে তার ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা কর। শুনতে-শুনতে সে নিজই তখন চেপে ধরবে, 'বল কাশীদা কিসে হয়'। তোমার কথায় যেন মুগ্ধ হয়, উদ্‌বুদ্ধ হয়, সশ্রদ্ধ হয়, সে psychology ( মনোবিজ্ঞান )ই কও, astrology (জ্যোতিষশাস্ত্র)ই কও আর science (বিজ্ঞান)ই কও। তোমার কথাবার্তা, চালচলন যেন এমনতর হয়, যাতে তার শ্রদ্ধা চুষে নেয়।

তাঁবুর ভিতর সেই শীতের রাতে তখন এক দিব্যভাবের পরিমণ্ডল রচিত হয়েছে। ভক্তবৃন্দ নির্বাক, ধ্যানপরায়ণ ও আবেশ-বিভোর।

৩রা মাঘ, রবিবার, ১৩৫৫ (ইং ১৬।১।৪৯)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর গোল তাঁবুর শুভ্র শয্যায় পূর্ব্বাস্য হয়ে রোদে তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসে আছেন। মুখে তাঁর ভুবন-মোহন হাসি, চোখে তাঁর অপরূপ আনন্দের দীপ্তি। দেখে আশ মেটে না, মনে হয় যুগযুগান্ত ধরে অপলক নেত্রে ঐ নয়নরঞ্জন মধুরমূর্তি দর্শন করি। দর্শন করি আর তাঁকে নিয়ে সমাহিত হ'য়ে থাকি।

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য) আবেগদীপ্ত কণ্ঠে গীতার চতুর্থ অধ্যায় এবং শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের লেখা রোদে দাঁড়িয়ে পড়ে শোনাচ্ছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর আগ্রহভরে শুনছিলেন এবং মাঝে-মাঝে সমর্থনসূচক ভঙ্গিতে মাথা নাড়ছিলেন। বীরেনদা (মিত্র), চুনীদা (রায় চৌধুরী), মন্মথদা ( দে ), শরৎদা ( হালদার ), কিরণদা ( মুখার্জি ), সুধীরদা ( বসু ), সুরেনদা ( সেনগুপ্ত ), কালীদাসী মা প্রভৃতি অনেকেই কাছে ছিলেন।

কর্ম্মযোগ সম্বন্ধে কথা উঠলো।

মন্মথদা—অনাসক্ত হ'য়ে কর্ম্ম করা যায় কি ভাবে?

আসক্তি তো থাকেই!

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনার আসক্তি যদি ইষ্টের উপর গিয়ে পড়ে এবং তাঁর প্রীতি, তৃপ্তি, স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠার জন্য যদি আপনি সব কাজ করেন, তবে তা'কেই বলা যায় অনাসক্ত হ'য়ে কর্ম্ম করা। এতে বন্ধন হয় না, বরং চিত্তশুদ্ধি ও মুক্তির পথ খুলে যায়।

আত্মস্বার্থ ও আত্মপ্রতিষ্ঠা বাদ দিয়ে ইষ্টের স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠাকে যথা-সর্ব্বস্ব করে নিতে হয়। এই হোল তুক। আবার, কারও বুদ্ধিভেদ জন্মাতে নেই। নিজে ইষ্টার্থে কর্ম্মরত থেকে সবাইকে কর্ম্মরত করে তুলতে হবে। আলস্য থেকে কর্ম্ম ভাল। কেউ যদি সম্যক ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠাপন্ন না'ও হ'তে পারে এবং ইষ্টকে অবলম্বন ক'রে সকামভাবে অর্থাৎ নিজের মঙ্গলের জন্য যজন-যাজন-ইষ্টভৃতি করে সেও কিন্তু ফেলনা নয়। ঐ করতে-করতে তা'র ইষ্টের উপর টান যত জাগবে, ততই ইষ্টার্থে কাজ করবার সার্থকতা সে বুঝতে পারবে। ইষ্টার্থী হ'লে নিজের স্বার্থ আরো ভাল ক'রে পূরণ হয়। অবশ্য সেই বুদ্ধি নিয়ে প্রকৃত ইষ্টার্থ-পরায়ণ হওয়া যায় না। মূল জিনিষ হ'লো তাঁকে ভালবাসা, তাঁকে স্বার্থ ক'রে নেওয়া। সতী স্ত্রীর যেমন হয় তার স্বামীর জন্য। স্বামীর স্বার্থ বাদ দিয়ে নিজের আলাদা কোন স্বার্থের কথা সে ভাবতেই পারে না।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তবৃন্দ-পরিবেষ্টিত হ'য়ে বড়াল-বাংলোর প্রাঙ্গণে রোদের মধ্যে ইজি চেয়ারে ব'সে আনন্দ মশগুল হ'য়ে নানা বিষয় আলোচনা করছেন।

আজ বেলা সাড়ে এগারটার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর একটি বাণী দিয়েছেন। প্রফুল্লকে সেটা পড়তে বললেন।

পড়া হ'লো—

ইষ্ট বা আদর্শে, অচ্যুতভাবে
কেন্দ্রায়িত হ'য়ে উঠবে যতই তুমি—

কর্ম্ম ও প্রবৃত্তির সার্থক অন্বয়ে,—
ততই জ্ঞান-প্রভানুরঞ্জিতালোকে
সাকার তোমার বৈশিষ্ট্য-স্বার্থে
নিরাকারে সার্থক হ'য়ে উঠতে থাকবে,
দেখবে তখন, এই সাকারই
দেদীপ্যমান রয়েছে ওতপ্রোত-নিরাকারে,
পন্থা ওইই—
ইষ্টস্বার্থী ভক্তি-আপ্লুত সেবা-সংহতি।

শচীনদা ( গাঙ্গুলী )—ব্যাপারটা কিরকম ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেমন শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে অর্জ্জুনের বিশ্বরূপ দর্শন। সাকারটা সার্থক হ'য়ে গেল বিশ্বরূপে। সাকার মানে একটা বিশিষ্ট আকার আর নিরাকার মানে সর্ব্ব আকারের মুল ভিত্তি যিনি, উৎস যিনি, উপাদান যিনি, কারণ যিনি, আর এ তাবৎকাল যত আকার হয়েছে, তা ছাপিয়ে আরো অনন্ত আকারের বীজস্বরূপ যিনি। তাই বলে পুরুষোত্তম ক্ষরাক্ষরাতীত। প্রত্যেকটি আকারই বৈশিষ্ট্য সমন্বিত। তাই, নিরাকার বা নির্বিশেষকে উপলব্ধি করে প্রত্যেকে তার বিশিষ্ট রকমে। আবার, ব্রহ্মজ্ঞান হ'লে সব একাকার হয়ে যায় না। ব্রহ্মজ্ঞানের সঙ্গে থাকে বৈশিষ্ট্যজ্ঞান। এক ও অদ্বিতীয় কোথায় কোন্ বৈশিষ্ট্য নিয়ে আছেন তা' ধরা পড়ে। শুধু philosophyর (দর্শনশাস্ত্রের) আলোচনায় এখানে আসা যায় না। এর জন্য চাই ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর প্রতি unrepelling adherence ( অচ্যুত নিষ্ঠা )।

সুরেনদা ( বিশ্বাস )—একজন সীমাবদ্ধ মানুষে বিশ্বরূপ কিভাবে দেখা যায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—'বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি' হ'য়ে ওঠেন। প্রথমে ভক্ত তাঁতে concentric ( কেন্দ্রায়িত ) হয়, সেই concentric attachment ( কেন্দ্রায়িত অনুরাগ ) পরে sublimated ( ভূমায়িত ) হ'য়ে ওঠে।

তখন "যত্র যত্র নেত্র পড়ে, তত্র তত্র কৃষ্ণ স্ফুরে"—এমনতর রকম হয়। কৃষ্ণ যে একাধারে সর্ব্বময়, সর্বস্বরূপ ও সর্ব্বাতীত। আবার অর্জ্জুনের তাঁর উপর এমনতর টান ছিল যে তিনি তাঁর বিশেষ প্রীতি ও অনুগ্রহলাভে সমর্থ হয়েছিলেন।

তাই এই অনন্যসাধারণ ব্যাপারটি সংঘটিত হ'তে পেরেছিল। কিন্তু অর্জ্জুন বিশ্বরূপ বেশি সময় stand (সহ্য) করতে না পেরে বলেছিলেন—আপনি চতুর্ভুজ রূপে অর্থাৎ সীমায়িত হ'য়ে দেখা দেন। আর, সেইটেই মানুষ চায়।

যোগেনদা (হালদার)—অর্জ্জুনকে এটা ত কৃষ্ণ দয়া ক'রে দান করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নেওয়া না থাকলে কি দান করা যায়?

শরৎদা (হালদার)—সাকারের মধ্যে নিরাকার বোধ কেমন করে হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Concentration এ (একাগ্রতায়) sublimation (ভূমায়িতি) হয়, সেইটেই ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। তখন সব কিছুর অন্তর্নিহিত নীতিটা, তত্ত্বটা, কারণটা, মরকোচটা উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে।

এর পর শ্রীশ্রীঠাকুর গোল তাঁবুতে এসে বসলেন। মন্মথদা (দে) প্রমথ দার মৃত্যু সম্বন্ধে আক্ষেপ করছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রত্যেকের potency of life (জীবনী শক্তি) রূপে ঠাকুরই বিদ্যমান। তিনিই মূল উৎস। সেদিক দিয়ে একথা বললে ভুল হয় না যে আমাদের ভিতর ততখানি ঠাকুর থাকেন, যতখানি আমরা যেমন করে বাঁচি।

সরোজিনীমা—আপনার নিষেধ না মানায় অনেকে বিপন্ন হয়, তা জানা সত্ত্বেও আমরা ভুল ক'রে বসি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার নিষেধ সম্পূর্ণ সার্থক হয় কমই। কেউ হয়ত কিছুদিন মানে, পরে ভুলে যায়। সবই আমার ভাগ্য। সব জেনেও তোমাদের সহযোগিতার অভাবে আমি অপারগ। কী করব, নিজেকেই হতভাগা মনে হয়।

প্রফুল্ল—ইষ্টপ্রাণতাই কি আয়ুর পরিমাপক ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—জীবনীশক্তি-রূপী ঠাকুরত্বের পূর্ণ সুযোগ আমরা পাই, বিক্ষেপ কমই হয়, যদি আমাদের ইষ্টপ্রাণতা অটুট থাকে।

৪ঠা মাঘ, সোমবার, ১৩৫৫ ( ইং ১৭৷১৷৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে গোল তাঁবুতে আসীন। মন্মথদা (দে) এসে ব্যথাভরে প্রমথদার কথা বলছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরও বেদনায় বিহ্বল হয়ে আর্ত্তভাবে কাঁদতে লাগলেন। মন্মথদা তখন শ্রীশ্রীঠাকুরকে সামলাবার জন্য অন্য কথা পাড়লেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর ধীরে-ধীরে আত্মসম্বরণ করলেন।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তবৃন্দ-পরিবেষ্টিত হ'য়ে বড়াল-বাংলোর প্রাঙ্গণে ইজি চেয়ারে সহাস্যবদনে উপবিষ্ট। দেখে মনে হয় যেন এক আনন্দের হাট বসেছে। আনন্দময়ের সান্নিধ্যে ভক্তগণের প্রাণমন পরম পুলকিত।

এমন সময় কয়েকজন ভদ্রলোক আসলেন। তাঁদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করলেন—মুক্তি কাকে বলে ? মুক্তি আসে কি ক'রে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রবৃত্তির দ্বারা বিক্ষোভিত ও বিচ্ছিন্ন না হওয়া, তাদের integrated (সংহত) করা—তা'কেই বলে মুক্তি। ভক্তিই সেই মুক্তির পথ। প্রবৃত্তিগুলিকে সম্যক ইষ্টপ্রতিষ্ঠাপন্ন ক'রে তোলাই মুক্তির তাৎপর্য।

ভদ্রলোক—প্রবৃত্তি ত থাকবেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রবৃত্তি থাকলেও বাঁচাটা বিক্ষুব্ধ হয় তা' ত চাই না। রসগোল্লা খেতে চাই, কিন্তু রসগোল্লা খেয়ে অসুস্থ হ'য়ে পড়তে চাই না, অস্বস্তিও বোধ করতে চাই না, অস্বস্তি থেকে রেহাই পেতে চাই। রসগোল্লা সত্তাটা কম্পিত করে দেয়, তা' চাই না।

ভদ্রলোক—পরিবেশ ত আছে। তাছাড়া বাঁচা ত যায় না!

শ্রীশ্রীঠাকুর—ছাড়ার কথা ত বলছি না। ছাড়বে কেন ? বৌ ছেলে,

ব্যবসা-বাণিজ্য কিছুই ছাড়তে হবে না। ধর্ম্ম উপার্জ্জন করতে হবে এর ভিতরেই। চাই ইষ্টানুগ আত্মনিয়ন্ত্রণ। প্রবৃত্তির উপর আধিপত্য না থাকলে ব্যক্তিত্ব বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তখন কামের তুমি, ক্রোধের তুমি, লোভের তুমি, মদের তুমি, মোহের তুমি, মাৎসর্য্যের তুমি, তোমার কাম, তোমার ক্রোধ, তোমার লোভ, মদ, মোহ, মাৎসর্য্য—তা' নয়। একটু পুজো করলাম দু'বেলা, সমগ্র জীবন প্রভাবিত হলো না, সংসারের প্রত্যেকটি কর্ম্মে সে পূজো ফুটে উঠল না, তা' কিন্তু ধর্ম্ম নয়। পরিবেশ সহ নিজের সত্তা সম্বর্দ্ধনাকে ধরে রাখে যা, তা'কেই বলে ধর্ম্ম। পুজো ভাল, ধর্ম্মের ঝুঁটোও ভাল, কিন্তু ধর্ম্মকে কর্ম্মের ভিতর দিয়ে পরিপালন করতে হবে, নচেৎ তা' সার্থক হবে না।

উক্ত ভদ্রলোক—শাস্ত্রে আছে 'হরের্নাম হরের্নাম, হরের্নামের কেবলম্'।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাঁর নাম সদ্গুরুর কাছ থেকে পেয়ে সাধন করতে হয়—সদ্গুরুর প্রতি অনুরাগ নিয়ে। সংসারের কাজের মধ্য দিয়ে ধর্ম্মকে যদি মূর্ত্ত করে তুলতে না পারি, তবে কি হোল? গার্হস্থ্য আশ্রমে যেটা হয়, সেটা হয় পাকা পোক্ত ও শক্ত। জটাজুটো ধরে সন্ন্যাসী সেজে চিমটে নিয়ে বনে গেলাম, তাতে প্রবৃত্তির কী হোল? প্রবৃত্তি-নিয়ন্ত্রণই ত বড় কথা। তার কী হ'ল। ইয়াদ রাখলাম না, খুব আমি সন্ন্যাসী। সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতে ঘেষড়ে ঘেষড়ে ঠিক হ'য়ে যায়, অবশ্য ইষ্টানুগ চলন যদি থাকে। আবার বৈরাগ্যবান প্রকৃত সন্ন্যাসীও আছে।

উক্ত ভদ্রলোক—সন্ন্যাসী হ'য়ে বনে গেলে concentration (একাগ্রতা) এর স্থবিধা হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Concentration (একাগ্রতা) না diversion (বিক্ষেপ) কোন্‌টা হয় ঠিক কি? সংসারের সবটার মধ্যে ইষ্টমুখী চলন, চরিত্র, ব্যবহার যদি ফুটে ওঠে, সেটা কত শক্ত ও সুন্দর হয়! অবশ্য প্রলোভন চারিদিকে, টাকার লোভ, হামবড়াই কত কী! জিদের ঝোঁকে ব'লে দিলে—লিয়ে লাও মাথা, পঞ্চাশ হাজার দেঙ্গে। এই ভাবে প্রবৃত্তির

চাকর হ'য়ে তা'র খোরাকী না জুগিয়ে, প্রবৃত্তি যদি তোমার সত্তার খোরাকী জোগায় তখন কেমন হয়!

প্রশ্ন—সুখ ত কারও নেই দুনিয়ায়!

শ্রীশ্রীঠাকুর—ব্যক্তিত্ব বিচ্ছিন্ন হ'লে সুখ হবে কি করে?

প্রশ্ন—সকলের সুখ না হলেও ত হয় না! তাই বা কি ক'রে হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরিবেষ্টনী শুদ্ধ আমার সব নিয়ে ইষ্টস্বার্থ প্রতিষ্ঠাপন্ন হই যত, আমাদের ভিতরে শান্তিও থাকে তত, আর সপরিবেশ উন্নতিও হয় তেমন। পন্থা—ইষ্টস্বার্থী ভক্তি-আপ্লুত সেবাসংহতি। সব জায়গায়ই পন্থা ঐ।

উক্ত ভদ্রলোক—দুনিয়ার রকম দেখলে ভগবানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে ইচ্ছা করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভগবানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করি, তাতে তাঁর কোন ক্ষতি নাই। আমরা বাঁচতে চাই, বাড়তে চাই, শান্তি পেতে চাই। বিদ্রোহ ক'রে তা'র অন্তরায় মা হ'লে আমাদেরও ক্ষতি নাই। তবে দেখতে হবে, তাঁকে বাদ দিয়ে জীবনবৃদ্ধি ও শান্তি নিরাবিল ভাবে চলে কিনা।

উক্ত ভদ্রলোক—রাশিয়ায় ত হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—রাশিয়ার দিকে তাকাচ্ছি এখান থেকে। যারা সেখান থেকে আসে বা দেখে আসে তা'রা ত বলে উল্টো। সেখানে নাকি গির্জ্জা ও মসজিদ ঢের আছে, শিক্ষাক্ষেত্রে নাকি co-education ( ছেলে মেয়েদের সহশিক্ষা ) তুলে দিচ্ছে। সে অনেক কথা। আমি বলি ক্ষিদে থাকে ত খাওয়াই ভাল। রাশিয়া, ভারতবর্ষ বা আমেরিকা ধর্ম্ম ছাড়ুক আর নাই ছাড়ুক, ভগবান থাকুন আর নাই থাকুন,দেখতে হবে ও সব বাদ দিয়ে সত্তা সম্বর্দ্ধনা ঠিক থাকে কিনা! ভগবানকে বাদ দিয়ে যদি বাঁচতে পারি ও বাড়তে পারি, ভগবান দিয়ে দরকার কী?

উক্ত ভদ্রলোক—ধর্ম্ম ও ভগবান সম্বন্ধে আমাদের ধারণা ত কতকগুলি সংস্কারের উপর নির্ভর করে, সেগুলি ত টেঁকে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার শুভ সংস্কার বা বোধ যদি বাইরের সংঘাতে শিথিল হ'য়ে যায়, তোমার বিশ্বাস ও ব্যক্তিত্ব কত ক্ষুদ্র, কত স্বল্প, কত ভঙ্গুর ভেবে দেখ ত! তার মানে সবাই হজম করতে পারে তোমাকে, তুমি পার না হজম করতে কাউকে। কতখানি দুর্ব্বল তুমি। অর্থাৎ অজীর্ণতা পেয়ে বসেছে তোমাকে। ডাল-ভাত-তরকারি যা' খাও তা assimilate (আত্মীকৃত) করার পরিবর্তে তাই যদি তোমার শরীরের জীবনী রস নিয়ে বেরিয়ে যায়, তাকে কয় dyspepsia (অজীর্ণতা)। আমরা environment (পরিবেশ) থেকে নিয়ে বাঁচি, যদি কিনা তা assimilate (আত্মীকৃত) করতে পারি। আজ যদি স্বাস্থ্য ঝগড়া করে বলে আমি তা' করব না, রোগের bacteria (জীবাণু)ই যদি প্রবল হয়, তা'হলে ত সত্তা টেঁকে না। জীবন বাঁচাতে গেলে বৈশিষ্ট্যে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে environment (পরিবেশ)এর সহযোগিতা নিয়ে চলা চাই। নিজত্ব হারালে পারিপার্শ্বিক থেকে পুষ্টি সংগ্রহ করা যায় না, আবার পারিপার্শ্বিক বাদ দিয়েও জীবন চলে না। জন্ম নিতেই dependent (নির্ভরশীল) হ'তে হয় মা-বাবার উপর নচেৎ জন্ম হয় না।

উক্ত ভদ্রলোক—তা'ও হয়। আজকাল টেস্ট টিউব বেবী হচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা'তে বীজ রজ কিছু লাগে না?

ভদ্রলোক—তা বোধ হয় লাগে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা করে দেখেছি, কিন্তু তার মানে এ নয় যে মা-বাবা লাগবে না।

ভদ্রলোক—বার-বার জন্মগ্রহণ করাটা পরিহার করা যায় কি ভাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পন্থা—ইষ্টস্বার্থী ভক্তি-আপ্লুত সেবা-সংহতি। ইষ্টে কেন্দ্রায়িত হয়ে তাঁর স্বার্থকে নিজের স্বার্থ করে তোলা।

"ঈশ্বরের প্রীতি আর আরাধনা তরে
যে সকল কর্ম্ম নরে অনুষ্ঠান করে
তাহা ভিন্ন অন্য-কর্ম্মে বন্ধন নিশ্চয়
ঈশ্বরের তরে কর্ম্ম কর ধনঞ্জয়।"

যারা এই ভাবে ঈশ্বরার্থে কর্ম্ম ক'রে বন্ধন মুক্ত হয়, তাদের প্রবৃত্তি-জনিত কর্ম্মফল ভোগের জন্য বার-বার আসা লাগে না। আবার, অনেক ভক্ত এমন আছে যে তাঁ'রা মুক্ত হয়েও ইষ্টের সেবার জন্য তাঁর আবির্ভাবের সময় লীলা সহচর হয়ে আসতে চায়। অন্য সময়ও কেউ কেউ আসে তাঁর ঈপ্সিত কাজ সমাধা করবার জন্য। প্রকৃত ভক্ত নিজের কোন ইচ্ছার দাসত্ব করে না। প্রভুর ইচ্ছাধীন হয়ে চলাটাই তার একমাত্র কামনা। তাই বলে অহেতুকী ভক্তি মুক্তির থেকেও বড়। আমরা ধর্ম্ম করি, ঈশ্বর আরাধনা করি, সাধারণত তার উদ্দেশ্য হলো শান্তি, অমৃতত্ব। শান্তি মানে মৃতের মত চেতনা-হীন অবস্থা লাভ করা নয়। শান্তি হ'লো—Tranquil balanced state (শান্ত সমতার ভাব) সুখ-দুঃখ সব অবস্থার মধ্যে।

ভদ্রলোক—হিন্দু ধর্ম্ম বড় জটিল, ধাঁধাঁ লাগিয়ে দেয়। আচ্ছা ইষ্টস্বার্থ ই বা বুঝব কি করে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—একজন আদর্শ মানুষ যদি আমার সামনে থাকেন, অনুরাগের সঙ্গে তাঁর অনুসরণ ও সাহচর্য্য যদি করি, তাঁর চাহিদা খানিকটা বুঝতে পারি। তদনুযায়ী যদি করি, চলি, আরো বুঝি। করায় করা'র পথ খোলে, বুঝে বুঝের পথ খোলে, আরোতর হয়। চলার পথে বুঝের পাল্লা বেড়ে যায়। Concentric attachment (সুকেন্দ্রিক অনুরাগ) হ'লে knowledge (জ্ঞান) integrated (সংহত) হয়, materialised (বাস্তবায়িত) হয়। Meaningful adjustment (সার্থক বিন্যাস) হয়। হাতুড়িটা কামারের কাছে দেখছি, ঘরামী হাতুড়ি ব্যবহার করে, কয়লা ভাঙ্গতে হাতুড়ি লাগে, মিস্ত্রী হাতুড়ি ব্যবহার করে। হাতুড়ির ব্যবহার কত জায়গায় কতভাবে হয় জানতে জানতে অন্বিত জ্ঞান হয়। জ্ঞান জ্ঞানের পাল্লা বাড়িয়ে দেয়। একমুখী সক্রিয় সন্বিৎসায় জ্ঞানের meaningful adjustment (সার্থক বিন্যাস) হয়। কামার হাতুড়ির ব্যবহার যতটুকু করে, হাতুড়ির ব্যবহার সম্বন্ধে মাত্র ততটুকুই যদি জানে আর খবর না রাখে, তবে তাঁর জ্ঞানটা হয় খণ্ডিত জ্ঞান। তেমনি শাস্ত্রের অনুশাসন কোথায় কেন কি জন্য কী

দেওয়া আছে। তা' বাস্তব জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হয়। বিশেষ স্থান, কাল, পাত্র অনুযায়ী যে বিশেষ নির্দ্দেশ দেওয়া থাকে, তা' যদি একঢালা ভাবে সবার উপর চালাতে চাই, তাহলে গোলমাল বাধে। জটিল কিছুই না। Conceptionএ (ধারণায়) গোল থাকে তাই জটিল মনে হয়। বোঝে যারা, তাদের কাছে গোল নেই। আমরা যে চেষ্টাই করি না। আদত কথা হ'লো সবই সোজা যদি গুটি ধরি, গুটি না ধরলে বাগে আনা যায় না।

প্রফুল্ল—গুটি কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—খেই অর্থাৎ মুড়োটা যদি হাতে থাকে সেইটে ধরে কায়দা করে করে এগুতে পারি। রামকৃষ্ণ ঠাকুর বুড়ি ছোঁয়ার কথা বলেছেন।

শরৎদা—তার মানে ত ইষ্ট ধরে চলা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ! তিনিই ত বেত্তা পুরুষ।

ভদ্রলোক—চলাটা ঠিক হ'লো কিনা বুঝব কি করে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিজেই বোঝা যায়, যদি কর। করে জান।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে গোল তাঁবুতে একখানি কাঁথা গায় জড়িয়ে দক্ষিণাস্য হয়ে বিছানায় বসে আছেন। শচীনদা ( গাঙ্গুলি ), যোগেনদা ( হালদার ), ব্যোমকেশদা ( ঘোষ ), মন্মথদা ( দে ), হরিদাসদা ( সিংহ ), মায়া মাসিমা, কালীষষ্ঠীমা, সুশীলাদি (হালদার), ননী মা, কালিদাসী মা, তরুমা, সুধাপাণি মা, সুকুমারী মা, শৈল মা, সেবা দি, রেণুমা, রাণী মা, হেমপ্রভা মা প্রভৃতি উপস্থিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে বললেন—পাবনায় এই শীতকালে রস, গুড়, পাটালি, পিঠে, পায়েস খাওয়ার ধুম লেগে যেত।

কালীষষ্ঠীমা—নিজেদের দেশে থাকার মত সুখ আর নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে বললেন—কথা যা কইছিস্ লাখ কথার এক কথা। তাই ত কয় সোনার বাংলা। অমন জায়গা আর হয় না।

এরপর কম্যুনিজমের শ্রেণীদ্বন্দ্ব নিয়ে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি কই মানুষ আপন টাকা পর, যত পারিস মানুষ ধর। ধনিকই হোক, আর শ্রমিকই হোক, কৃষকই হোক আর জমিদারই হোক—মানুষ ছাড়া কারও চলার জো নেই। মানুষ যদি মানুষ-স্বার্থী না হয়, মানুষের মধ্যে যদি পারস্পরিকতা না বাড়ে, সমাজে যদি দ্বন্দ্ব-বিরোধ প্রবল হয়ে ওঠে, তাতে কারও ভাল হবে না। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কটা যদি স্বাভাবিক না হয়, বৈশিষ্ট্যসম্মত না হয়, তাহলে সমাজের চিৎপ্রগতি রুদ্ধ হয়ে যায়, প্রাণের উচ্ছলতা থাকে না সেখানে। এমনি করে সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অপরের অস্তিত্বকে বিপন্ন করার অধিকার কারও নেই। (মন্মথদাকে লক্ষ্য করে) আপনি উকিল হ'লে exploiter (শোষক) কেন হবেন? একজন কৃষক যেমন শ্রমিক, আপনিও ত তেমনি শ্রমিক। আপনি করছেন মাথার শ্রম। তাই দিয়ে আপনার কৃষক মক্কেলকে বাঁচাবার চেষ্টা করছেন, সেও পারিশ্রমিক দিয়ে আপনাকে বাঁচাচ্ছে। মক্কেলেরও উকিলের দরকার আছে, উকিলেরও মক্কেলের দরকার আছে। উকিল না বাঁচলে, মক্কেলের যেমন ক্ষতি, মক্কেল না বাঁচলে উকিলেরও তেমনি ক্ষতি।

প্রফুল্ল—কম্যুনিষ্টরা বলে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে কিছু থাকবে না, সম্পত্তি সব রাষ্ট্রের। সবাই তাদের সাধ্যমত কাজ করবে এবং রাষ্ট্র তাদের দেখবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সব রাষ্ট্রের সম্পদ যদি হয়, নিজের বলে যদি কিছু না থাকে, নিজের ইচ্ছামত যদি কাউকে কিছু না দেওয়া যায়, তার মানে individual liberty (ব্যক্তি-স্বাধীনতা) বলে কিছু থাকল না, তার চিৎ-প্রগতি ক্ষুণ্ণ ও দুর্ব্বল হয়ে গেল, সে দিন দিন জড় হতে থাকল। চেতনার বিকাশ যদি ব্যাহত হয়, তাহলে দানাপানি জুটলেও বা লাভ কী? বৈশিষ্ট্যের উপর দাঁড়িয়েই হয় ব্যক্তি, শ্রেণী ও সমাজের আর্থিক ও পারমার্থিক বিকাশ—যদি কিনা নিষ্ঠা, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য ও পারস্পরিক সহযোগিতা অক্ষুণ্ণ থাকে। তা যাতে হয়, তাই করাই ভাল।

প্রফুল্ল—অপরকে দেওয়ার বিধান যে থাকবে না, তা নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার সঙ্গত decision ( সিদ্ধান্ত ) যদি না টেকে, তবে আমার স্ফূর্ত্তি কোথায়? সত্তাপোষণী স্বাধীনতা না থাকলে মানুষ সোয়াস্তি পায় না।

৫ই মাঘ, মঙ্গলবার, ১৩৫৫ (ইং ১৮।১।৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে গোলতাঁবুতে বিছানায় বসে আছেন। পাশে কেষ্টদা ( ভট্টাচার্য্য ), শরৎদা ( হালদার ), চুনীদা (রায় চৌধুরী), বীরেন দা ( মিত্র ), কিরণদা ( মুখার্জ্জী ), পণ্ডিত ভাই ( ভট্টাচার্য্য ), কালীদা ( সেন ) প্রভৃতি অনেকে দাঁড়িয়ে। এমন সময় সুধীরদা ( দাস ) আসলেন ( কাল তার দোকানে চুরি হয়ে গেছে )।

শ্রীশ্রীঠাকুর সুধীরদাকে দেখেই ঃ—কাল নাকি চুরি হয়ে গেল। চুরি হলো কি করে?

সুধীরদা—যতটুকু সাবধানতা অবলম্বন করার, তা'ত করা ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমারটা চুরি করল, সেইটেই আমার কাছে অপমানের মনে হয়। চুরি করবে কেন? তার মানে আমি এতই নিঝুম হয়ে থাকি যে আমার উপর মানুষ যা'খুশী ক'রে যেতে পারে।

পরে আবার ঐ সম্পর্কে বললেন—এখান থেকে যে চুরি হয়ে গেল, এতে আমার নিজেরই লজ্জা লাগে, আমরা এতখানি অলস, অসতর্ক ও বেহুঁশ কেন হব? আমি ত এ বিষয়ে কম বলিনি, তাতেও যদি খেয়াল না হয়।

কেষ্টদা—আপনি বলেছেন চতুর প্রহরী হবার কথা। আর এখন থেকেই চুরি হয় গেল।

রাত্রে শ্রীশ্রীঠাকুর গোলতাঁবুতে বিছানায় উত্তরমুখী হয়ে শুয়েছিলেন। পণ্ডিতভাই ( ভট্টাচার্য্য ), সুরেনদা (বিশ্বাস), শচীনদা ( গাঙ্গুলী ), কিরণ দা ( মুখার্জ্জী ), হরিদাসদা ( সিংহ ), পরেশভাই ( ভোরা ), প্রকাশদা ( বসু ) প্রভৃতি অনেকে ছিলেন।

মন্মথদা ( দে ) মহাত্মাজীর খাদ্য সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে গল্প করছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর শুনতে-শুনতে বললেন—ধর্ম্ম করা মানে বাঁচার ফন্দী করা, যাতে বাঁচাটা বেড়ে যায়, তাই করা। আমরা সাধারণতঃ সত্তাকে খরচ করে, উপভোগ করতে চাই। কিন্তু ধর্ম্ম করা মানে সব কিছুর ভিতর দিয়ে সত্তাকে পুষ্ট করে তোলা, অটুট করে তোলা।

মন্মথদা নিজের একদিনকার শারীরিক অসুস্থতা বোধের কথা সম্পর্কে বলছিলেন—মনের দুশ্চিন্তা থেকেই ব্লাড-প্রেসার ব'লে বোধ হচ্ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার ব্লাড-প্রেসার হ'লো ভোলার মা যখন মোকর্দ্দমা করল। ব্লাড-প্রেসার হওয়াতে ভাবলাম, বাঁচলাম, কোর্টে না যেয়ে পারবনে। ঐ থেকেই কিন্তু ধীরে-ধীরে ব্লাড-প্রেসার পেয়ে বসল।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর প্রস্রাব করতে গেলেন। ঘুরে এসে বললেন—Repeated shock ( উপর্য্যুপরি আঘাত ) পেয়ে পেয়ে এমন হয়েছে। আমার মুখ আটকা। কিছু কওয়ার জো নেই। আছে চাপের উপর চাপ। Shock (আঘাত) এর উপর shock (আঘাত)।

মন্মথদা—নিবেদন করে খায় কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Concentric ( সুকেন্দ্রিক ) হয়। নিবেদন করলে সমগ্র শরীর বিধান ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি ইষ্টে একতান হয়ে ঠিকভাবে কাজ করে। তাতে হজম ও পুষ্টি ভাল হয়। ভাবতে হয় সত্তারূপী ঠাকুরকে ভোগ দিচ্ছি।

মন্মথদা—একসঙ্গে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিবেদন মানে দেওয়া, জানান। একসঙ্গে না হ'লে হয়ত ধারণা-বহির্ভূত কতকগুলি জিনিস এসে হাজির হল, যার জন্য মন প্রস্তুত নয়।

সুরেনদা ( বিশ্বাস )—অধিবেশনে মিষ্টি ভোগ দেয়। আমাদের যতিদের ত মিষ্টি খাওয়া বারণ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দিলেও তুমি খাবে না। অন্যকে দিয়ে দেবে। তোমার আচরণটাই ত হবে যাজন।

প্রফুল্ল—প্রসাদ না খেলে গৃহস্বামীর মনে লাগতে পারে ত!

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেইভাবে ব্যবস্থা করবে। ঋত্বিক ত teacher (শিক্ষক), সেই ত শেখাবে—কেমনভাবে কী ভোগ দিতে হয়।

সুরেনদা—দোকান থেকে বিশেষভাবে প্রস্তুত করে যদি আনা হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দোকানেরই সেই জিনিষ ত! তার চেয়ে শুদ্ধাচারে, নিজেদের তত্ত্বাবধানে উপযুক্ত ঠাকুরভোগ তৈরী করা—সেই বা কেমন?

সুরেনদা—নিবেদন করলে ত শুদ্ধ হয়ে গেল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Psychical aspect (মানসিক দিক) material (বাস্তব)কে ignore (উপেক্ষা) করে নয়। ঠাকুরকে নিবেদন করে যদি বিষ্ঠা এনে দেয়, তা যদি তুমি নির্বিকার চিত্তে খেতে পার, তখন বোঝা যায় তোমার অন্তর ভক্তিতে প্লাবিত, তাহ'লে তুমি যে কোন প্রসাদ খেতে পার। তাও সবার পক্ষে প্রযোজ্য নয়।

মন্মথদা—'বৃথা মাংস খেয়ো না' বলে—এই কথার মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—জীবনকে বৃথা ক'রে অর্থাৎ একটা জীবনের চেতন প্রগতি রুদ্ধ ক'রে মাংস খেও না।

নির্ম্মলদা (দাসগুপ্ত)—আমরা যে শাকপাতা খাই, তা'রও ত জীবন আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—চুল কাট কেন? চুল আবার গজায়। শাকপাতাও সহজে গজায়।

প্রফুল্ল—সমবেত প্রার্থনার ক্রম কেমন হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আহবানী, বিনতি, আচমন, পুরুষোত্তমবন্দনা, সমবেত প্রার্থনা অর্থাৎ আর্য্যসন্ধ্যার অবশিষ্ট, গুরু বন্দনা, পঞ্চবর্হি, সপ্তার্চ্চি।

শীতের রাত, অনেকেই চলে গেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর আপন মনে তামাক খাচ্ছেন। এমন সময় শরৎদা (হালদার) ও সুরেনদা (বিশ্বাস) বাইরে যাবার আগে বিদায় নিতে

এসেছেন। তাঁরা প্রণাম করার পর শ্রীশ্রীঠাকুর স্নেহ কোমল কণ্ঠে বললেন—সাবধানে চলাফেরা করা লাগে। শরীর যেন ভাল থাকে।

শরৎদা মাধব নামক একটি ছেলের সম্বন্ধে বললেন—তার চাল-চলন খুব ভাল। বেশ ইষ্টপ্রাণ ও যাজনমুখর। কর্ম্মী হবার মত ছেলে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা মানুষ হ'লে বহু মানুষ এসে জুটবে। আমাদের মধ্যে যে অমানুষত্ব অনেক কিছু আছে। আপনারা যদি ঠিক হন, যতি বলতে যা, তা যদি চরিত্রগত ক'রে তোলেন—কথায়, কাজে, চলায়, তাহ'লে আর ভাবনা নেই। সব জুটে যায়। দুর্ভাগ্য, অভাব, অনটন, যাচনা উড়ে যায়। নিবেদন চ'লে আসে। মানুষ দিয়ে কৃতার্থ হয়। পুরোপুরিটা যদি ধরেন, তবে সবার দুর্ভাগ্য ঘুচে যায়। আপনাদের সান্নিধ্যে এসে, মানুষগুলি দেবতা বনে যায়। ঋত্বিকরা তেমন হ'লে, তাদের প্রত্যেকের কথা, প্রত্যেকের চলন, প্রত্যেকের রকম শতযোজন দূরে থাকলেও একরকম হ'তে থাকে। তার মানে এ নয় যে ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য থাকে না। কথা এই যে প্রত্যেকে ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠা পরায়ণ হ'লে যে যেভাবেই চলুক বলুক না কেন তাদের চলাবলা এক তাৎপর্যবাহী হ'য়ে ওঠে। এটা হ'য়েই যায়। আর তা অস্বাভাবিক কিছু নয়। Self-centricism ( স্বার্থান্ধতা ) যত কেটে যায়, ততই পারস্পরিক ইষ্টার্থী সঙ্গতি বেড়ে ওঠে। এর ভিতর দিয়ে সংহতিও দানা বেঁধে ওঠে। Self–centricism ( আত্মকেন্দ্রিকতা ) বড় বিশ্রী জিনিষ। তা' হ'লো দুর্ভাগ্যের দুহিতা।

একটু থেমে বললেন—যতির ঘরে মেয়েলোক ঢোকা নিষেধ। এক পা এক পা ক'রে ঘরে ( তাঁবুতে ) ঢুকছে। চৌকির পর এসেও বসছে। আমি সব লক্ষ্য করছি। এ সব ভাল নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর কালীদাসদা ( মজুমদার )কে বললেন—কনফারেন্স হ'য়েগেছে সেই কবে। এখনও বহু ঋত্বিক ( কেন্দ্রীয় ) এখানে ব'সে আছে। তাদের বাইরে পাঠান লাগে কাজে। ঋত্বিকী এখনও ভাল ক'রে চালু করলে না। একটা খাতা করা লাগে, তাতে হিসাব রাখা

লাগে, ঋত্বিকী কা'র কতদূর হ'লো। আরো কী ক'রে করা যায় তা'র ব্যবস্থা তোমাদেরই করতে হবে। ঋত্বিকরা যাতে ঋত্বিকীর উপর দাঁড়াতে পারে, সে ব্যবস্থা তোমাদেরই করা লাগবে। তোমরা সবার জন্য ভাববে, করবে। যতিদের বিরাট দায়িত্ব। তোমরাই যে ঢিলে, তোমাদের চলা, বলা করা ভাবা যদি actively co-ordinated ও materialised ( সক্রিয়ভাবে সুসমন্বিত ও বাস্তবায়িত ) না হয়, তবে কি ক'রে কী করবে ?

৬ই মাঘ, বুধবার, ১৩৫৫ ( ইং ১৯।১।৪৯)

পুরুষোত্তম চির-অতন্দ্র। নিরলস ভাবে দিন-রজনী নিরন্তর তিনি সবার প্রাণে অনির্ব্বাণ প্রেরণার হোমানল জ্বালিয়ে চলেছেন। প্রাতে সুধাদি কন্যা সম্বিতাসহ এসে প্রণাম ক'রে গোল তাঁবুর পাশে দাঁড়িয়েছেন। সম্বিতার চোখে-মুখে বুদ্ধির দীপ্তি, চলনে, বলনে, প্রাণোচ্ছলতার প্রাঞ্জল ব্যঞ্জনা। নয়নানন্দ নরোত্তম নারায়ণ আমার পূত শুভশয্যায় উপাধানে ভর দিয়ে দক্ষিণাস্য হ'য়ে সুঠাম ছন্দে সুখাসীন। এইবার কৌতূহলী দৃষ্টিতে সম্বিতার দিকে তাকাতেই সে হর্ষোৎফুল্ল হ'য়ে উঠল। শ্রীশ্রীঠাকুর প্রীতিপূরিত কণ্ঠে বললেন—অনুলোমে বাড়ায় ঝাঁজ—তা'র পরিচয় পাওয়া যায় ওর মধ্যে। একই সঙ্গে মা ও মেয়ের মুখ খুশিতে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল। একটা উদ্দীপনার ছোঁয়া লেগে গেল প্রত্যেকের প্রাণে।

সরোজিনীমা, ননীমা, ব্যোমকেশ ভাই, প্রফুল্ল প্রভৃতি উপস্থিত সবার চোখেমুখে ফুটে উঠল এক গভীর সুখের স্বাক্ষর।

এই ভাবে তাঁর সঙ্গগুণে লহমায় লাভ হয় স্বর্লোকের প্রত্যক্ষ সন্দীপনী স্পর্শ।

"সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়
লব মাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্ব সিদ্ধি হয়।"

সাধুসঙ্গে যদি এই হয় তবে, শ্রদ্ধার সঙ্গে পরমপুরুষের নরলীলা—সন্দর্শনে কিই না জানি হয়! আসুন, আমরা সেই রসস্বরূপের চিন্ময় লীলা-আস্বাদনে সক্রিয়-তন্ময়তায় নিত্যনিরত হ'য়ে থাকি।

সমাধান-মূর্ত্তিকে সামনে পেলে মানুষ মনের সাধে কত প্রশ্নই করে।

ননীমা জিজ্ঞাসা করলেন—ঠাকুর ! মানুষ খাটো-লম্বা হয় কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এর একটা কারণ মাটির দোষগুণ। এক বেগুনের বীজ বিভিন্ন মাটিতে বুনে বিভিন্ন রকম ফল হয়। উপযুক্ত সারও দিতে হয়। মা হ'লো মাটির মত। মা যদি স্বামীগত প্রাণা হয়, নিজের প্রবৃত্তির উপর তার যে নেশা, তা থেকে যদি তার স্বামী-নেশা প্রবলতর হয়, স্বামীকে খুশী করার জন্য নিজের যে কোন খেয়াল যদি সে উপেক্ষা করতে পারে তা হ'লে তার ব্যক্তিত্বের একটা এক-কেন্দ্রিক রূপান্তর হয়। একে বলে সতীত্ব। তা' থেকে তা'র শরীরের ভিতরকার অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি-গুলির ক্ষরণ ঠিকমত হয় এবং সেগুলি আবার সত্তাপোষণী হয়। এইগুলি গর্ভস্থ সন্তানের শরীর মনের ভাবী সুসঙ্গত বিকাশের পক্ষে যে সব সারী উপাদান প্রয়োজন, সেগুলি সরবরাহ করে। এই সব ছেলেমেয়ে মাতৃভক্ত হয়, পিতৃভক্ত হয়, গুরুভক্ত হয়, সংযত হয়, দক্ষ হয়, লোকস্বার্থী হয়, চৌকস হয়। এরা সাধারণতঃ মোটামুটি সুস্থ, সবল ও দীর্ঘায়ুও হয়। অবশ্য যদি পিতামাতা রুগ্ন না হয় এবং তাদের বিবাহ ও যৌনমিলন বিধিমাফিক সংঘটিত হয়।

প্রফুল্ল—স্বামী-স্ত্রীর ইষ্টপ্রাণ হওয়া লাগে না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে মার অমন স্বামীভক্তি হয়, তার ভিতর ঈশ্বরানুরাগ থাকেই। প্রহ্লাদের বাবা কে ছিল ?

প্রফুল্ল—হিরণ্যকশিপু।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে কি প্রহ্লাদের মত হরিভক্তি পরায়ণ ছিল ?

প্রফুল্ল—বরং উল্টো। প্রহ্লাদকে হরিনাম ছাড়াবার জন্য তিনি কী না করেছেন। তাতে অকৃতকার্য্য হ'য়ে রেগে গিয়ে তিনি প্রহ্লাদকে মেরে ফেলবার হুকুম দিলেন। প্রহ্লাদ বিন্দুমাত্র বিচলিত না হ'য় তখনও ক্রমাগত হরিনাম ক'রে চলেছেন। তাঁকে হত্যা করার জন্য বিষপ্রয়োগ, খড়গাঘাত, হাতির পায়ের তলে ফেলা, পাহাড়ের উপর থেকে ছুঁড়ে ফেলা ইত্যাদি কত কী করা হ'লো। কিন্তু ঈশ্বরের কৃপায় কিছুতেই

তাঁর মৃত্যু হ'লো না। বীভৎস অত্যাচারের মধ্যেও তিনি নামময় হ'য়ে আছেন অদ্ভুতভাবে। তখন হিরণ্যকশিপু তাঁকে হরির আবাসস্থল সম্বন্ধে প্রশ্নকরেন। প্রহ্লাদ বলেন হরি সর্ব্বত্রই বিরাজমান। তাঁর দয়াতেই সব কিছু সৃষ্ট হয়েছে এবং সব কিছুতেই তিনি আছেন। নিকটস্থ একটা পাথরের স্তম্ভ দেখিয় হিরণ্যকশিপু তখন জিজ্ঞাসা করেন—এর মধ্যেয়ও কি হরি আছে? প্রহ্লাদ বলেন—"অবশ্যই আছেন। এমন কিছু নেই, যার মধ্যে হরির অস্তিত্ব নেই"। হিরণ্যকশিপু সেই কথা শুনে ক্রোধে উন্মত্ত হ'য়ে দারুণ জোরে সেই স্তম্ভে পদাঘাত করেন। স্তম্ভ ভেঙ্গে যায় এবং তার ভিতর থেকে নৃসিংহমুর্ত্তি বের হ'য়ে হিরণ্যকশিপুকে নিজ উরুর উপর রেখে নখর দিয়ে তার পেট চিরে ফেলেন। ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ে নরসিংহ অবতারের আবির্ভাব ও হিরণ্যকশিপু নিধন সম্বন্ধে অপূর্ব্ব বর্ণনা আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে ত হ'লো, প্রহ্লাদের মা কে ও কেমন ছিল। তা' ত বললি না।

প্রফুল্ল—প্রহ্লাদের মা ছিলেন কয়াধু। তিনি যখন পরিপূর্ণা গর্ভবতী ছিলেন সেই সময় ইন্দ্র তাঁকে বন্দী করেন। তখন নারদ তাঁকে রক্ষা করেন। শুধু উদ্ধার করা নয়, তিনি নিজ আশ্রমে তাঁকে আশ্রয় দেন। কয়াধু তখন ঋষিবরের প্রতি কৃতজ্ঞতাবশতঃ তাঁকে ভক্তি ভরে সেবা করেন। নারদ সন্তুষ্ট হ'য়ে তাকে অনেক হরিকথা শোনান। প্রহ্লাদের বিষয় শোনা যায় যে মাতৃগর্ভে থাকাকালীন নারদ তাঁর মাকে যে হরিকথা, ভক্তিতত্ত্ব ও আত্মজ্ঞানবিষয়ক বাণী বলেন, সেগুলি তাঁর (প্রহ্লাদের) স্মৃতিতে সম্যক জাগ্রত থাকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লে ভেবে দেখ, কয়াধুর সৎসংঙ্গ ও সাধুসেবা প্রহ্লাদের চরিত্রকে কি ভাবে প্রভাবিত করেছিল। আর আমার মনে হয় কয়াধুর হিরণ্যকশিপুর উপর গভীর শ্রদ্ধা ছিল। হিরণ্যকশিপুও ত শুনি শক্তিধর তপস্বী ছিল, ব্রহ্মা তার তপস্যায় তুষ্ট হ'য়ে তাকে দর্শন দিয়েছিলেন। ব্রহ্মার বরে অসাধারণ শক্তির অধিকারী হয়ে সে

ত্রিভুবনের অধিপতি হয় কিন্তু পরে প্রবৃত্তির প্ররোচনায় নানা অপকর্ম্ম সুরু ক'রে দেওয়ায় এবং বিষ্ণুর প্রতিদ্বন্দ্বী হ'য়ে দাঁড়াবার ফলে ঐ ভাবে তাঁর বিনাশ হয়েছিল। মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণ ও কামনার sublimation (উদগতি) বা transformation (রূপান্তর) না হওয়া পর্য্যন্ত কোন সিদ্ধির কোন দাম নেই। যা হোক আমার প্রধান কথা এই যে মেয়েরা সতী সাধ্বী হ'লে, ভক্তিমতী হ'লে, সুসন্তানের আবির্ভাব সহজ হ'য়ে ওঠে। আমার এই কথায় মনে করো না, যে তোমরা যারা পুরুষ তাদের এই ব্যাপারে কোন দায়িত্ব নেই। তোমাদের চলন, চরিত্র এমন হওয়া লাগে, যাতে মেয়েরা তোমাদের সেবা পূজা ক'রে নিজেদের ধন্য মনে করে।

একটু পরে মতিদা (চ্যাটার্জ্জী) বললেন—একজন লিখেছে তার দীক্ষা নেবার ইচ্ছা হয়। আবার তা উবে যায়। এমতাবস্থায় সে কী করবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের সদ্‌বুদ্ধি লহমার তরে আসে। তাই যখনই সেটা আসে, তখনই তার সুযোগ গ্রহণ করা ও তদনুযায়ী কাজ করা সর্ব্বতোভাবে মঙ্গলজনক। অসৎবুদ্ধির বেলায় তখনই তার দ্বারা প্রভাবিত বা পরিচালিত না হ'য়ে বরং তার ফলাফল খুঁটিয়ে বিচার বিবেচনা করা ভাল। তাই বলে, 'শুভস্য শীঘ্রম্, অশুভস্য কালহরণম্।' আমার রসগোল্লার লোভ ছাড়বার সময় বুঝলাম প্রবৃত্তির ঝোঁকটা যখন আসে তখনই Profitably otherwise engaged (লাভজনকভাবে অন্যথা ব্যাপৃত) হয়ে পড়লে কিছু সময়ের মধ্যে কেমন ভাবে তা কর্পূরের মত উবে যায়। তুকটা হাতে পেয়ে গেলাম। কায়িক শ্রমসাধ্য কোন কাজে লেগে যেতে হয় আর তদনুকূল বাক্য, ব্যবহার ও চিন্তায় নিজেকে নিয়োজিত করতে হয়। এতে এর ফলে, দেখতে না দেখতে প্রবৃত্তির সম্বেগ তখনকার মত কাবু হ'য়ে যায়। যে কোন প্রবৃত্তির অবাঞ্ছনীয় আবেগ যখনই আসুক না কেন, তখনই এইভাবে তা পরিহার করতে

হয়। একে বলে প্রত্যাহার। অনেকে বিষাদ রোগে ভোগে ও গাদা গাদা ওষুধ খায়। তা না ক'রে জোর ক'রেও এই তুকটা যদি প্রয়োগ করে, তা হ'লে নিজেকে নিজে সারিয়ে তুলতে পারে। অবশ্য স্নায়ুর পোষণদায়ক ওষুধ ও খাদ্য খাওয়া লাগে। যেখানে রোগীর ইচ্ছাশক্তি দুর্ব্বল হ'য়ে পড়ে, সেখানে তার হিতাকাঙ্ক্ষীদের উচিত এমনতর ব্যবস্থা করা যাতে তার মন প্রফুল্ল থাকে এবং প্রীতিকর কাজে ব্যাপৃত থেকে সে বিষাদ ও অবসাদ এড়িয়ে চলতে পারে। সে যাতে নিজের রোগের কথা বিলকুল ভুলে যায়, এমনভাবে তাকে স্ফূর্ত্তিতে মাতিয়ে রাখতে হয়। আশা, উৎসাহ ও উদ্দীপনার কথা বলতে হয়। কত পাগলকে আমি এরই রকমফের ক'রে সারিয়ে তুলেছি। যোগেন সেনের ছিল কঠিন satyriasis ( কামোন্মাদনা ) রোগ। কাছে রেখে কত কায়দা ক'রে তাকে প্রায় সুস্থ ক'রে তুলেছিলাম। গিরীন্দ্র শেখর বসু নাকি সেই কথা শুনে অবাক। শুনেছি বলেছিল—ঠাকুর, ত দেখছি একজন Super-Freud ( ফ্রয়েডের চাইতে উঁচুদরের মনস্তাত্ত্বিক )।

সবাই মুগ্ধ বিস্ময়ে শুনছেন তাঁর শ্রীমুখের অমৃত কথন।

শ্রীশ্রীঠাকুর একটু থেমে মতিদার দিকে তাকিয়ে ফিক ক'রে হেসে বললেন—আপনি যেন চিঠির উত্তর দিতে যেয়ে এই গাজীর পট আমদানি ক'রে না বসেন। সবাই হাসতে লাগলেন।

আগে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের কয়েকজন চলে গেলেন। পরে মন্মথদা ( দে ), যোগেনদা ( হালদার ), দক্ষিণাদা ( সেনগুপ্ত ) প্রভৃতি আসলেন। মন্মথদাকে লক্ষ্য ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ জাতিস্মরের প্রসঙ্গ উঠালেন। দুই একজন জাতিস্মরের কাহিনী ও বললেন এবং সেই সঙ্গে বললেন—এটা একটা evidence ( প্রমাণ ) যে জাতিস্মর হওয়া যায়। কিন্তু জাতিস্মরত্ব যত সময় concrete shape এ ( বাস্তব আকারে ) না আসে—আমিও বুঝি, আপনিও বোঝেন, সেও বোঝে, এমনতর না হয় তত সময় নিস্তার নেই। আমি হয়ত মারা গেলাম, আমার সত্তা থাকলো, কেউ স্বপ্ন দেখলো, কেউ ভূত দেখলো। কিন্তু তাঁর যদি একটা যথাযথ

নিদর্শন না পাওয়া যায় এবং পূর্ব্বাপর স্মৃতি যদি না থাকে এবং পরস্পর যদি বুঝতে না পারে তবে কী হ'লো ? জাতিস্মরত্বটা যদি হয় মানুষের innate normal nature ( অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক প্রকৃতি ), জীবন্ত জীবনের মত সেই পর্য্যায়ের সবকিছু বাস্তব হয়, তখন কা'রও মৃত্যুতে শোকের কারণ থাকে না। গীতায় পুরোন কাপড় ছেড়ে নতুন কাপড় পরার কথা আছে, ঠিক তেমনি। আমিই ছাড়ছি। আমিই পরছি, এমনতর স্মৃতিবাহী চেতনা যদি এর সঙ্গে জন্মের পর জন্ম ধরে জড়ান থাকে, তবে ত মৃত্যুকে অনেকখানি জয় করা হ'লো। কিন্তু কেবল আমি জানলে হবে না। আমি বোধ করলাম, জানলাম, আর কেউ তা জানলো না, বুঝলো না, স্বীকার করলো না; তা'তে আমি সন্তুষ্ট হ'তে পারি না, সন্দেহমুক্ত হ'তে পারি না। আমি জানলাম আপনিও জানলেন। হয়ত দেখা হ'য়ে গল্প করছি—কী মন্মথদা ! কী খবর ! অমুক কেমন আছে ? তমুক কেমন আছে। বরিশাল থেকে আপনি এসেছেন, সেখানকার কথা আপনার কাছে জিজ্ঞাসা করলে, স্বাভাবিক স্মৃতি থেকে যেমন সহজভাবে বলেন বাস্তবতার উপর দাঁড়িয়ে, স্মৃতিবাহী চেতনা যদি এতখানি সহজ হয় তবেই ত হয়। তা' না হলে কোন ফয়দা নেই। সাধারণতঃ শান্তির জন্য ধর্ম্ম টর্ম্ম করি। শান্তি জিনিষটা আর এ জিনিষটা কিন্তু এক নয়। শান্তি মানে দুঃখবিদ্ধ হব না তা' নয়, সুখ দুঃখের বোধ নিয়েও balanced (সাম্যাবস্থায়) থাকব। একটা জীবনের দিনগুলি স্বচ্ছন্দে বেঁচে থাকার পক্ষে এটা ভাল। ও জিনিষটা আর এ জিনিষটা এক নয়। স্মৃতিবাহী চেতনায় কিছুটা অশান্তিও থাকতে পারে, কিন্তু তবু হ'লো তা অমৃতত্ব অর্থাৎ অনন্তজীবন। অবিচ্ছিন্ন চেতনা নিয়ে পরমপিতার সেবায় নিরন্তর ব্যাপৃত থাকাই পরমলাভ একেই বলে অমরত্বলাভ। এমনতর জীবনে ছেদ নেই, ক্ষয় নেই, ভয় নেই, খতম হ'য়ে যাওয়া নেই। একেই ত বলে অন্তহীন আত্মিক-লীলা। পরমপিতার উপভোগ্য হয়ে তাঁরই প্রদত্ত সত্তাটাকে অফুরন্তভাবে উপভোগ করা। তবেই সব দুঃখের সব সুখের একটা সার্থকতা হয়। আর প্রিয়পরমই হলেন সেই সার্থকতার প্রাণকেন্দ্র।

আর তাই ওকালতি করি, ব্যবসা করি, চুরি করি, ধাউড়ামি করি, পয়সা উপায় করি বাঁচার জন্য। অল্প কটা দিনের আত্মস্বার্থের জন্য যতদিন বাঁচি, ততদিন বাঁচাটার কোন চিরন্তন তাৎপর্য্য খুঁজে পাই না। তাই ইষ্টসেবা-স্বার্থী অবিনশ্বর স্মৃতিবাহী চেতনার পথে যদি অগ্রসর না হই, তবে লাভ কতটুকু?

যোগেনদা—স্মৃতিবাহী চেতনায় পুঞ্জীভূত দুঃখও বেড়ে যেতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কী কারণে দুঃখ পাই, তাই যদি ভাল ক'রে বুঝি, দুঃখের কাম আবার করি না। সাপের কামড় খেলে সাপকে কি হাত দিয়ে ধরতে যাই? স্মৃতিবাহী চেতনা থাকলে আমাদের জ্ঞানও বাড়ে। সেই জ্ঞানের আলোকে কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ, কিসের ফল কী তাও হিসাব করে চলতে পারি।

রাত্রে শ্রীশ্রীঠাকুর গোল তাঁবুতে ভক্তবৃন্দ পরিবেষ্টিত হ'য়ে দক্ষিণ দিকে মুখ ক'রে একখানি কাঁথা গায় জড়িয়ে উপবেষ্টিত।

প্রফুল্ল—প্রাণহীন জিনিষেরও কি চেতনা আছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, চেতনা সব কিছুর মধ্যেই আছে, আপেক্ষিক কম বেশী। একটা কাঠের খুঁটিতে যখন ঝড় লাগে, তখন তাঁর কষ্ট নিজের শরীরে বোধ করা যায়।

মন্মথদা (দে)—এই কাঠটার চেতনা আছে, জীবন আছে তা' বুঝব কি ক'রে? কাঠ হিসাবে অস্তিত্ব আছে ব'লে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ! তা'ও বটে। আবার disintegrate করে (বিশ্লিষ্ট হয়) তা' দেখেও বোঝা যায়। মাঝে-মাঝে মনে হয় আমার অস্তিত্বের বাইরে কোথাও কিছু নেই। পঞ্চভুত থেকে সুরু করে ছায়া-পথ পর্য্যন্ত সবই এই অঙ্গীভূত (নিজ দেহের দিকে চেয়ে বললেন)। মনটা একটু নীচেয় নামিয়ে না রাখলে টেকাই কঠিন। তখন নির্বিকল্প ভূমি যেন গ্রাস করতে চায়। জোর ক'রে ঠেকিয়ে রাখতে হয়।

শচীনদা (গাঙ্গুলী)—অসম্ভব ব্যাপার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অশৈলী কাণ্ড! তাই কইতে হয় অবাঙমনসোগোচরম্ বোঝে প্রাণ বোঝে যার।

৭ই মাঘ, বৃহস্পতিবার, ১৩৫৫ (ইং ২০।১।৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে গোল তাঁবুতে রোদে তক্তপোষে শ্রীচরণযুগল পূর্ব্বদিকে স্থাপন ক'রে তাকিয়ায় ভর দিয়ে নয়ন মোহন ভঙ্গীতে অর্দ্ধশায়িত। বাইরে হাউজারম্যানদা, হেনরি, কালিদাসদা (মজুমদার) সহায়রামদা (নাথ) এবং মায়েদের মধ্যে অনেকে দাঁড়িয়ে। ২৪ পরগনার একটি দুরন্ত অবাধ্য বালক তার নিজের উচ্ছৃঙ্খল চলনের কথা অকপটে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে নিবেদন ক'রে বলল, আমার বেপরোয়া খেয়ালী চলনের জন্য উদ্বেগের দরুন মা খুব অসুস্থ হ'য়ে পড়েছেন, সর্ব্বদা মনমরা হ'য়ে থাকেন, কোন ওষুধে কাজ হচ্ছে না। এখন আপনার কাছে যদি নিয়ে আসি কেমন হয়? মার অসুখের জন্য আমার কিছুই ভাল লাগে না। কী করব বলুন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সস্নেহে বললেন—এই বার তোমার মা ভাল হ'য়ে উঠবে। তুমি যখন বুঝতে পেরেছ যে তোমার মার শরীর খারাপ তোমার বেচাল চলনের জন্য তখন তুমিই তাঁকে সুস্থ করে তুলতে পারবে। তুমি যত ভাল হ'য়ে চলবে, তোমার মাও তত ভাল থাকবে। তোমার যখন মা-বাবার উপর টান আছে, তখন আর ভাবনা কী? মা-বাপের পর যত ভক্তি বাড়বে তোমার, তাদের যত সুখে রাখতে পারবে, তাতে ভাল হবে তোমারও।

কথা প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—হিন্দুদের বেশীর ভাগ ঐতিহ্যই খুব বিজ্ঞানসম্মত। না জেনে বুঝে আমরা অনেক কিছুকেই কুসংস্কার ব'লে উড়িয়ে দিই। তা কিন্তু মোটেই ঠিক নয়। বিবাহিত মেয়েদের লোহা, শাঁখা, সিন্দুর পরার প্রথা সম্বন্ধে কথা উঠতে তিনি নিম্নলিখিত ছড়াটি বললেন বেলা সাতটা পঞ্চাশ মিনিটে।

লোহায় পুষ্ট রক্তকণা
শাঁখায় পোষে হাড়
সিন্দুরেতে শোভা বাড়ায়
বন্ধ্যার প্রতিকার।

ছড়াটি বলার পর বললেন—আমার এমনতর মনে হয়। তবে আহার-বিহার, পোষাক-পরিচ্ছদ, প্রথা-আচার, ইত্যাদি জীবনীয় প্রত্যেক ব্যাপারে এমনভাবে বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালাতে হয়, যাতে বাঁচার পথ প্রশস্ত হ'তে থাকে এবং মরণের পথ সঙ্কীর্ণ হ'য়ে আসে। এটা ধর্ম্ম ও কৃষ্টিরই অপরিহার্য্য অঙ্গ। তবে এর মধ্যে কিছু কিছু আছে সার্ব্বজনীন আর কিছু কিছু আছে দেশকাল পাত্র সম্মত। এইটে না বুঝে একই ব্যবস্থা সবার উপর চাপাতে যাওয়া ঠিক নয়। এর পর শ্রীশ্রীঠাকুর প্রফুল্লকে নিম্নলিখিত দুখানি চিঠির শ্রুতলিখন দিলেন।

কল্যাণীয়াসু,

খুকী,

তোমার পত্র পেয়ে সুখী হলাম। তোমরা যে কদিন ছিলে, আমার খুব ভাল লাগত। তোমরাও গেলে এদিকে প্রমথদার আকস্মিক মৃত্যু! মনটা যেন বিকল হয়ে আছে। উপর্য্যুপরি রোগ, শোক, আঘাত, আতঙ্ক, দুশ্চিন্তা, দুর্ঘটনা এই যেন নিত্যকার সম্বল হ'য়ে দাঁড়ালো।

এর ভিতর দিয়ে মাথা খাড়া ক'রে সোজা হ'য়ে সুস্থ শরীরে কবে দাঁড়াতে পারব—জানি না। যা হোক খেপুর শরীর কেমন জানাবে। তার হাঁপের টান আর হয় না ত?

শান্তু, কানু, অর্চ্চনা, তোতা মঞ্জু ভাল আছে ত? মাসিমা কেমন? তুমি কেমন আছ? সাবধানে থেকো। সময়মত সবাই যাতে টিকা নেয় সে ব্যবস্থা ক'রো।

আমার স্নেহষ্যন্দিত 'রাধাস্বামী' জেনো—যারা চায় তাদের দিও।

ইতি
তোমাদেরই
দীন
দাদা

শ্রীশ্রীঠাকুরের নিজস্ব প্যাডে চিঠিখানি লেখা হয়।

'ইতি
তোমাদেরই
দীন
দাদা'—কথাগুলি শ্রীহস্তে স্বাক্ষর করেন।

কল্যাণীয়াসু,

মা অর্চ্চনা,

তোমার চিঠি পেয়ে খুশী হলাম। অশান্তির জীবনে তোমাদের স্নেহপ্রীতির স্পর্শে যেন অনেকখানি সঞ্জীবিত হ'য়ে উঠি।

তোমার বাবা কেমন আছেন ? তাঁর শরীরের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রেখো।

মনটা যাতে খুশী থাকে নজর দিও। যতটা পার।

তা'তে করে তৃপ্ত হবে। নন্দিত হবে।

পিসিমাসহ ভাল আছ ত ?

তোমরা আমার স্নেহমাখা 'রাস্বা' জানবে।

ইতি
তোমাদেরই
দীন
জ্যাঠামহাশয়

শেষের কথাগুলি নিজহস্তে স্বাক্ষর করেন। চিঠির কাগজগুলি যেমনভাবে ভাঁজ করা হচ্ছিল, তা তাঁর মনোমত না হওয়ায় নিজে চেয়ে স্বহস্তে সুঠামভাবে ভাঁজ করে দিলেন। বললেন—প্রত্যেকটা কাজ সুন্দর ও সুশৃঙ্খল ভাবে করতে করতে বোধ ও চরিত্রও সুচারু ও স্বচ্ছ হ'য়ে ওঠে। নিরন্তর এই ভাবে চলাটা করাটাই পূজা। তাতে সত্তারূপী পরমপিতা প্রীত হন। সুষ্ঠু, সুন্দর ও সুনিপুণভাবে প্রত্যেকটি চলা, বলা, করা ও ভাবার ভিতর দিয়ে পরমপিতাকে প্রীত করাই আমাদের জীবনতপ।

রাত্রে শ্রীশ্রীঠাকুর গোল তাঁবুতে বিছানায় উত্তরাস্য হ'য়ে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে আছেন। হাউজারম্যানদা, শচীনদা ( গাঙ্গুলী ), মেণ্টুভাই (বসু), পরেশভাই (ভোরা), ননীমা, সরোজিনীমা, সুমতিমা, রেণুমা, রাণীমা, সেবাদি প্রভৃতি আছেন।

হাউজারম্যানদা জিজ্ঞাসা করলেন—দূরে বসে যারা দীক্ষা নেয় তাদের অনেকে বলে, তোমরা যে Living Ideal ( জীবন্ত আদর্শ )এর কথা বল তাঁকে আমরা এখানে এখন পাচ্ছি কোথায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে ঋত্বিক তাঁকে দেখেছে, যে তাঁর অনুজ্ঞাপ্রাপ্ত যে ইষ্টানুরাগী ও সাধনশীল তা'র ভিতর তাঁর living impression (জীবন্ত ছাপ) কিছু না কিছু থাকে। দীক্ষা পেয়ে যা করণীয় তা য়দি সে নিষ্ঠার সঙ্গে করে তবে সে অজ্ঞাতসারে ইষ্টের উপস্থিতি ভিতরে কিছু কিছু বোধ করতে থাকে। আর নবদীক্ষিতকে যথাসত্বর এখানে আসতে বলতে হয়।

প্রফুল্ল—এখন যাঁরা চৈতন্যদেব প্রবর্ত্তিত দীক্ষা দেন, তাঁরা এবং তাঁদের গুরুরাও মহাপ্রভুকে দেখেন নি। তাতে দীক্ষিতরা কতটুকু লাভবান হন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—গুরুভক্তির সূত্রের ভিতর দিয়ে মূলশক্তি বিধি অনুযায়ী ক্রিয়া ক'রে চলে যেখানে যখন যতখানি সম্ভব। তবে প্রত্যেক সাধকেরই উচিত যুগ পুরুষোত্তমের সন্ধানে রত থাকা।

৮ই মাঘ, শুক্রবার, ১৩৫৫ (ইং ২১।১।৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে গোল তাঁবুতে দক্ষিণাস্য হয়ে অমল ধবল দুগ্ধ ফেননিভ কোমল শুভ্র শয্যায় বসে কেষ্টদার সঙ্গে উদ্দীপ্ত ভঙ্গীতে আলোচনারত।

শ্রীশ্রীঠাকুর উদাত্ত কণ্ঠে বলছেন, ইষ্টানুরাগে প্রবুদ্ধ হয়ে মানুষের জন্য আত্মবোধে না করলে অন্তর্নিহিত প্রাণপ্রস্রবণ স্বতঃ-উৎসারিত ধারায় প্রবাহিত হওয়ার প্রেরণা পায় না, কেমন যেন নিরুদ্ধ হয়ে থাকে, তাই ব্যবহারের মধ্যে নিষ্প্রাণ কৃত্রিমতা'র অভিব্যক্তি দেখা দেয়। এমনতর যারা, তারা যতই কেতাদুরস্ত হোক না কেন, তাদের কাছে গিয়ে মানুষ উল্লসিত হয় কমই। নিজেরই স্বার্থবোধে মানুষের জন্য করা, আর তথাকথিত করণীয় বোধে করায় ঢেরতফাৎ। ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠাপন্ন হয়ে অন্যেরটা নিজের মত করে বোধ করে তার অভাব অসুবিধার নিরাকরণে প্রবৃত্ত হলে সেটা ইষ্টানুগ concentric (সুকেন্দ্রিক) হয়ে ওঠে। তাতে শুধু প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। ঐ attitude এ (মনোভাব নিয়ে)

যে করে তার আত্মিক বিকাশ হয়। আবার তার সান্নিধ্যে যারা আসে তাদেরও আত্মিক বিকাশের সহায়তা হয়। সক্রিয় ঈশ্বরকেন্দ্রিক ভালবাসা ও সেবার জোয়ার লেগে যায়। ঐ রকম হলে প্রত্যেকটি সৎসঙ্গীই সব দিক দিয়ে বেড়ে উঠতো। কার কিসে ভাল হয় সেইটেই প্রত্যেকের interest ( স্বার্থ ) হয়ে দাঁড়াত। কিশোরী গোঁসাইওরা ঐরকম করতো। ঐভাবে আবার একটু adjust ( নিয়ন্ত্রণ ) করেনিতে পারলে নূতন রাজ্য সৃষ্টি হয়ে যায়। মানুষ বুঝবের পারে শিবচক্কোবর্ত্তীর ছাওয়াল সৎসঙ্গের মধ্য দিয়ে দুনিয়াটাকে কী করে তুলতে চায়। কত কথা মনে পড়ে। আগে কারও অসুখ হলে রোগী লোকের প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে অস্থির হয়ে উঠতো, নোটিশ দেওয়া লাগত—রোগীর কাছে ভির করবেন না। পরস্পরের জন্য কী বোধ, সে যেন একটা heaven ( স্বর্গ )।

কারও কাপড় ময়লা হলে ঘর থেকে নিয়ে কে কোন্ ফাঁকে যে তা কেচে দিত তা ঠিকই পাওয়া যেত না। টিন, সোডা, পয়সা কোথা থেকে যে জোগাড় হত তারও ঠিক ছিল না। যার কাপড় সে কিছু টের পেত না। খেয়ে উঠে নিজের বাসন নিজে ধোয়াই মুশকিল ছিল,—একে অপরের হাত থেকে টেনে নিয়ে যেত। নিঃস্বার্থভাবে সেবা দেবার সে কী আগ্রহ! ইঞ্জিনের জন্য জল আনা লাগবে, লহমায় দু'শ বালতি জল এসে গেল। ইটকাটার সময় পাঁজা সাজাতে হবে। খরচই লাগত না। নিজেরাই সব করত। কেউ কোথাও বাইরে গেল। কুড়িটা লাউ নিয়ে এসে হাজির হল। সে এক আলাদা যুগ ছিল।

কেষ্টদা—Family ( পরিবার ) হয়েই অসুবিধা হয়েছে। অনেকে বলে family ( পরিবার ) কে ভালভাবে না দেখলে তাদের প্রতি injustice ( অবিচার ) করা হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনার family ( পরিবার ) ছিল না? পিছটান কি আপনাকে আটকাতে পেরেছে? যারা ঐ ধরনে চলছে না তারাই

পরিবারের প্রতি injustice ( অবিচার ) করছে সব চাইতে বেশি। আপনার কাছে আমি prominent ( প্রধান ) বলে, পণ্ডিতের মা, পণ্ডিত, সুধা, আপনার ছেলেমেয়েদের কাছে আপনি এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আমি মুখ্য হয়ে উঠছি। তাই দেখেন এদের বুঝই আলাদা। এতেই হয় উন্নতির উন্মোচনা। অধোগামী মায়াঘোরে সংসক্ত হয়ে সংসারের পিছনে ছুটলে সংসারের উপকার না করে অপকার করা হয়।

কেষ্টদা—আগে আপনার শরীর অনেক পটু ছিল। নিজে অনেক খাটতে ও খাটাতে পারতেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অসুবিধা হয়েছে ওখানে।

প্রবোধদা ( মিত্র )—Common kitchen ( একত্র খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা ) করলে কেমন হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বললেন—এখনই মোড় ফিরিয়ে দিলে লহমায় কী কাণ্ড ঘটে যায়। ধরুন আমি এখানে বসেই ৪৫০ জন কৃষ্টিবান্ধব করিয়েছি। বাইরে হয়েছে মাত্র ১৫০। অথচ আপনারা এক লাখ লোক রয়েছেন।

এরপর কেষ্টদা তখনকার মত বিদায় নিলেন।

শচীনদা ( গাঙ্গুলী ), চুনীদা ( রায় চৌধুরী ), বীরেনদা ( পণ্ডা ) প্রভৃতি আছেন। রমেশদা ( চক্রবর্ত্তী ) এসে বললেন—ঠাকুর ! আমার এক শিশি কুমারেশ দরকার।

শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্যে উৎসাহজনক ভঙ্গীতে বললেন—যোগাড় করে নিতে হয়।

প্রফুল্ল—আমরা শ্রমস্বীকারে পরাঙমুখ কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তমোভাবের প্রাবল্যের দরুন করার বুদ্ধি নেই ? করা নেই ত ? না করলে কর্মপ্রাণতা জাগে না। করা লাগে। শচীনদা তোমার বাড়ি এসে তোমার সেবায় যদি more than at home feel ( নিজ বাড়ির থেকেও বেশি আপন বলে বোধ ) করে, তবে তোমাকে বাঁচিয়ে রাখাই শচীনদার interest ( স্বার্থ ) হয়। আপনা থেকেই

তোমার জন্য করে। কিন্তু করা নাই কিছু, সেবা নাই, মমতা নেই, ধর্ম্মের গদা নিয়ে, নীতির গদা নিয়ে, সদম্ভে সিপাহীগিরি করে বেড়ালে যা হয়, তা হয়। আর সেবা যদি কর, করবে ইষ্ট-স্বার্থ প্রতিষ্ঠা-পরায়ণ হয়ে, তা যদি না কর, কার কাছ থেকে কতখানি বাগাতে পার সেই বুদ্ধি নিয়ে যদি কর, তাতে কি হবে?

শচীনদা—সে করাতেও ধরা যায় কোন্‌টা কী।

শ্রীশ্রীঠাকুর—( হাসতে হাসতে ) একেবারে।

শচীনদা—ইষ্টপ্রাণতা যার যত জীবন্ত, তার সেবা বোধ হয় তত প্রাণস্পর্শী হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইষ্টস্বার্থ প্রতিষ্ঠাপরায়ণ যে, সে কিন্তু আবার ইষ্টের কোন কিছু নষ্ট হতে দেয় না। তার বিদ্যে বুদ্ধিতে যতদূর কুলোয় রক্ষা করতে প্রাণপণ চেষ্টা করে।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর পাগলুদাকে ( ভ্রাতুষ্পুত্র ) লেখার জন্য একখানি চিঠির বয়ান বললেন—

কল্যাণবরেষু,

পাগলু!

তোমার চিঠি কদিন আগে পেয়েছি। তোমার চিঠির উত্তর দেব এমন সময় এক মহাদুর্দ্দৈবের অকস্মাৎ আবির্ভাবে আমাদের সকলকে বিমূঢ় হতচেতন করে রেখে গেল।

গত ১০ই জানুয়ারি প্রমথদা হঠাৎ আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। মাত্র কয়েকদিন জ্বর এবং রক্তবমনের পরই এই কাণ্ড ঘটে গেল।

আঘাতের পর আঘাত আমাকে ক্ষতবিক্ষত করে তুলছে। কিছুতেই সুস্থ সবল হয়ে উঠতে পারছি না। তোমরা কাছে থাকলে হয়ত বা ভর করে দাঁড়াতে পারতাম।

যাহোক সেখানেই থাক, সুস্থ থাক, সুখে সুদীর্ঘজীবী হয়ে তাঁকে উপভোগ কর। তাঁকে পরিবেষণ করে পারিপার্শ্বিকে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠ স্ববৈশিষ্ট্যে,—তাতেই আমার আনন্দ।

তোমার application এর ফলাফল কী হয় আমাকে জানিও। শিক্ষাটা আমার অতি প্রিয় জিনিস। তাই higher and better training এর প্রতি তোমাদের আগ্রহ দেখলে ভাল লাগে।

Conference-এর সময় খেপু, খুকী, শান্তু ও অর্চ্চনা এখানে এসেছিল।

শরীরের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রেখে চলো। বিদেশে সাবধানে থেকো। এমনভাবে চলতে চেষ্টা করা ভাল যাতে সকলের শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করা যায়।

তুমি আমার স্নেহস্যন্দিত 'রাধাস্বামী' জানবে।

ইতি
তোমাদেরই
দীন
জ্যাঠামহাশয়

( শ্রীশ্রীঠাকুরের স্বহস্ত-স্বাক্ষরিত )

পুঃ—স্বাস্থ্যের জন্য inoculation যা নিতে হয় সময়মত নিও, যা উপযোগী তোমার পক্ষে।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর মাঠে ইজিচেয়ারে বসেছিলেন। সামনে মন্মথদা ( দে ), সুধীরদা ( বসু ), রাজেনদা ( মজুমদার ), গোপেনদা ( রায় ) প্রভৃতি এবং মায়েদের মধ্যে অনেকে উপস্থিত ছিলেন। একে মাঘ মাসের শীত, তার উপর শ্রীশ্রীঠাকুরের দাঁতে ব্যথা বেশ বেড়েছে।

প্যারীদা—ঠাকুর ! এই ঠাণ্ডার মধ্যে বাইরে বসলে দাঁতের ব্যথা আরো বাড়বে। তাই এখন ওঠা ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা ঠিক। তবে জমাটি আড্ডার মৌতাত ভেঙ্গে যাবি নি। যা হোক এক ছিলুম তামুক দে, খেয়ে উঠি।

প্যারীদা তামাক সেজে দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর গড়গড়ার নল টানতে টানতে বললেন— আমেজ করে যে একটু তামুক খাব দাঁতের চোটে সে উপায় নেই।

ইতিমধ্যে মন্মথদা গল্পচ্ছলে একজন সাধারণ মানুষের চারিত্রিক গুণপনা ও শ্রীবৃদ্ধির কথা বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের চরিত্রসম্পদ থাকলে বাহ্যিক সম্পদ আপনা-আপনি আসে।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর গোল তাঁবুতে এসে একটা বাণী দিলেন—

ভগবানের জন্য মরা সহজ,
কিন্তু ভগবানের জন্য
যে বাঁচতে পারে,
সেই সাবাস।

মন্মথদা—ভগবানের জন্য প্রাণ বিসর্জন দেওয়া কি সহজ কথা? তাঁর জন্য বাঁচাই ত বরং সহজ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাহবার লোভে বা ঝোঁকের মাথায় কোন একটা মহৎ আদর্শের জন্য মৃত্যুবরণ সৎসাহস বা আত্মত্যাগের একটা ঐতিহাসিক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হতে পারে, কিন্তু লহমার পর লহমা একটা গোটা জীবনের সবখানি ব্যক্তিগত প্রবৃত্তি, খেয়াল, বাসনা, কামনা, অর্থ, স্বার্থ, প্রভুত্বস্পৃহা, সংসারের শত প্রলোভন এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার আকর্ষণ উপেক্ষা করে নীরবে ঈশ্বরপরায়ণ হয়ে তৎসুখ সুখিত্বের জন্য তাঁরই ইচ্ছাপূরণার্থে সক্রিয়ভাবে বেঁচে থাকা একজন জীবন্মুক্ত মহাপুরুষের পক্ষেই সম্ভব। ভগবানের জন্য বাঁচা বলতে আমি বুঝি এতখানি। এই রকম কয়েকটা লোক আমাকে দেন। দেখেন তাদের প্রভাবে বসুন্ধরা ধন্য হয়ে যাবে। সুর করে হাত নেড়ে গাইলেন—

'মাটিতে চাঁদের উদয়, কে দেখবি আয়
তোরা কে দেখবি আয়।'

সবাই এখন নির্বাক ও ভাবমোহিত। তাঁর চোখে মুখে দিব্যলোকের লীলালাবণ্য।

৯ই মাঘ, শনিবার, ১৩৫৫ (ইং ২২।১।৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে গোল তাঁবুতে উপবিষ্ট। তাঁর দাঁতের ব্যথা আজও কমে নি। ডাক্তারী ওষুধ, টোটকা সব একসঙ্গে চলছে। কিন্তু ব্যথার উপশম হচ্ছে না। তাই, থেকে থেকে কাতর ভাবে কোঁকাচ্ছেন। এমন সময় মন্মথদা (ব্যানার্জ্জী), তপতীদা (মুখোপাধ্যায়) ও সুশীলদা

( বসু ) প্রভৃতি কলকাতা থেকে এসে প্রণাম করে জিজ্ঞাসা করলেন—কেমন আছেন ?

ভক্তবৃন্দকে দেখে তাঁর মুখে এক ঝলক হাসি ফুটে উঠলো। তারপর দাঁতের যন্ত্রণার কথা বললেন।

মন্মথদার দিকে চেয়ে বললেন—তোমাদের খবর ভালত ?

মন্মথদা—আজ্ঞে হ্যাঁ।

মন্মথদা, সুশীলদা ওঁরা শ্রীশ্রীঠাকুররে জণ্য ভাল ভাল মিষ্টি নিয়ে এসেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর ঐসব দেখে ম্লান হেসে বললেন—বেল পাকলে কাকের কী ?

সুশীলদা—সামান্য দাঁতের ব্যথায় মিষ্টি খেলে কোন ক্ষতি করবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্যে)—কথাটা ত ক'লেন মনের মত, কিন্তু ভেড়ের ভেড়ে দাঁত বেটা তা বোঝে না। এমন যে বস্তু রসগোল্লা তার সঙ্গেও violent non-co-operation movement ( সহিংস অসহযোগ আন্দোলন ) আরম্ভ করে দিয়েছে।

উপস্থিত সবাই একযোগে হেসে ফেললেন। একটু পরে একটি ছেলে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্য কয়েকখানি আখ নিয়ে আসল। শ্রীশ্রীঠাকুর আদর করে ডাক্তার কালীদা কে ডেকে বললেন—ও কালী ! আখ খাবি নাকি ? চ্যাংড়া প্যাংড়া আছিস, খা।

কালীদা একখানি আখ বেছে নিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মনোহরের কাছে দা আছে। দা জোগার করে চেছে ছেলে ছেলে খা।

তারপর ছেলেটিকে বললেন—বড় বৌয়ের কাছে দিয়ে আয় গিয়ে। মুকুল ও বড় খোকা, মণির ছাওয়াল পাওয়ালরা পেলে খুশী হবিনি। আর কাজলার মাকেও একখানা দিস।

পরেশ ভাই (ভোরা) এসে জানালো—ঠাকুর ! এর মধ্যে প্যারীদার নির্দ্দেশ মত stool examine ( পায়খানা পরীক্ষা ) করিয়ে কয়েকরকমের পোকা পাওয়া গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর স্নেহল ভৎ´সনার সুরে বললেন—কাম বাধাইছিস একখান। যেখানে সেখানে যা তা খাস। ওই ত দেখ্‌, কোথা থেকে কী কঠিন পোকা ঢুকে গেছে। তাড়াতাড়ি সারায়ে ফেল। আর খাওয়া সম্বন্ধে সাবধান হবি।

পরেশভাই—আজ্ঞে হ্যাঁ।

মন্মথদা—নামে পোকা মরে না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Vital power ( জীবনী শক্তি ) বেড়ে যায়, তাতে সব হতে পারে।

মন্মথদা—সব রকম পোকা মরে ত ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অতখানি চড়ান মুশকিল, সব একেবারে আগুন হয়ে যায়।

এরপর মন্মথদা আমাদের গুরুভাই একজন অডিটরের কথা বললেন, অনেকে ফি কাময়ে দিতে চায় বলে তিনি তাদের কাজ করছেন না।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাই শুনে বললেন—কোন client ( মক্কেল ) ছাড়া ভাল নয়। বরং বলা ভাল—আমি কিছু চাই না, আপনার কাজ আমি করব, কারণ আপনি আমার। তবে দিতে যদি চান আপনার সামর্থ্য থাকলে ফি কমাবেন না। এতেই মান বাড়ে, rigid (অনমনীয়) হলে তা হয় না। আর এতে ঘর বেড়ে যায়। ডাক্তারী করার সময় ঐরকম করতাম। বলতাম রোগী আমি এমনিই দেখব। তার সঙ্গে পয়সার কোন সম্পর্ক নেই। তবে আমাকে কিছু দেবার ইচ্ছা যদি থাকে, সামর্থ্য থাকলে ফি কমিও না। অবশ্য মোটে কিছু না দিলেও রোগী দেখার বাধা হবে না। এতে রোগীরা নিজে থেকেই competition ( প্রতিযোগিতা ) করে দিনের পর দিন ফি বাড়িয়ে দিতে লাগল। ঘরও বেড়ে যেতে লাগল। ওরও ঘর বেড়ে গেলে সব দিক থেকেই সুবিধা হবে।

১০ই মাঘ, রবিবার, ১৩৫৫ ( ইং ২৩।১।৪৯ )

শ্রীশ্রীঠাকুরের দাঁতের ব্যথা আজও আছে। রাত্রে দুই মন্মথদা (ব্যানার্জ্জী এবং দে), শচীনদা ( গাঙ্গুলী ), প্রকাশদা ( বসু ), কিশোরীদা ( সেন ), অনিলদা ( ব্যানার্জ্জী ), উমাদা ( বাগচী ), প্রফুল্লদা ( বাগচী ), সুনীতিদা ( পাল ), রাধারমণদা ( জোয়ার্দ্দার ), মোহন ভাই (ব্যানার্জ্জী), কালীষষ্ঠী মা, সুশীলাদি (হালদার), আশাদি ( হালদার ), নীলিমা মা, কালিদাস দার মা প্রভৃতি রাত্রে গোল তাঁবুতে শ্রীশ্রীঠাকুরের তক্তপোষ ঘিরে আনন্দের হাটে মিলিত হয়েছেন। এখন যেন তিনি শরীরের কষ্ট ভুলে গিয়ে আনন্দলোকে বিরাজ করছেন। বাণী দিচ্ছেন, হাসছেন, রহস্যালাপ করছেন। ভক্তদের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন।

সন্ধ্যা ৭টার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর নিম্নলিখিত বাণীটি বললেন—

ঔদার্য্য, সহানুভূতি বা সহযোগিতা যখনই
ইষ্টস্বার্থ বা ইষ্টকৃষ্টিকে অবহেলা করল,
তখনই নিখুঁতভাবে বুঝে রেখো
যে, তুমি তোমার অদৃষ্টকে
দুরদৃষ্টের পায়ে নিবেদন করলে;
হলে শয়তানের পূজারী।

বাণীটি দেবার পর শ্রীশ্রীঠাকুর প্রফুল্লকে পড়ে শোনাতে বললেন।

পড়া হলো।

তখন মন্মথদা (দে) বললেন—কৃষ্টি সম্বন্ধে আজকাল বেশীর ভাগ লোকের কোন ধারণাই নাই। Politics ( রাজনীতি )ই আজ সব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কৃষ্টি বাদ দিয়ে যদি politics ( রাজনীতি ) করি সে politics ( রাজনীতি ) হবে সোনার পিতলে ঘুঘু। যে politics-এ (রাজনীতিতে) সত্তার fulfilment (পরিপূরণ) হয় না, সে আবার কিসের politics ( রাজনীতি )? ধর্ম্ম-কৃষ্টিকে বাদ দিয়ে কিছু করতে যাওয়া মানে গাছের গোড়া কেটে আগায় জল ঢালা।

উমাদা—চার্লস ডারুইন ত তাঁর ক্রমবিবর্ত্তন তত্ত্বে প্রাণীজগতে survival of the fittest অর্থাৎ যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন—এই মতবাদের উপর জোর দিয়েছেন। সেখানে ত তিনি ধর্ম্মকৃষ্টির কথা বলেন নি। জীবন সংগ্রামের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য অপরের চাইতে বেশি শক্তিমান হয়ে তাদিগকে পরাভূত করার সামর্থ্য অর্জ্জন করার কথা বলেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Survival of the fittest (যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন) বলতে আমি বুঝি যে যেমন যোগ্য, সে বাঁচেও তেমনি। যোগ্যতা বলতে আমি বুঝি, অপরের বাঁচা বাড়ার ব্যাপারে সেবা দেবার সামর্থ্য। আমি ত নিজের স্বতন্ত্র স্বার্থের কথা আদৌ ভাবিই না, তোমরা যাতে ভাল, থাক, তাই করাই আমার স্বার্থ। এই ছাড়া আর আমি কী করি? তোমরাই তো আমায় দেও থোও, খাওয়াও, পরাও তা দিয়ে পরমপিতার দয়ায় সপরিবার আমার ভেসে যায়, আবার তোমাদের কতকজনেরও বেশ চলে যায়। সপরিবেশ উন্নতিমুখর হয়ে বাঁচাবাড়াই তো ধর্মকৃষ্টির লক্ষ্য, না অন্য কিছু? মানুষ সব উল্টো বোঝে। যে বাঁচাতে চায়, প্রকৃতিই তাকে বাঁচায়, যে মারতে চায় প্রকৃতিই তাকে কালে কালে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। এ বাবা খোদার কুদরৎ, কারও এ নড়চড় করার সাধ্যি নেই। পৃথিবীতে কত রাজা গজা ও ধনকুবের আছে, আমার টাকা পয়সা নেই, বাড়িঘর নেই। ব্যবসা তেজারতি নেই, কলকারখানা নেই, যাকে বলে নেংটে, আমি ষোল আনা তাই, কিন্তু পরমপিতার দয়ায় আমি মানি ও জানি যে আমি সবার ও সবাই আমার। এ বোধ যতদিন আমার আছে ততদিন আমার ঐশ্বর্য্য অব্যয় ও অক্ষয়। আমার শিষ্য হোক, সন্তান হোক, প্রিয় বান্ধব হোক—সকলকেই আমি কই—'মানুষ আপন, টাকা পর যত পারিস, মানুষ ধর'—এই বুদ্ধি নিয়ে চল। আর মানুষ ধরার মূল উদ্দেশ্য হবে ইষ্টার্থপূরণ। এই যদি করে চলতে পার, তোমরা প্রত্যেকেই রাজাধিরাজ। তোমাদের মধুসূদনের হাঁড়ি শূন্য হতে না হতেই পূর্ণ হয়ে উঠবে। This is the

Divine economics of Parampita. Rejoice, resort, resound and be perennially resourceful. ( এইই পরমপিতার স্বর্গীয় অর্থনীতি। আনন্দ কর, এ নীতি নিজ জীবনে প্রয়োগ কর, চতুর্দ্দিকে ঘোষণা কর এবং নিরন্তর ঐশ্বর্য্যশালী হয়ে চল )।

রাত প্রায় আটটার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর গোলতাঁবুতে বসে বাণী দিলেন—

এককথায় কৃষ্টি মানেই হচ্ছে
তারই চাষ করা
যাতে মানুষ বাঁচতে পারে, বাড়তে পারে—
একটা পরিপোষণী সামঞ্জস্যে।

তারপর বললেন—যত রকমই খাই, শরীরটা বাড়ে কিন্তু একটা পরিপোষণী সামঞ্জস্য নিয়ে। আলাদা আলাদা করে বাড়ে না, কানটা বেড়ে গেল, পাটা ছোট হয়ে থাকল, তা হয় না। তেমন হলে তাকে কই ব্যাধি। ধর্ম্ম ও কৃষ্টি নিয়ে চলা মানে পারিপার্শ্বিকসহ সর্ব্বতোমুখী সত্তা-সম্বর্দ্ধনার পথে চলা। প্রবৃত্তি-প্রধান হয়ে চললে ভিতরে বাইরে নানারকম অসঙ্গতি, অসামঞ্জস্য ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে বাধ্য। তাই, সেও একরকমের ব্যাধি।

একটু পরে বহিরাগত জনৈক দাদা বললেন—আমার এবং আমার স্ত্রীর রাহুর দৃষ্টি। কী করলে এর প্রতিকার হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নামের জোর বাড়িয়ে দিও। ভাল করে ভক্তিভরে ইষ্টভৃতি করো। রোজ ইষ্টকে ফুলজল নিবেদন করো এবং ছেলেপেলে সহ সবাই রোজ ঐ জল পান করো। সব বিপদ কেটে যাবে।

আর একজন দাদা তার দরিদ্র অবস্থা এবং পুঁজিহীন ক্ষুদ্র ব্যবসার সম্বন্ধে বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সস্নেহে বললেন—বাবা ! কর। ছোট্ট থেকে বাড়িয়ে তোল। Experience ( অভিজ্ঞতা ) হলো না, অথচ কতকগুলি পয়সা ঢেলে বড় করে ফাঁদলে, তাতে লাভ হয় না। প্রফুল্লর কাছ থেকে ব্যবসার নীতিগুলি লিখে নিয়ে যেও ও সেই মত চলো। নাম চালাবা আর কিছুতে ঘাবড়াবা না।

অশথ গাছে ও আম গাছে পর্যায়ক্রমে দুটো পাখী ডাকছিল, শ্রীশ্রীঠাকুর তাই শুনে বললেন—ঐ দেখ ওরা পরস্পর সুখদুঃখের গল্প করছে। সব রকম জীবেরই নিজস্ব সমাজ আছে। আদানপ্রদানের রীতি আছে। এইগুলি লক্ষ্য করতে হয়।

কালীষষ্ঠী মা—নিজেদের মাথার ঘায় কুকুর পাগল। তা আবার অন্য দিকে লক্ষ্য দেব কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—স্বার্থচিন্তায় বিব্রত থাকিস, পরের দিক তাকাস না, তাই এত কষ্ট।

১১ই মাঘ, সোমবার, ১৩৫৫ (ইং ২৪।১।৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে ভক্তবৃন্দ-পরিবেষ্টিত হয়ে মাঠে ইজিচেয়ারে উপবিষ্ট। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য) প্রভৃতির সঙ্গে দেশের পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছিল।

মতিদা (চ্যাটার্জী)—কি ভাবে এর প্রতিরোধ করা যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আদর্শ-কেন্দ্রিক জনবল, ধনবল, সংগঠন, সংহতি, চারিত্র্য ও পারস্পরিকতা সৃষ্টির কথা কত ক'রে বলেছি। তেমন উৎসর্গীকৃত জীবন নয় আমাদের, আমরা করতে পারলেও করি না।

কেষ্টদা—সৎসঙ্গীরা যেমন করে, অমন অন্যে করে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—করি না আমরা, তিন হাজার কৃষ্টিবান্ধব সংগ্রহ করার কথা বললাম, তাই হ'লো না।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে গোলতাঁবুতে এসে বসেছেন। হাউজারম্যানদা, হেনরী প্রভৃতি উপস্থিত।

কম্যুনিজম সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Solution (সমাধান) হ'তো, lower class এর (নিম্নবর্ণের) মেয়েদের যদি higher class এর (উচ্চবর্ণের) পুরুষরা নিত, আর ধনীরা যদি তাদের ঐশ্বর্য্য দিয়ে গরীবদের nurture (পোষণ) দিয়ে যোগ্যতর ক'রে তুলতে চেষ্টা করত।

হাউজারম্যানদা ও প্রফুল্ল দুজনে দোভাষীর কাজ করছিলেন।

হেনরী—এতে সময় নেবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—খারাপ হ'তে অল্প time ( সময় ) লাগে, ভাল হ'তে ঢের time ( সময় ) লাগে।

একটু থেমে বললেন, সমস্যা সমাধানের জন্য চাই প্রত্যেকটি পরিবারকে একটা industrial institution ( শিল্প সংস্থা ) ক'রে ফেলা, big machinery ( বৃহৎ যন্ত্র ) যথাসম্ভব উঠিয়ে দেওয়া। Labour capitalist problem ( শ্রমিক ধনিক সমস্যা ) যতখানি পারা যায় উঠিয়ে দেওয়া লাগে। প্রত্যেকটা মানুষ একাধারে labour ( শ্রমিক ), একাধারে capitalist ( ধনিক )। যেমন টাটা কোম্পানী আছে, ফোর্ড কোম্পানী আছে। এগুলির যে সব অংশ, ছোট ছোট ক'রে পারিবারিক শিল্প স্তরে ভাগ ক'রে দেওয়া যায়, তা' ক'রে দাও। কাপড়ের কল ভেঙ্গে ছোট ছোট আকার দেওয়া যায়। Spinning (সূতা কাটা), weaving ( বোনা ) ইত্যাদি বিভাগ ক'রে বহু বাড়ীতে পারিবারিক শিল্প গজিয়ে তোলা যায়।

হাউজারম্যানদা—বড় ত লাগেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অপরিহার্য্য ক্ষেত্রে বড় থাকুক। কিন্তু ছোট ছোট শিল্পের উপর জোর দিতে হবে। এতে এক সময়ে কত ভাল ভাল বড় বড় কাজ হতো। পারিবারিক শিল্প বাড়লে ধর্ম্মঘট থাকে না। শ্রমিক নিজেই ধনিক হ'য়ে পড়ে, দ্বন্দ্ব আর থাকে না, যার যেমন ability ( যোগ্যতা ) সে তেমন বড় হয়।

কেস্টদা—ধনিক হ'য়ে যদি লোভী হয় ও শোষণ করে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Efficiency ( দক্ষতা ) কে আপনি দাবিয়ে রাখবেন কি করে ? আর, প্রত্যেকের যোগ্যতা অনুযায়ী কাজের সুযোগ ত থাকবেই। একমাত্র বর্ণাশ্রমই adjustment ( সামঞ্জস্য ) আনতে পারে। তাতে প্রত্যেকেই স্বকীয় occupation ( বৃত্তি ) নিয়ে efficiently ( দক্ষতা সহকারে ) দাঁড়াবে। তা'র যদি efficiency

(দক্ষতা) থাকে, তাকে অন্যে শোষণ করার সুযোগ পাবে কমই। বেকারত্বের বালাইও থাকবে না। বিভিন্ন বর্ণগুলির মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতাই থাকবে।

মন্মথদা—গোড়ায় বৈশ্যদের বিশ্বাসঘাতকতার দরুনই ত দেশের এ দুর্দ্দশা। বৈশ্যের কাজ অন্যের জানা থাকলে ত এ দুরবস্থা হ'ত না।

কেষ্টদা—তাইতো প্রয়োজন interlinking of the duties of different varnas. (বিভিন্ন বর্ণের কাজের অন্তর্যোগ)। প্রত্যেক বর্ণ প্রধানতঃ নিজের কাজ ক'রে অন্য বর্ণের কাজগুলিরও চর্চ্চা করবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দ্রোণাচার্য বিপ্র হ'য়ে যেমন ক্ষত্রিয়ের কাজ জানতেন ও শেখাতেন।

মন্মথদা—একটা নিখুঁত বিধান ভেঙ্গে যখন এই অবস্থায় পরিণত হ'লো, তখন তার পুনরুদ্ধার করে লাভ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অবশ্যপ্রয়োজনীয় ক্ষেত্র ব্যতিরেকে অন্যত্র যেখানে বিকেন্দ্রীকৃত পারিবারিক স্বতন্ত্র শিল্পের উচ্ছেদ ক'রে মহাযন্ত্রের প্রবর্ত্তন করা হ'লো, আমার মনে হয়, সেখানে অদূরদর্শিতা ও শয়তানী অতিলোভের খেলা ছিল। এটা ঠিক হয় নি। এর প্রতিকার করা লাগে। মানুষের যখন ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা ও বৃত্তি উপভোগ বড় হ'য়ে ওঠে তখন আর becoming (বিবর্দ্ধন) বড় থাকে না। সবই আছে, সবই করা যায়, অভাব শুধু উপযুক্ত মানুষের। পরমপিতার জন্য যারা কষ্ট স্বীকার করতে রাজী নয়, তাদের দিয়ে এ কাজ হবার নয়।

কেষ্টদা—অর্থ, খাদ্য, বৃত্তিপোষণ—এইগুলিই ত চায় মানুষ। কম্যুনিষ্টরা যেমন প্রবৃত্তিরোচক ভঙ্গীতে কথা বলে, আমাদের ত সেভাবে বলা চলে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনাদেরও তা আছে, তবে তিনটের adjustment (বিন্যাস) আছে। কি রকম ভাবে real fulfilment of desire (চাহিদার প্রকৃত পরিপূরণ) হয় সেইটে দেখিয়ে দিতে হয়। অসংযত হ'য়ে ত ভোগ হয় না, ভোগ করা যায় না। প্রবৃত্তির উপরে না উঠলে

তা'র তলে পড়ে নিষ্পিষ্ট হ'তে হয়, নিষ্কৃতি বা আধিপত্যের বিমল সত্তাপোষণী উপভোগের কানাকড়িও মেলে না। যারা ঈশ্বরপ্রেমী, তারাই ঈশ্বর ও তাঁর যা কিছু দান নির্লিপ্ত ও যথাযথভাবে উপভোগ করতে পারে। কিছু না পেলেও সন্তোষ তাদের নিত্যসাথী।

কেষ্টদা—আমরা কি ভাবে পরিবেষণ করব? Popular way তে (জনপ্রিয় পথে) আদর্শ-প্রতিষ্ঠানে man money (টাকা ও মানুষ) এর আমদানি হবে কি ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সব আমার দেওয়া আছে। সেই ভাবে করবেন। দেওয়া আছে, না করলে কি হবে? বলতে পারেন প্রত্যেকটা মানুষ সব দিক দিয়ে উচ্ছল হ'য়ে ওঠে যা'তে, তাই চাই আমরা। অপরকে দাবিয়ে বা ফাঁকিবাজী ক'রে কেউ বড় হোক তা চাই না আমরা। যার সত্তা সচ্চিদানন্দময়, সে অকারণ হীন হ'য়ে থাকবে কেন, অযথা কষ্ট পাবে কেন?

একটু পরে সহাস্যে বললেন—একটা মানুষ Saint (সাধু) হ'তে পারে, কিন্তু saintly diplomat (সাধুভাবে কূটনৈতিক) হওয়া মুসকিল। জটিল দুনিয়ায় তারই প্রয়োজন আজ বড় বেশী। শুভবুদ্ধি নিয়ে সবারই মঙ্গল করতে হবে—কুশল কৌশলী হ'য়ে, যেখানে যেমন ক'রে কাজ হাসিল হয় তাই ক'রে। এর পর অনেকেই বিদায় নিলেন।

পরে শ্রীশ্রীঠাকুর রহস্য ক'রে বললেন—আমি যে কিছু জানি তাইই মনে হয় না। অথচ কথাও ফুরোয় না। এ এক অশৈলী কাণ্ড। কে যে কওয়ায় তাও ঠাওর পাই না।

১২ই মাঘ, মঙ্গলবার, ১৩৫৫ (ইং ২৫।১।৪৯)

আজ দুপুরে বড়াল-বাংলোর কাছে ডেকলার দোকানের সামনে স্থানীয় কয়েকজন লোক তাড়ি খেয়ে আশ্রমের কয়েকজনকে গুরুতর প্রহার করে। এই ব্যাপারে বিচারের জন্য সন্ধ্যায় ডাকুবাবু প্রভৃতি নেতৃস্থানীয় পাণ্ডাদের আহ্বান করা হয়। পাণ্ডাজীরা এসে সব কথা

শুনে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় লোকদের খুব বকেন। তা'রা অনুতপ্ত ও ভীত হ'য়ে অতঃপর শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে এসে ক্ষমা চায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরম স্নেহে মধুঝরা কণ্ঠে তাদের বলেন—তোমরাও পাণ্ডাজীর আশ্রিত, আমরাও পাণ্ডাজীর আশ্রিত। এখানে বাবার ধামে তোমরাও আছ, আমরাও তোমাদের কাছেই আছি, তোমরা ত আমাদের আপনজন, আমাদের ত তোমরাই দেখবে, শুনবে, রক্ষা করবে। আর, লোক না লক্ষ্মী। এখানে সৎসঙ্গের আওতায় মানুষ যত বাড়বে, তোমাদেরও ক'রে খাওয়ার পথ নানাদিক দিয়ে তত খুলে যাবে। তোমরা যেমন সৎসঙ্গের সহায়, সৎসঙ্গও তেমনি তোমাদের সহায়। সৎসঙ্গ ত সবার জন্য। দেখো না পরমপিতার দয়ায় কালে কালে কী হয়!

ওরা বিগলিত কণ্ঠে বলল—হ্যাঁ বাবা! আর এমন হবে না। আপনারা থাকায় আমাদেরই ত লাভ!

শ্রীশ্রীঠাকুর—জেনো বাবা! শান্তি যেখানে, ভগবান সেখানে। অশান্তি যেখানে, কাল সেখানে।

পাণ্ডাজীরা শ্রীশ্রীঠাকুরের সামনেও ওদের আর একবার জোরসে কড়কে দিলেন।

ওরা নীরবে বিনীতভাবে প্রণাম ক'রে বিদায় নিল। পাণ্ডাজীরা শ্রীশ্রীঠাকুরকে অভয় দিয়ে চ'লে গেলেন।

তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—পরমপিতা যে আমাকে দেওঘরে টেনে এনেছেন, তার মানে আছে। ভারতের গ্রাম্যজীবনে এবং সমাজ জীবনে বিভিন্ন স্থানে পাণ্ডাদের মত সংহত, শক্তিমান এমন এক একদল সমাজ নেতা না থাকায় প্রত্যেকেই প্রত্যেকের পিছনে লাগার সুযোগ পায়।

কথা উঠলো—অনেক সময় এই শক্তির অপব্যবহারও হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' অসম্ভব নয়। তবে আমাদের কাজ হ'লো যাজনের ভিতর দিয়ে এমনভাবে প্রেরণা যোগানো, যাতে সর্বপ্রকার শক্তির নব নব সৃজনশীল শুভ বিনিয়োগ উত্তরোত্তর বেড়েই চলে। সেইই হলো

ঋত্বিক সঙ্ঘের কাজ। আর, অশুভ শক্তি যাতে মাথা চাড়া দিতে না পারে, সেইজন্য স্বস্তিসেবক বাহিনীও জোরদার ক'রে তোলা লাগে।

পরে পূজনীয় বড়দা প্রভৃতি আসলে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এই ভাবে মিটমাট হ'য়ে যেয়ে ভালই হয়েছে, কি বল?

বড়দা—হ্যাঁ! খুব ভাল হয়েছে।

১৪ই মাঘ, বৃহস্পতিবার, ১৩৫৫ (ইং ২৭।১।৪৯)

আজ সকালে আবহাওয়াটা মেঘলা। কাল রাত্রে বৃষ্টি হ'য়ে গেছে। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), কাশীদা (রায় চৌধুরী), অশোক নাথ রায় প্রভৃতি গোলতাঁবুতে ব'সে শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করছেন। অশোকবাবু নানা রকম গল্প করছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সাগ্রহে প্রসন্ন চিত্তে সেই সব গল্প শুনছেন।

কথা প্রসঙ্গে কেষ্টদা বললেন—ভারতীয় কৃষ্টি সম্বন্ধে যে এ পর্য্যন্ত কত উদ্ভট ব্যাখ্যা হয়েছে তা' বলে শেষ করা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অনুভূতিহীন, অনধিকারী, অসম্যকদর্শী, পূর্ব্বতন বিদ্যাদিগগজদের অপব্যাখ্যাই এর জন্য দায়ী। আর, আমাদের দেশের তামসপ্রধান লোকদের মধ্যে না ক'রে পাওয়ার বুদ্ধি খুব প্রবল। তাই, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির নামে বহু আজগবী, অবৈজ্ঞানিক, অলৌকিক ধারণা প্রশ্রয় পেয়েছে।

অশোকবাবু গল্পচ্ছলে একজন বিশিষ্ট লোকের কথা উল্লেখ করলেন যিনি নিজের পিতৃ পরিচয় গোপন ক'রে পরমপিতাকে নিজের পিতা ব'লে পরিচয় দেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি বুঝি, যদি নিজের বাবাকে না চিনি, পরমপিতাকে কোন দিন চিনব না। সুকেন্দ্রিক টান পিতামাতাকে অবলম্বন ক'রে গজায়, পরে তা সদগুরুতে কেন্দ্রায়িত হয়। সদগুরুতে আঁতের টান গজালে পরে তা' বিশ্বময় ভূমায়িত বা ব্যাপ্ত হ'য়ে পড়ে। সদগুরুর সঙ্গে সম্বন্ধ দেবতা, বাবা, মা সকলের সঙ্গে সম্বন্ধের থেকে বড়। তার কারণ,

ওখানে সত্যিকার টান হ'লে সবটাই fulfilled ( পরিপূরিত ) হয়, সত্তা যে সচ্চিদানন্দময় তা উপলব্ধির পথ খুলে যায়।

পরে শ্রীশ্রীঠাকুর নিজে থেকে বললেন—সর্ব্বদা স্মরণ রেখে চলতে হয়—"ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা। নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥" (পরমেশ্বরের জন্য ভৃত্যবৎ কর্ম্ম করিতেছে—এই বুদ্ধি দ্বারা আমাতে সমস্ত কর্ম্ম সমর্পন ক'রে ফলাভিসন্ধিরহিত, মমত্বহীন ও শোকশূন্য হ'য়ে তুমি যুদ্ধ কর।)

কাশীদা—জ্বর কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার ছেলে, আমার বৌ, আমার দাদা, আমার মা, আমার ভাই, আমার টাকা। আমার পয়সা, আমার ঘরবাড়ী, আমার লাভলোকসান—এই ভাবে আমার self centric ( আত্মকেন্দ্রিক ) ভাব নিয়ে মত্ত থাকাটাই জ্বর। ভাবতে হয়, আমি ও আমার যা কিছু সবই পরমপিতার। তাঁর সেবার জন্যই যা কিছু। তাঁর বা পরিবেশের জন্য কিছু করতে পারলে, সেই সুযোগ পাওয়ার জন্য বিনম্র ও কৃতজ্ঞ থাকতে হয়। কোন প্রত্যাসা রাখতে হয় না। কোন অহঙ্কার করতে হয় না। তাঁকে তৃপ্ত ও প্রীত করাই আমাদের পরম স্বার্থ। এই ভাবে চলতে পারাই পরম শান্তি।

কাশীদা—কিভাবে ভারতবর্ষের সংগঠন করা যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—খবরের কাগজগুলিতে সৎসঙ্গের ভাবধারা নিত্য নিয়মিত ভাবে জোরসে চারাতে হয়, আর চাই ঋত্বিকের সংখ্যা বাড়িয়ে দীক্ষিতের সংখ্যা দেদার বৃদ্ধি ক'রে তাদের দীক্ষোত্তর পোষনের ব্যবস্থা করা। এমনি ক'রে পারস্পরিক সেবা বিনিময় ও সংহতি বাড়িয়ে তুলতে হয়। চানক্যের কথাগুলি বড় মুল্যবান। এই কটি কথা মাথায় রেখে চলতে হয়—

সুখস্য মুলং ধর্ম্মঃ
ধর্ম্মস্য মুলম অর্থঃ
অর্থস্য মুলং রাজ্যম্

রাজ্যস্য মূলম্ ইন্দ্রিয়জয়ঃ
ইন্দ্রিয় জয়স্য মূলং বিনয়ঃ
বিনয়স্য মূলং বৃদ্ধোপসেবা,
বৃদ্ধসেবয়া বিজ্ঞানম্।

কাশীদা—অর্থ কথার এখানে তাৎপর্য্য কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অর্থ এসেছে ঋ-ধাতু থেকে, ঋ-ধাতু মানে গমন। তার মানে চলার পথে যা যা লওয়াজিমা প্রয়োজন তা অধিগত বা আয়ত্ত করতে হবে। কী উদ্দেশ্যে কী করছি তা ঠিক রাখতে হবে। তার জন্য চাই আদর্শকে পরিপূরণ করার বুদ্ধি অব্যাহত রাখা। এর থেকে আসে চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব। তাই ইষ্টার্থে honestly ( সদ্ভাবে ) material ও moral resource ( পার্থিব ও নৈতিক সম্পদ ) আহরণ করার সামর্থ্য যেখানে গজায় না সেখানে ধর্ম্ম অর্থাৎ ধৃতিচলন সুদৃঢ় হয় না।

কাশীদা—ইষ্টকে পরিপূরণ করায় আমার স্বার্থ কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাঁর জন্য করাতেই ত আমার স্বার্থ। মানুষের নিজের জন্য কতটুকু লাগে ? ছেলে-পেলে অর্থাৎ যাদের আমার ব'লে মনে করে, তাদের জন্যই করে। সেটাও প্রকারান্তরে একরকমের অনাসক্ত হয়ে করা। তাদের সুখই—আমার সুখ, এমনতর ভাবটা বদ্ধমূল হ'য়ে যায়। সেটা উল্টে নিয়ে সব কিছু ভগবানের জন্য হ'লে, তাঁকে আপন মনে করলে সেই অনাসক্ত হ'য়ে করাটাই এসব দিক দিয়ে সার্থক হয়ে ওঠে। তাঁতে আসক্ত হ'য়ে তৎ-প্রীত্যর্থে অনাসক্তভাবে সংসারের সবকর্তব্য ও তাঁর যাবতীয় সাত্বত ইচ্ছা পূরণের জন্য যা যা করণীয় তা করতে থাকলে আমাদের অন্তর্নিহিত শক্তি, যোগ্যতা ও দেবোপম চরিত্র ও গুণাবলী আরো আরো বিকশিত হ'য়ে ওঠে। ইষ্টার্থী চলনে আমাদের জীবন বৃহত্তর সমাজের সেবায় আরো সার্থক হ'য়ে ওঠে। অতোখানি সাত্বত প্রয়োজনপূরণী দক্ষতাপূর্ণ করার ফলে ক্ষুদ্র সংসারের প্রয়োজনও automatically ( স্বাভাবিকভাবে ) মিটে যায় আশাতীতভাবে। আমি ত পরমপিতার খুশীর জন্য কতজনের কত ব্যাপার নিয়ে হরদম ব্যস্ত থাকি,

নিজের সংসারের কথা ভাবার ফুরসুতই আমার কম, তোমাদের সবাইকে নিয়ে আমার যে এত্‌বড় সংসার, তা' কি চলছে না? তোমরাও আমার মত সবার মঙ্গলস্বার্থী পাকা স্বার্থপর সংসারী হও তাই ত আমি চাই। সংসারে যদি আসক্ত থাকি, সেই আসক্তির দরুন জমি, জমা, মামলা-মোকর্দ্দমা, অফিসকাছারী, অর্থ, মান, প্রতিপত্তি, লোভ, ক্রোধ, হিংসা, পরশ্রীকাতরতা, ন্যায়, অন্যায়, পাপপুন্য, উদ্বেগ-দুশ্চিন্তা কত কিছুর শিকার হ'য়ে পড়ি তাঁর কি লেখা জোখা আছে? আর এইখানেই কি তার শেষ হয়? নিজের ধান্দায় ঘুরি বলে জন্ম-জন্ম ধরে কত কর্ম্মফলের বোঝা বাড়িয়ে চলি আর তজ্জনিত দুর্ভোগ ভুগে ভুগে মরি। সব কিছু চাহিদার পরিপূরণের জন্য তাই একমাত্র তাঁতে অনুরক্ত হ'য়ে তাঁর কাজে নিজেকে ন্যস্ত করতে হয়। তাঁর বিরাট ইচ্ছা মুর্ত্ত করতে গিয়ে আমাদের ব্যক্তিত্ব ও যোগ্যতা বেড়ে ওঠে—প্রাপ্তি ও হয় অঢেল। মুখ্য ক'রে চলতে হয় তাঁর ইচ্ছাপূরণ। সেই জন্যই বাঁচা ও বাঁচার প্রয়োজন মেটানো। তাঁকে মুখ্য ক'রে চললে, সব ভূতে যোগায়। এই ভাবে চলাই ধর্ম্ম, কর্ম্ম, সাধনা, যোগ, জ্ঞান, ভক্তি যা কিছু বল সবই।

নরেন সরকারদা আসলেন দিল্লী থেকে। তখন আনন্দবাজার পত্রিকা প'ড়ে শোনান হচ্ছিল শ্রীশ্রীঠাকুরকে। তা থেকে চীন ও কম্যুনিজমের কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভারতেরও ত নিজস্ব সমাজতন্ত্রবাদ ছিল, তার মধ্য দিয়েই তো প্রকৃত সাম্য প্রতিষ্ঠিত হ'তো। ভারতের সমাজতন্ত্রবাদ সব বাদেরই solution ( সমাধান )।

নরেনদা—ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে পরিবেশের উপর একমাত্র গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন আমি বোধ করি না।

স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রেরণায় ব্যক্তির করা সৎকাজের মুল্য থাকে না তাহ'লে। কম্যুনিজমের ঐ দিকটা আমার ভাল লাগে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কথা হ'লো সত্তাকে পালন-পোষণ করতে পারিপার্শ্বিক লাগে। কিন্তু সত্তাকে বাদ দিয়ে পারিপার্শ্বিক নয়। ব্যষ্টি জীবন সমষ্টি

জীবন কোনটা বাদ দিয়ে কোনটা নয়। উভয়ের মুক্তি চাই।

নরেনদা—আমাদের সমাজের ব্রাহ্মণের যে আদর্শ ছিল তা'র সঙ্গে কম্যুনিজমের আদর্শের তুলনা হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিপ্ররা ছিল শিক্ষক-শ্রেণী। তাই তাদের এত সম্মান। অবশ্য প্রত্যেক বর্ণই স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যে প্রধান। বিপ্ররা ভিক্ষা ক'রে খেত, দক্ষিণাই ছিল তাদের সম্বল। উঞ্ছবৃত্তি অর্থাৎ এদের সেবায় উচ্ছল হয়ে মানুষ তার এক কণা যা দিত, তাই ছিল তাদের জীবিকা। অর্থকে এরা স্বার্থ মনে করত না। মানুষের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধনই ছিল এদের জীবনের ধান্ধা। এ বড় পবিত্র জীবন। এমনতর একটা শ্রেণী ছিল ব'লে তাদের পোষণ চর্য্যায় সমস্ত সমাজ বেড়ে ওঠার সুযোগ পেত। এরা মুচির কাজ শেখাতে পারত কিন্তু মুচির কাজ জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করতে পারত না। Auto initiative service was in their very blood. (স্বতঃ প্রণোদিত সেবা তাদের রক্তের মধ্যেই অনুস্যূত ছিল)। এই ভাবটা এদের মধ্যে যদি আবার জাগিয়ে তোলা যায়, কিছুতেই এদের হটাবার জো নেই;—Immortal necklace of germ-cells (বীজকোষের অবিনশ্বর মালা) ব'লে যদি কিছু থাকে। এদের সেবাপ্রাণতার সংস্কার উজ্জীবিত ক'রে তোলা কঠিন কিছু নয়। পল্লী-পরিকল্পনায় তাই আমি গ্রাম্য আচার্য্যদের ভূমিকার কথা বলেছি। তা'রা বাড়ী বাড়ী গিয়ে মানুষকে হাতে কলমে শেখাবে। লোককে সব দিক দিয়ে শিক্ষিত ক'রে তোলার জন্য একটা group (গুচ্ছ) যদি না থাকে, তাদের যদি efficiency (যোগ্যতা) না থাকে, তবে দেশের উন্নতি হয় না। পুরোহিত, পুরের হিত যাদের মুখ্য কাজ, সেই পুরোহিত আজ পুরোত নামক তাচ্ছিল্যের পাত্রে পরিণত হয়েছে। কিন্তু Heaven on earth (পৃথিবীতে স্বর্গ) জিনিষটা ভারতেই সম্ভব হয়েছিল—এই সব লোক ছিল বলে।

নরেনদা—শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন—মানুষ যদি অতি-মানবত্বের দিকে না যায়, তবে শান্তি হবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সর্ব্ব পরিপূরক আদর্শের প্রতি এক ঝাঁকে যারা যায় তাদের কয় সমাজ। আর সে আদর্শ মানে তেমনতর চরিত্র সম্পন্ন একজন মানুষ।

এরপর আবার চায়নার কথা উঠলো।

নরেনদা—চায়নায় বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব আছে, কিন্তু বৌদ্ধদের শূন্য-বাদ বোঝা কঠিন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বৌদ্ধ ধর্ম্ম অত্যন্ত matter of fact (বাস্তব ভিত্তিক) ব্যাপার। শূন্যবাদ নেতিবাচক ব্যাপার। ওটা কথা নয়। ঠিকমত চল, বল, কর; সেইটেই চলার পথ, তাতেই সার্থক হবে। এইই কথা। পৃথিবীতে যত মহাপুরুষের বাদ আছে, সবই একবাদ। তাহ'লো একনিষ্ট সাত্বত কর্ম্মবাদ। তাতে ব্যষ্টি ও পরিবেশ ইষ্টকে কেন্দ্র ক'রে সংহত, সংযত ও সংবর্দ্ধিত হয়ে ওঠে। তাই বৌদ্ধদের ত্রিশরণ মন্ত্রেও আছে—

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি
সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি
ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি।

সব ধর্ম্মেরই মুল কথা—

একমেবাদ্বিতীয়ং শরণম্।
পূর্ব্বেষামাপূরয়িতারঃ প্রবুদ্ধা ঋষয়ঃ শরণম্।
তদ্বর্ত্মানুবর্ত্তিনঃ পিতরঃ শরণম্।
সত্তানুগুণা বর্ণাশ্রমাঃ শরণম্।
পূর্ব্বাপূরকো বর্ত্তমানঃ পুরুষোত্তমঃ শরণম্।
এতদেবার্য্যায়ণম্
এষ এব সদ্ধর্ম্মঃ
এতদেব শাশ্বতং শরণ্যম্।

বর্ণাশ্রম কথাটা অন্যত্র না থাকতে পারে, কিন্তু জীবনের সব ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্যসম্মত চলন ও অনুশীলনের কথা সব মহাপুরুষই ব'লে গেছেন। আর সেইটেই ত বর্ণাশ্রমের প্রাণ। ফলকথা, সব কোকিলেরই এক ডাক।

দেশভাগের কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর আপশোষের সুরে বললেন—এইটে করতে দেওয়ায় শয়তানের নিঃশ্বাস যেন রূপায়িত হয়ে উঠেছে। এই যে ভাঙ্গনের পর্ব্ব প্রবর্ত্তিত হ'লো—দেখ না এর শেষ কোথায় দাঁড়ায় ?

নরেনদার সঙ্গে কিছু সময় ঘরোয়া কথা হ'লো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যাই কর শরীরের প্রতি লক্ষ্য রেখে চলো। যত্র তত্র যা তা খাওয়া ভাল না। কোথা থেকে কোন infection ( সংক্রমণ ) হয়, তার ঠিক কি ?

এর পর কিছু সময় চুপ চাপ কাটলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা পলিটিকস মানে কী ?

নরেনদা সেই প্রসঙ্গে দেশ, সরকার, শাসনপ্রণালী, বিভিন্ন প্রকারের সংবিধান, নানা রাজনৈতিক দল, রাষ্ট্র, আইন, রাষ্ট্রের কাঠামো, জনগণ, কর্ত্তব্য, অধিকার, রাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র, কম্যুনিজম ইত্যাদি নানা কথার অবতারণা করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর ধৈর্য্য ধ'রে অনেক কথা শুনলেন, তারপর বললেন—আমি দেখি এটা মূলতঃ সংস্কৃত কথা—এর পিছনে আছে পৃ-ধাতু, যার মানে পূরণ, পালন। এর সঙ্গে পূর, পূরি, Police, Policy ইত্যাদি অনেক কথার অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে ব'লে মনে হয়। পূর কথার মানে হ'লো যেখানে মানুষ পরস্পর পূরণ করে বাঁচে বাড়ে। সব দিক থেকে বিচার ক'রে মনে হয় পলিটিকস কথার মূল বক্তব্য হলো to fulfil dharma i.e. being and becoming of every individual ( প্রতিটি ব্যক্তির ধর্ম্ম অর্থাৎ বাঁচা বাড়া পূরণ করা ) প্রত্যেকের মত ক'রে তার। আর একেই বলে সাম্য। রাজনীতি কথাটার মানেও প্রত্যেক ব্যক্তির সত্তা যাতে শুভে রঞ্জিত হয় সেই নীতি।

নরেনদা—এর ধারাটা ঠিক করা লাগবে ত ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Common factor ( উপাদান সামান্য ) গুলি নিয়ে difference ( পার্থক্য ) গুলি adjust ( নিয়ন্ত্রণ ) করা। তোমারও দুই

খানা কান, আমারও ২ খানা কান, তোমারও দুটো চোখ, আমারও দুটো চোখ, তুমিও চোখ দিয়ে দেখ, আমিও চোখ দিয়ে দেখি, তোমারও দুটো পা, আমারও দুটো পা। এই রকম বহুদিক থেকে সমান। যাকে বলে ভাগবত ঐক্য। এ সত্ত্বেও তোমার আমার মধ্যে difference (পার্থক্য) আছে। যার দরুন তুমি তুমি, আমি আমি। তাকেই বলে বৈশিষ্ট্য। সেই বৈশিষ্ট্যের পোষণ চাই। মানুষও machine ( যন্ত্র ) বটে, তবে something more than a machine (যন্ত্রের চাইতে কিছু বেশী),—তার এই বৈশিষ্ট্য আছে ব'লে। তোমার কিছু না, সব স্টেটের,—ব্যাপার যদি এমনতর হয়, তবে তুমি machine ( যন্ত্র ) ছাড়া কিছু নও। তুমি পাঁচ লাখ টাকা আয় করেছ, সে টাকা স্টেটের। তোমার তার উপর কোন অধিকার নেই, তা থেকে পাঁচটা টাকাও ঠাকুরকে দেবার ক্ষমতা যদি তোমার না থাকে, তোমার কত lovely traits (সুন্দর গুণ) পোষনের অভাবে নষ্ট পাবে। ফলকথা তোমার free will (স্বাধীন ইচ্ছা) শুভ হ'লেও তা' তুমি display ( প্রকাশ ) করতে পারবে না। এতে তোমার growth ( বৃদ্ধি ) stunted ( ব্যাহত ) হবে, তোমার individuality ( ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য ) বাড়তে পারবে না। এটা কি ভাল কথা?

নরেনদা—ব্যক্তি-স্বাধীনতা থাকলে তা থেকেই আসে ধনতন্ত্র আর ধনতন্ত্র বজায় থাকলে তা থেকেই আসে শ্রমিকদের দুর্ভোগ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার superior service ( উন্নত ধরনের সেবা ) দেবার ক্ষমতা আছে। তার প্রতিদানে তোমাকে যদি মানুষ তদনুযায়ী দেয়, তাতে আপত্তির কী আছে? Labour ( শ্রমিক ) কে capitalist ( ধনিক ) করার কায়দা বরং দেখ। বৃত্তি হরণ করা মহাপাপ। কারও সহজাত বৃত্তির ক্ষেত্র থেকে তাকে চ্যুত করা ঠিক নয়। আগে বহু পরিবারে এমনতর কর্ম্মকাণ্ড ছিল যে নিজেদের শ্রমের ভিতর দিয়েই তা'রা ধনবান হ'য়ে উঠত। কার্য্যতঃ তখন সব সম্প্রদায় inter-interested ( পরস্পর স্বার্থান্বিত ) ছিল। কাউকে বাদ দিয়ে কারও চলত না। ব্যক্তিগত স্বার্থের সুষ্ঠু সম্পূরণের জন্যই প্রত্যেকে প্রত্যেককে দেখত

স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী। আর ছিল সমাজের শাসন। আগে কেউ সমাজবিরোধী চলনে চললে তাকে ঠেকি করত, আর সেটা শুধু বামুনরা করত না। ধোপা, নাপিত, এমন কি সমগ্র সমাজ তাতে যোগ দিত। ঐ কাঠামোকে যুগোপযোগীভাবে পরিচ্ছন্ন, বিন্যস্ত ও নবীকৃত ক'রে তুললে তোমাদের মত কম্যুনিজম কোথায় মিলবে ?

নরেনদা—Laissez faire ( যদৃচ্ছচলন ) ও বর্ত্তমান পদ্ধতিতে শোষক-শোষিত থাকেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের দেশ মহাযন্ত্র প্রবর্ত্তনের স্বপক্ষে ছিল না। ওতে বহু লোক unemployed ( বেকার ) হ'য়ে পড়ে। কিন্তু আগে কা'রও কাজের অভাবও ছিল না। স্বাভাবিক প্রাচুর্য্যের অভাবও ছিল না। তখন তোমরা ছিলে দেবজাতি। যেমন ছিল চারিত্রিক ঐশ্বর্য্য, তেমনি ছিল বৈষয়িক প্রতুলতা। এখন যে সব মহাযন্ত্র চালু আছে, তার কোনগুলি কতখানি decentralise (বিকেন্দ্রীকরণ) করা যায়, তা ভেবে চিন্তে তেমনতর ব্যবস্থা করতে পারলে ভাল হয়।

নরেনদা—আপনার কথা বুঝি, কিন্তু এখন যে অবস্থা চলছে তাতে revolution ( বিপ্লব ) অবশ্যম্ভাবী। এমন ব্যবস্থা চাই যা'তে সবাই রাষ্ট্রের অধীনে থেকে তাদের শক্তি প্রয়োগ করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাই কর যোগ্যতার মামলোৎ থাকবেই।

নরেনদা—ব্যক্তিগত সঞ্চয়টা রুদ্ধ করা দরকার। যা কিছু করবে রাষ্ট্রের জন্য, রাষ্ট্র প্রতিপালন করবে প্রত্যেককে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যোগ্যতা আহরণ ক'রে ক'রে, তুমি যেমন হিমায়েতপুর থেকে সকলকে নিয়ে এসে বসালে কেষ্টনগরে। Initiative (প্রারম্ভিক পদক্ষেপ) না নিলে এটা হতো না। তোমাকে মাইনে ক'রে চাকর রাখলে এই কাজ হতো না। স্টেট যদি ভরণ পোষণের বরাদ্দে মাত্র servant (চাকর)ই রাখে, তবে individual enterprise ( ব্যক্তিগত উদ্যোগ ) থেমে যাবে, যোগ্যতা কমে যাবে, সবাই suffer করবে ( কষ্ট পাবে )। ওতে সব ঠিক ক'রেও ঐ individual enterprise

(ব্যক্তিগত উদ্যোগ) এর scope (সুযোগ) না থাকায় কারও জেল্লা খুলবে না। Individual enterprise (ব্যক্তিগত উদ্যোগ) এর function (অনুষ্ঠান) রাখতে গেলেই সনাতন-ism (বাদ) চলে আসবে। বৈশিষ্ট্যসমন্বিত class (শ্রেণী) নষ্ট করলে তার অন্তর্গত মানুষগুলিও নষ্ট হবে। তবে অসৎনিরোধী ব্যবস্থাকে এমন সক্রিয় ক'রে রাখতে হবে যাতে অপরের ক্ষতি সাধনের পথ অনেকখানি রুদ্ধ হয়ে যায়।

নরেনদা—ভাঙ্গতে গেলে গড়ার পরিকল্পনা চাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিপ্লব চাই। বিদ্রোহ নয়। বিদ্রোহ থাকবে বাঁচা-বাড়ার বিরোধী যা তার বিরুদ্ধে। আর, বিপ্লব হওয়া চাই concentric (সুকেন্দ্রিক), নচেৎ হবে না। পূর্ব্বাপূরকো বর্ত্তমানঃ পুরুষোত্তমঃ শরণম্। তাঁকে অবলম্বন করে সব কিছুকে একসূত্রসঙ্গত করে তুলতে হবে। মিশ্রীর মধ্যে যদি সূতো না দাও, তাহলে দানা বাঁধবে কি করে?

১৫ই মাঘ, শুক্রবার, ১৩৫৫ (ইং ২৮।১।৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে ভক্তবৃন্দসহ গোল তাঁবুতে শুভ্রশয্যায় একটি পাতলা সাদা চাদর গায় জড়িয়ে বসে আছেন। বাইরে অনেকে রোদ পিঠ করে দাঁড়িয়ে আছেন। একজন শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্য পাটালি নিয়ে এসেছেন। তিনি বললেন—যা, বাড়ীর ভিতরে দিয়ে আয় গিয়ে। তারপর বললেন—কি বলিস্ কালীষষ্ঠী! পাবনার পাটালির স্বাদই কিন্তু ছিল আলাদা। যেমন দুধ তেমনি পাটালি। পায়েস রাঁধার সময় তার সুবাসে চারিদিক মাতিয়ে দিত।

কালীষষ্ঠীমা—আপনার দয়ায় আবার যখন আমরা আশ্রমে ফিরে যাব তখন সব ভোগ করা যাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্যে)—তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক। দেশের কথা মনে হলে আমার প্রাণ আনচান করে ওঠে। সাধে কি কয় আমার সোনার বাংলা দেশ। ওখানকার মাটির গন্ধ এখনও যেন আমার

নাকে ভেসে আসে। কেমন যেন নেশা ধরায়ে দেয়। আর পাখী ছিল কতরকমের। সে সব পাখীর ডাক শোনার জন্য কান যেন উপোসী হয়ে আছে। মাঝে মাঝে কেমন দখিনা মলয় হাওয়া আসত। গ্রামের লোকের নাংলা কথা, সহজ ব্যবহার কত মিষ্টি লাগত। দেশছাড়া না হলে বোধহয় বুঝতে পারতাম না যে হিমায়েতপুরকে এতখানি ভালবাসিছিলাম। যে মাটি এই শরীরকে কোলে ধরিছিল, সে মাটির কোলে কি আবার ফিরে যেতে পারব? তাই কই কালীষষ্ঠী! তোর কথা যেন সত্যি হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুরের গম্ভীর উদাসভাব দেখে সবাই চুপ করে গেলেন।

জনৈক দাদা নানা অশান্তির কথা বলছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অনুরাগের সঙ্গে নাম করবি, এতে হবে সত্তার পরিচর্য্যা ও পরিপোষণ, সব অবস্থায় স্ফূর্তিতে থাকবি, এতে শান্তি হবে।

কথা প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি যেমন করিস্ তেমনি ঋত্বিকী করিস, ঋত্বিকী করলে ঋত্বিকদের জোর বেড়ে যায়, তাদের কোন ভাবনা থাকে না, তারা তোদের সেবা সম্পোষণ নিয়ে থাকতে পারে, তাতে তোদেরই সুবিধা।

এর কিছু সময় পরে কাগজ পড়া হলো। তখন রাশিয়ার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার থেকে আমাদের নিত্য পঞ্চ মহাযজ্ঞের ব্যবস্থাই ত ভাল ছিল। ব্যক্তি তার আয় থেকে বণ্টন করে দেবে তার স্বাধীন ইচ্ছায় সানন্দে। শুনেছি, আয়ের কত অংশ কি জন্য উৎসর্গ করবে, তারও হার ঠিক করা ছিল। আমাদের বিধানে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের একটা perfect concordance (সুষ্ঠু সঙ্গতি) ছিল। ব্যক্তিকে জোর করে যন্ত্রের মত করিয়ে নেওয়া ছিল না। তাতে ব্যক্তি ও সমাজ উভয়েই বেড়ে উঠত স্বচ্ছন্দ গতিতে সবৈশিষ্ট্যে।

১৬ই মাঘ, শনিবার, ১৩৫৫ (ইং ২৯।১।৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে গোল তাঁবুতে উপবিষ্ট। নরেন সরকারদার সঙ্গে বাংলার কৃষ্টিগত পুনর্জাগরণ সম্বন্ধে কথা হচ্ছে।

নরেনদা—বাংলার অবস্থা আজ বড় কঠিন। একে সংগঠন করাই শক্ত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কঠিন ব্যাপার এই জন্য যে আমরা করব না বলে বদ্ধপরিকর। আর এক পূণ্য বিপ্লব সৃষ্টি করলে সহজেই হয়। মাথার মধ্যে অন্য philosophy (দর্শন) ঢুকিয়ে আমরা জনগণকে পথভ্রষ্ট করেছি। সে আজ থেকে নয়, ইংরেজ আমল থেকে নয়, মুসলমান আমল থেকে নয়, তার আগে থেকেও, এমনকি অশোকের আমল থেকে আমরা বিভ্রান্তির পথে টেনে এনেছি মানুষকে। অজস্র propaganda (প্রচার) করেছি basic fundament (মৌলিক ভিত্তি)টা বাদ দিয়ে। এখন সব ঠিক করতে অনেকখানি খাটুনি দরকার।

টাকাও চাই, মানুষও চাই, কৌশলও চাই। "যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্"। যোগ যদি না থাকে কৌশলও বেরোয় না। আর এ স্রোত ফেরাতে চাই বিভিন্ন কাগজে দৈনন্দিন ব্যাপক পরিবেশন। কথা হলো এই জিনিস অতুলনীয়, অমোঘ। সাত্বত কৃষ্টি আছেই যে inherent (সহজাত)। এতদিন চললে, করলে কবেই হয়ে যেত।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর পায়খানায় গেলেন।

পায়খানা থেকে এসে নরেনদাকে জিজ্ঞাসা করলেন—কী করবি? এসব কথা সম্বন্ধে আলাপ করিস না? Leader (নেতা) রা বোঝে না?

নরেনদা—বুঝেও করে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কম্যুনিজম বল, সোস্যালিজম্ বল, তোমাদের কম্যুনিজম সোস্যালিজম্ introduce (প্রবর্ত্তন) করবে না?

নরেনদা—ওদের যেমন ছক কাটা আছে, সেইটেই ভাল লাগে। ওরা ব্যক্তিবাদ দিয়ে সমষ্টির সমস্যার সহজ সমাধান করতে চায়। সেইটেই তাদের মনে ধরে। Indo-Aryan socialism (আর্য্য ভারতীয় সমাজতন্ত্র) তাদের তত প্রীতিকর মনে হয় না।

এরপর ব্রজেনদা (চক্রবর্ত্তী) এসে সাতক্ষীরায় তাঁর arrest (গ্রেপ্তার) এবং পাকিস্তানী পুলিসের বিকট দুর্ব্যবহারের কথা বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সব কথা শুনে নরেনদার দিকে তাকিয়ে বললেন—বল, এ সবের solution ( সমাধান ) কী? Dharma can solve this but so-called politics can not ( ধর্ম্ম এর সমাধান করতে পারে, কিন্তু তথাকথিত রাজনীতি পারে না )।

এরপর নরেনদা কাশীদার সঙ্গে কথাচ্ছলে বললেন—আমরা সবাই পাশ্চাত্ত্যভাবে ভাবিত, ওদের জিনিসগুলি যেমন ছককাটা আছে, তাই নিই। আমাদের জিনিস ছককাটা নেই, আর জানিও না তা।

শ্রীশ্রীঠাকুর আবেগদৃপ্ত কণ্ঠে বললেন—তোমার যে ছক তা বের করলে কবে? তা তোমার পকেটেই আছে। বের করে দেখ যদি তা কম্যুনিজম, সোস্যালিজমকে fulfil ( পরিপূরণ ) না করে, তোমাদের প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য সহ ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনকে সামঞ্জস্যে নিয়ন্ত্রিত না করে, নিও না তা, কম্যুনিজমই ধর। যেটা কঠিন সেটা বুঝতে এবং প্রয়োগ করে বিফল হতে চেষ্টা করি, কিন্তু যেটা সহজ সেটা বুঝতে এবং প্রয়োগ করতে চেষ্টা করি না, এই আমাদের স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে। তোমাদের ছকটা পকেট থেকে বের করে দেখলেই ত পার।

নরেনদা—গুরু নেই, পথ দেখায় কে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা করতে গেলে, গুরু হওয়া লাগবে তোমাদের। গুরুর সন্ধান করে, তাঁকে গ্রহণ ও অনুসরণ করে তোমাদের নিজেদের জীবনে তাঁকে প্রতিফলিত করে সবার কাছে তুলে ধরা লাগবে।

১৭ই মাঘ, রবিবার, ১৩৫৫ ( ইং ৩০।১।৪৯ )

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে গোলতাঁবুতে আসীন। কাশীদা ( রায় চৌধুরী ) ও অশোকদা ( রায় ) শ্রীশ্রীঠাকুরের সামনে বসে যাজন সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মানুষকে manipulation ( নিয়ন্ত্রণ ) এর

ভিতর দিয়ে আদর্শে উন্নীত করে তোলাই যাজন। যাজন এসেছে যজ্ ধাতু থেকে, যজ্-ধাতু মানে সম্বর্দ্ধনা। অনুরাগের উৎসারণায় ইষ্টে সম্বর্দ্ধিত বা সমুন্নত করে তোলাই যাজনের প্রাণ। একে Psycho-therapy (মানসিক চিকিৎসা) ও বলতে পার। ইষ্টানুরাগের ভিতর দিয়ে যাবতীয় মানসিক ক্ষত ও ব্যাধির নিরসন হয়, তাতে শরীরও তাজা হয়ে ওঠে। যাজনে যেমন অপরের ভাল হয়, তেমনি নিজেরও ভাল হয়। এতে অনেক কিছু বোধ নূতন করে ফুটে ওঠে, পরিষ্কার হয়। যা' বলেছি বা শুনেছি অথচ feel (বোধ) করি নি, তা feel (বোধ) করা যায়, এতে সেই বোধ চরিত্রে প্রতিফলিত হয়, তাতে মানুষ বড় হয়ে ওঠে—সদ্গুণের বিকাশের ভিতর দিয়ে। তিনটে জিনিস একসঙ্গে চাই—তা হল যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি। যজন মানে নিজেকে ইষ্টীপূত করে তোলা--মননে, করণে; যাজন মানে পরিবেশকে ইষ্ট চেতনায় সম্বুদ্ধ ও সম্বৃদ্ধ ক'রে তোলা; ইষ্টভৃতি মানে জীবন-উৎসকে পুষ্ট করে নিজের ইষ্টানুরাগকে প্রতিদিন আরো আরো সঞ্জীবিত ও সন্দীপ্ত করে তোলা। যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি ঠিকভাবে করলে চরিত্র স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী ইষ্টের ভাবে রঙিল হ'য়ে উঠবেই। এমন-কি, চেহারার মধ্যেও একটা দেবভাবের দীপ্তি ফুটে ওঠে।

অশোকদা—রামকৃষ্ণদেব যেমন বলেছেন—রাজাবাবুর সঙ্গে আগে পরিচয় হওয়া দরকার, তখন তা'র ঐশ্বর্যের পরিচয় আপনিই পাওয়া যায়। তাই, ইষ্টের ভাবধারার চাইতে ইষ্টের সঙ্গে পরিচিত করানই ত বেশি প্রয়োজন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেখানে যে ভাবে হয় সেখানে সেইভাবে। মানুষের inferiority (হীনমন্যতা) থাকে। তাই গীতায় আছে, শ্রদ্ধাহীন অসূয়াপরায়ণ লোককে আমার কথা বলবে না। সুতরাং তোমার কথাবার্ত্তা, ব্যবহারে যতক্ষণ একজন তোমার প্রতি সশ্রদ্ধ ও অনুরক্ত না হয় ততক্ষণ তুমি তার কাছে তোমার ইষ্টকথা বলতে যাবে না। অনেক সময় idea (ভাব) গুলি ভাল লাগে বলেই তার উৎসের দিকে নজর যায়। আবার বিপরীতভাবেও

হয়। এর কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই। যে যেমন, তার ক্ষেত্রে তেমন।

১৯শে মাঘ, মঙ্গলবার, ১৩৫৫ (ইং ১।২।৪৯)

রবিবার দুপুরের পর থেকে গতকাল রাত পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর খুব খারাপ ছিল। শরীরে ব্যথা. মাথাধরা, জ্বর জ্বর ভাব ইত্যাদি লেগেছিল। সেই অবস্থায় গতকাল অনেক বাণী দিয়েছেন। আজ সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর গোলতাঁবুতে আছেন। সুবোধদা (সেন),কাশীদা (রায় চৌধুরী), অশোকদা (রায়), প্রবোধদা (মিত্র), ব্যোমকেশ (ঘোষ) প্রভৃতি উপস্থিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রফুল্লকে বললেন—সুবোধের মাথা সাফ আছে। ওকে ইদানীংকার কতকগুলি বাণী পড়ে শোনা ত'। সুবোধদার দিকে চেয়ে বললেন—Controversial point (বিতর্কমূলক কথা) থাকলেও দেখিস্ আমার বক্তব্য rationally adjusted (যুক্তিগতভাবে বিনায়িত) আছে কিনা।

বাণী পড়া হচ্ছিল। সেই প্রসঙ্গে সুবোধদা বললেন—বর্ণভাঙ্গার চেষ্টাই ত আজ হচ্ছে, সেটা ঠিক রাখা যায় কি করে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিজেদের ক্ষতি না করে বর্ণ ভাঙ্গা যায় না। তা' ভাঙ্গা মানে বৈশিষ্ট্য annihilate (ধ্বংস) করা। ভাঙ্গলে for ever (চিরকালের জন্য) তা যাবে, আর পাবে না। প্রত্যেকটা বৈশিষ্ট্যের বিধিমাফিক উৎকর্ষ করতে পার। সেইটেই স্রষ্টার মনোমত ব্যবস্থা। এক একটা গুণ বিশেষ এক এক রকমের। ধরো পাঁচ রকমের গোলাপ আছে। বৈশিষ্ট্যগুলো ভেঙ্গে দিলে। বিশেষ বৈশিষ্ট্যহীন জগাখিচুড়ী একধরনের গোলাপে পরিণত করলে সেগুলিকে, তা'কে জারজ বললেও ভুল হয় না। গন্ধ থাকতেও পারে, নাও পারে, বর্ণের সে বৈচিত্র্য থাকবে না। আলাদা আলাদা পাঁচ রকমের বর্ণ, গন্ধ, আকার ও উপযোগিতা যা' পেতে তা খোয়ালে। তোমরা কও, রকমারিই ভাল, প্রত্যেকটিরই বৈশিষ্ট্য আছে। প্রয়োজনও আছে। ওরা বলে, অতোরকমে কাম কি? কিন্তু বৈচিত্র্যই ত সৃষ্টির সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্য। ল্যাংড়া, হিমসাগর, গোলাপখাস,

ফজলি এর প্রত্যেকটার বিশিষ্ট স্বাদ আছে, গন্ধ আছে, উপকার আছে, রকমারিগুলি ভেঙ্গে একশা করে ফেললে সেগুলি পাবে কোথা থেকে ? সব রসকে যদি একমাত্র তাড়ি করার কাজে লাগাও, নলেনগুড়ের স্বাদ পাবে কি করে ? লাল গোলাপ, সাদা গোলাপ কোনটা ভাল, কোনটা মন্দ, এমনতর নয়। প্রত্যেকটাই বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। বিপ্ররা সাত্বত সেবা নিয়ে থাকত, জাতিকে শিক্ষা দিত। ক্ষত্রিয়রা ছিল রক্ষক, বৈশ্যরা কৃষি, ব্যবসা, বাণিজ্য করত, শূদ্ররা কায়িক শ্রম দিত। সমাজ সবাইকেই যথাযোগ্য সম্মান দিত। বিপ্র-ক্ষত্রিয় মানে লাটবহাদুর হয়ে যাওয়া নয়। আজও যে তাদের অতখানি মানে, তার কারণ হলো তাদের পূর্ব্বপুরুষদের অতোখানি করা আছে। যার করা যত মূল্যবান, সমাজে তার মূল্যও তত বেশী। সৈন্যদলে instinct ( সহজাত সংস্কার ) এর test ( পরীক্ষা ) ক'রে ঢোকায়। বর্ণাশ্রম ঠিক থাকলে যোগ্যতা মাপাই থাকে। বিয়ে খাওয়ার মিলের ব্যাপারেও অনেকখানি ধরা যায় বংশের বিচার করে। অবশ্য তাইই সব নয়। ব্যক্তিগত প্রকৃতির দিক দিয়েও মিল থাকা চাই। সদ্বংশজাত বিপ্র পাত্র ও করণীয় ঘরের বিপ্র কন্যা হলেই যে বিয়ে হতে পারে তার কোন মানে নেই। শুনেছি পাশ্চাত্ত্য দেশেও আজকাল ছেলেমেয়ের বিয়ের compatibility ( সঙ্গতিশীলতা ) test ( পরীক্ষা ) করার বিশেষ বিশেষ বৈজ্ঞানিক প্রথা বেরিয়েছে।

কাশীদা—সময় সময় কোথাও কোথাও বিবাহের অনিবার্য্য প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা হতে পারে, কিন্তু যাই করি, এটা যাতে sacrificed (পরিত্যক্ত) না হয় তা দেখতে হবে।

২০শে মাঘ, বুধবার, ১৩৫৫ (ইং ২।২।৪৯)

সুবোধদা (সেন), শ্রীশদা (রায় চৌধুরী), হরিদা ( গোস্বামী ) প্রভৃতি সকালে গোল তাঁবুতে শ্রীশ্রীঠাকুরের সংঙ্গে প্রাচীন সংবিধান সম্বন্ধে আলোচনা করছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আগে ছিলেন কুলপতি, গোষ্ঠীপতি, গ্রামাধিপতি, দশ-গ্রামাধিপতি ইত্যাদি। বিভিন্ন বর্ণের প্রধানগণ থাকতেন। আর সবটার উপরে থাকতেন বশিষ্ঠ, বৈশিষ্ট্যবান শ্রেষ্ঠপুরুষ, তিনি হতেন রাষ্ট্রপতি। রাজা থাকলেও সপরিষদ রাষ্ট্রপতির অনুশাসন তাঁকে মেনে চলতে হ'তো। বিভিন্ন স্তরের নেতা canvassing ( ভোটপ্রার্থনা )-এর ভিতর দিয়ে ঠিক করা হতো না। এটা নির্ভর করতো নিঃস্বার্থ সেবার উৎকর্ষের উপর। চরিত্র ও যোগ্যতার স্বতঃস্ফূর্ত স্বীকৃতি ছিল। আজে-বাজে লোক টাকা বা গলাবাজীর জোরে পাত্তা পেত না। রাজা ছিল বর্ণাশ্রমের ধারক, বাহক ও রক্ষক। বর্ণাশ্রম ঠিক থাকলে সমাজ অর্থনৈতিক, নৈতিক সব দিক দিয়েই সুশৃঙ্খল থাকে। দীক্ষা, শিক্ষা, জীবিকা, ব্যবসা, কৃষি, শিল্প, পারস্পরিক সহযোগিতা, সামাজিক শাসন সব অব্যাহত থাকে।

আগামীকাল সরস্বতী পূজা। সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর গোলতাঁবুতে বিছানায় শুয়ে আছেন। শরীর ভাল নয়। পূজনীয় কাজল ভাই, মেণ্টুভাই, খগেনদা (তপাদার), মোহনভাই (ব্যানার্জী), দেবুদা (বাগচী), কালিদাসীমা, সুশীলাদি (হালদার), হেমপ্রভামা প্রভৃতি আছেন ।

শ্রীশ্রীঠাকুর সরস্বতী শব্দের ধাতুগত অর্থ দেখতে বললেন। অভিধান থেকে দেখা গেল এর মুলে আছে সৃ-ধাতু। সৃ-ধাতু মানে গতি, আস্তরণ।

তখন শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সরস্বতী মানে গতিতে যার আলয় বা আবাস। সদাই গতিশীল অর্থাৎ চলে যা' তা বায়ু। বায়ুতে আবাস যার, তা হ'লো ব্যোম। ব্যোমস্তরে আছে vibration অর্থাৎ কম্পন। তাই বলে বীণাপাণি। ব্যোম অর্থাৎ vibration থেকেই শব্দ অর্থাৎ বাক্, তাই বলে বাগ্দেবী।

খানিকটা আগে শ্রীশ্রীঠাকুর গোঁসাইদাকে ডেকে সুবোধদার উপ-নয়নের ব্যবস্থা করে দেবার কথা বলাতে গোঁসাইদা বললেন—টাকা পয়সার ত দরকার, ওর ত কাল সব চুরি হ'য়ে গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—চুরি হয়েছে তাতে কী হয়েছে? চুরি হয়েছে, আমরা ত আছি। না, আমরাও চুরি হয়ে গেছি? আপনি ত আছেন। করে

ফেলেন। ওর একটা ব্যবস্থা হয়ে গেলে আমার একটা চিন্তা যায়। বামুনের বাচ্চা—এতদিন হয় নি। ও বরাবর কত করেছে আর আজ ওর এই বেকায়দায় আমরা থাকতে ওর এজন্য ভাবা লাগবে কেন? আপনি যেমন আছেন, আমিও ত আছি।

সুবোধদা—আপনি দয়া করে কিছু দেবেন না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোরা সবাই ত আমার ছাওয়ালের মত। ও সব ভাবিস্ কেন? আর এমনিই হয়ে যাবি নি। সবাই ত তোর।

২১শে মাঘ, বৃহস্পতিবার, ১৩৫৫ (ইং ৩।২।৪৯)

সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর গোলতাঁবুতে উপবিষ্ট। কেষ্টদা ( ভট্টাচার্য্য ), সুবোধদা (সেন) প্রভৃতি আলোচনা করছিলেন—Biological superiority-র ( জৈব উৎকর্ষের ) standard ( মানদণ্ড ) কী হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Admiration for superior, will power, adherence, tendency towards unity, presence of mind, sympathy, power of resistance, cautious inquisitiveness, intelligence ( শ্রেয়র প্রতি শ্রদ্ধা, ইচ্ছাশক্তি, নিষ্ঠা, ঐক্যপ্রবণতা, উপস্থিত বুদ্ধি, সহানুভূতি, প্রতিরোধ ক্ষমতা, সতর্ক অনুসংধিৎসা, বুদ্ধি ) এই কটার মাপকাঠিতে higher biological efficiency ( উচ্চতর জৈব দক্ষতা ) determine ( নির্দ্ধারণ ) করা যায়। শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা থাকলে আর সবগুলি আসে। Inferiority complex ( হীনমন্যতা ) থাকলে অন্য সবাইকে সরিয়ে বড় হ'তে চায়, আর কেউ তার সমকক্ষ বা তার চাইতে বড় হোক তা বরদাস্ত করতে পারে না। সে চায় সবাই তার অনুগত ও অধীন থেকে তার একচ্ছত্র আধিপত্য মেনে নিক। সে চায় এমনতর ঐক্য, যেখানে সবাই তাকে সর্বেসর্ব্বা বলে মেনে নিতে প্রস্তুত। এর যেখানে ব্যত্যয় ঘটে, সেখানে সে দুর্ব্বাসার মত ক্রোধে আত্মহারা হয়ে ওঠে। সে সবার সঙ্গে মিলে মিশে একাত্ম হয়ে চলতে পারে না। কার ego ( অহং ) কতখানি untussling ( নির্ব্বিরোধ )

অথচ unyielding with regard to principle ( আদর্শের ব্যাপারে অটল ) তাই দেখে বোঝা যায় তার personality ( ব্যক্তিত্ব ) কতখানি developed ( উন্নত )।

২২শে মাঘ, শুক্রবার, ১৩৫৫ (ইং ৪।২।৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে গোলতাঁবুতে। কেষ্টদা ( ভট্টাচার্য্য ), শচীনদা (গাঙ্গুলী), প্রবোধদা (মিত্র) প্রভৃতি কাছে আছেন।

শচীনদা বললেন—আপনি বলেন সগোত্রে বিয়ে হয় না, কিন্তু পণ্ডিতরা ত বিধান দেন—শাণ্ডিল্য গোত্রের মেয়েকে যদি ভরদ্বাজ গোত্র পোষ্যপুত্রী গ্রহণ করেন, তখন তাকে শাণ্ডিল্য গোত্রের ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধরুন, আমার হয়ত ছেলে নেই, আপনি আমার ছেলের স্থলাভিষিক্ত হ'তে পারেন, কিন্তু in flesh and blood ( রক্ত মাংসে ) আপনি আমার ছেলে হলেন না। আপনি আপনার বাপেরই ছেলে থাকলেন। তাঁর গোত্র ও রক্তই আপনাতে রইল, তার পরিবর্ত্তন হলো না। তাই legal right ( আইনগত অধিকার ) পেতে পারেন, কিন্তু biological rights (জৈব সংস্থিতির অধিকার) পাবেন কি করে ? ও ভাবে গোত্রান্তরিত ক'রে বিয়ে চলে না, পণ্ডিতরা যাই বলুন। লৌকিক বিধান যদি সুবিধাবাদের খাতিরে বিজ্ঞানকে উপেক্ষা করে, তা সমর্থন-যোগ্য নয়। অন্ততঃ আমার মত এমনতর।

এরপর হাউজারম্যানদা, হেনরী, শ্রদ্ধেয় অশোকভাই ( চক্রবর্ত্তী ) প্রভৃতি আসলেন। যুদ্ধের সময় ফ্রান্সের সমাজের নিম্নস্তরে অবিহিত যৌন সম্মিলন ব্যাপক আকারে সংঘটিত হওয়ায় সেখানকার নৈতিকমান অত্যন্ত নেমে গেছে সেই সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল।

প্রসঙ্গক্রমে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—জহরলাল বলেন—I am a brahmin by accident ( আমি আকস্মিক ভাবে ব্রাহ্মণ ) কিন্তু These accidents always regulate the incidents of life

according to the urge to exist (এই সব আকস্মিকতা বাঁচার আকুতি অনুযায়ী জীবনের ঘটনাগুলিকে সর্ব্বদা নিয়ন্ত্রিত করে)।

এরপর অশোকভাই আবার বললেন—যুদ্ধের সময় মানুষের দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে তাদের নীতিবিরুদ্ধ কর্ম্মে প্ররোচিত করা হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যারা প্রলুব্ধ হয় তারা poor (দরিদ্র) নয়, pauper (দারিদ্র্যব্যাধিগ্রস্ত)। যাদের শুভ সংস্কার ও রক্তকৌলিন্যের দৈন্য থাকে, তারা ধনী হলেও দারিদ্র্যব্যাধিগ্রস্ত হয়, তারা প্রলোভনের মুখে পড়লে নিজেদের আর সামলাতে পারে না।

এরপর কাগজ পড়া হচ্ছিল। আজ কাগজে বাঘা যতীনের কথা ছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এঁরা সব অসাধারণ মানুষ ছিলেন। তাঁদের হৃদয়ের কাছে গেলে মানুষের প্রাণের তৃষ্ণা নিবারণ হতো। আমি তাঁকে কোনদিন দেখি নি। তবে তাঁর কথা খুব শুনেছি। বাড়ী ছিল কুষ্ঠিয়ার কাছে।

অরুণ (জোয়ার্দ্দার)—একবার দুর্ভিক্ষে খেতে না পেয়ে হরিণ মাথা উঁচু করে খাবার সংগ্রহের চেষ্টা করতে করতে নাকি জিরাফ হয়ে দাঁড়ালো?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দুর্ভিক্ষ বলে ত কথা নয়, সাধারণতঃ মাথা উঁচু করে খেতে চেষ্টা করত, ঐ urge (আকুতি) থেকে তদনুপাতিক functional adjustment (ক্রিয়াগত বিন্যাস) হলো, ওদের পুরুষ ও স্ত্রীজাতির শুক্র ও ডিম্বকোষও ঐ ভাবে অভিষিক্ত হলো। এই ভাবে ধীরে-ধীরে পরিবর্ত্তন হলো।

একটা পাখী অদূরে শব্দ করছিল। সেইটে লক্ষ্য করে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আগে কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে পাখীদের ভাষা শেখান হতো।

অরুণ—পাখীদের ত মানুষের মত যুক্তিতর্ক-করার ক্ষমতা নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাদের তাদের মত আছে।

অরুণ—আজকালকার ছেলেরা সিনেমার বিয়োগান্ত ও ব্যর্থতামূলক দুঃখদায়ক ছবি দেখতে খুব পছন্দ করে, তাতে ত কত খারাপ হয়।

স্নায়ুগুলির প্রসারণ না হয়ে সঙ্কোচন হয়। আমার মত আমি বলি, বোঝাই, কিন্তু শোনে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষকে প্রীতির সঙ্গে বারবার বলতে হয়, বোঝাতে হয়। তাদের মুখ দিয়েই বারবার ভাল বিষয়ে হ্যাঁ করিয়ে নিতে হয়। পরে হ্যাঁ-ই করবে। সর্ব্বদা পিছে লেগে থেকে যুক্তিযুক্তভাবে বোঝাতে পারলেই হয়। তবে তোমার চরিত্র, সেবা ও আচরণ যেন এমন হয় যাতে তোমাকে অন্তরের সঙ্গে ভালবাসে ও শ্রদ্ধা করে।

প্রফুল্ল—সব সময় সব অবস্থার মধ্যে অবিচলিত পূর্ণ আনন্দ-বোধ বজায় থাকে কি ভাবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অবিচলিত উদ্দাম ইষ্টমুখী আবেগ যত থাকে তত ঐটে হয়।

প্রফুল্ল—পারিপার্শ্বিক অবস্থা যে মনকে চঞ্চল করে তোলে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—চঞ্চলতা আসে আবার immediately (তৎক্ষণাৎ) adjust (নিয়ন্ত্রণ) করে নেয়।

প্রফুল্ল—তা হলে oscillation (দোলায়মানতা) ত গেল না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মনটাই যে oscillation (দোলায়মান থাকার অবস্থা)। আমার মনটা আগে নিরবচ্ছিন্নভাবে মাতাল হয়ে থাকতো। মা'র অসুখের আগে পর্যন্ত অমন ছিল। তার পর থেকে মন আঘাতপ্রবণ হয়ে গেছে। আমার আর একটি ধাঁজ আছে, কারও বিষয়ে খারাপ কিছু বুঝলেও স্বীকার করি না, স্বীকার করলে মনে হয় নিজেই যেন প্রতারিত হয়ে যাচ্ছি, অবশ্য তার নিরাকরণের জন্য চেষ্টার ত্রুটি করি না।

জনৈক্য মা পারিপার্শ্বিকের দুর্ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে অনেকের সম্বন্ধে নানাপ্রকারের অনুযোগ-অভিযোগ করছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর ধীরভাবে মনোযোগ সহকারে নীরবে তার সব কথা শুনে গম্ভীরভাবে বললেন—তোর মনের নম্রতা কমে গেছে, হীনমন্যতা জেগেছে। অহং প্রবল হয়েছে, তাই সইতে বইতে পারিস্ না আর তাতে করে মন ও সেই সঙ্গে সঙ্গে শরীরও খারাপ হয়ে যাচ্ছে। সহজে

অন্যকে ভুল বুঝলে নিজের উপরও অবিচার করা হয়। এতে জীবন দুঃখময় হয়ে ওঠে। তোর মত অন্যেরও প্রকৃতিগত দুর্ব্বলতা আছে। জীবনের জ্বালা আছে, তোর মত অপরেও প্রকৃতি, প্রবৃত্তি ও পরিস্থিতির চাপে পড়ে ভুল করে ও কষ্ট পায় ও দেয়। অপরের খুঁত বেশী করে না ধরে যথাসম্ভব উদারতার সঙ্গে উপেক্ষা করতে হয় আর নিজের ছোটখাট ভুলত্রুটিগুলিও তৎক্ষণাৎ ধরতে ও শোধরাতে অভ্যস্ত হতে হয়। এতে লাভ আছে।

একটু থেমে হেসে বললেন—আপ ভালা ত জগৎ ভালা। সুন্দর হও, মিষ্টি হও, তোমার কাছে সবাই শান্তি পাক। তখন সবাই তোমাকে ধন্য ধন্য করবে।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর গোলতাঁবুতে কেষ্টদাকে বলছিলেন—পঞ্চবর্হি ও সপ্তার্চ্চি দেওয়া হয়েছে, এতে সূত্রাকারে প্রধান পালনীয় নীতিগুলি মানুষের মাথায় থাকবে, এইভাবে আরো কিছু আর্য্য সত্য ঠিক করে দিতে হয়।

পারিবারিক জীবনের কথা বলতে গিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বড় বৌয়ের মত মানুষই দেখি না, আমার খুব শ্রদ্ধা হয়। রামকৃষ্ণদেবের স্ত্রী মা-ঠাকরুন যেমন ছিলেন কতটা সেই ধাঁজের। আমার বিয়ে হয়েছে সেই আঠারো বছরে। তারপরে এ পর্য্যন্ত আমার তার সঙ্গে কোনটা নিয়ে বাধেই নি প্রায়। কার কথামত বাড়ীর ভিতরের গাব গাছটা কেটেছিল, সেইদিন আমার রাগ হয়েছিল। তা ছাড়া আমার মনে কোন ব্যথাই দেয় নি। কংসরাজার খেয়ালের মত কত হুকুম চালিয়েছি, হাসি-মুখে সুখে করেছে, সন্তপ্ত হয়ে নয়। আমি চলে গেলে এর টেকা মুস্কিল, তবে বড় খোকা এত বিবেচক এই যা ভরসা। কাজলও চমৎকার। ভগবান করুন এরা বেঁচে থাকে। সুস্থ থাকে।

হাউজারম্যানদা—প্রফেটরা কি বিভিন্ন শ্রেণীর এবং বিভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে আসেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Prophets fulfil the need of the age as

they think apt (প্রেরিত পুরুষেরা যেমন সমীচীন মনে করেন, সেইভাবে যুগের প্রয়োজন পূরণ করেন)। যেমন তুমি আমার কাছে দেওঘরে আছ—এখানকার উপযোগী কাজ নিয়ে আছ, কলকাতায় গেলে বললাম একখানা জীপ এনো। এক এক সময় এক এক কাজ করছ, সবই আমার জন্য। প্রফেটরা ঈশ্বরের প্রেরিত, commissioned by God (ঈশ্বরের আদিষ্ট)। তাঁদের পাঠান যখন যেমন প্রয়োজন হয়। তাঁরা কাজ করেন universal law (বিশ্বজনীন নীতি) এর সঙ্গে যোগ রেখে।

যেমন বুদ্ধদেব যখন এসেছিলেন, তখন দেবতার কাছে নৃশংসভাবে জীব বলি দিত। শুনেছি মানুষ পর্য্যন্ত চুরি করে নিয়ে বলি দিত। তিনি প্রথম বুলি ধরেন—'জীব হিংসা করো না'। পূর্ব্ববর্ত্তীকে ঠিক রেখে অহিংসাকে মুখ্য করে বাণী ও নির্দেশ দিতে লাগলেন। "Not to destroy life"—was prime Dharma with him. ('জীবন নাশ করো না'—এইটেই ছিল তাঁর কাছে মুখ্য ধর্ম্ম)।

হাউজারম্যানদা—পুনর্জ্জন্ম না হওয়াটাকে কি তিনি goal (উদ্দেশ্য) বলে মনে করতেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পুনর্জ্জন্ম না হওয়া মানে to achieve peace and immortality so that man can be fulfilled in God meaningfully (শান্তি ও অমৃতত্ব লাভ করা যাতে কিনা মানুষ ঈশ্বরে সার্থকভাবে পরিপূরিত হতে পারে)। শান্তি ও অমৃতের কেন্দ্রকে পূরণ করাই চাই। শান্তি ও অমৃতত্ব পেলাম, কিন্তু উপভোগ করার যদি কিছু না থাকে, তবে extinct & inert (নিঃশেষ ও নিথর) হয়ে যাব। কি ভাবে উপভোগ করব ? উপভোগটা তাঁকে সার্থকভাবে পরিপূরণ করা চাই। তুমি আমার এখানে বড়খোকার কাছে শান্তিতে আছ। কিন্তু তোমার যদি ইষ্টার্থসার্থকতায় তাকে পূরণ করে তাকে সক্রিয়ভাবে উপভোগ করার বুদ্ধি না থাকে, তবে ধীরে ধীরে ঐ শান্তি sterile (বন্ধ্যা) হয়ে উঠবে। ইষ্টার্থপূরণী ধান্ধা থাকলে শান্তি ও অমৃতত্ব নিষ্ফল হয়ে যায় না,

সুফল প্রসব করে চলে অনন্তকাল,—আসক্তি ও বন্ধনকে এড়িয়ে। আত্মস্বার্থ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার খেয়াল ত্যাগ করে ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠার্থে চলাটাই মুক্তি ও প্রকৃত শান্তি।

হাউজারম্যানদা—শান্তির মধ্যে উপভোগ কোথায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—শান্তি মানে স্থিরতা, অমরতা মানে to be out of death ( মৃত্যুর পারে যাওয়া )। কেউ যদি এইগুলি নিয়ে থাকে, অথচ সেই থাকা যদি কেন্দ্রকে সার্থকভাবে পূরণ না করে, থাকাটা নিথর হয়ে যায়। বৈষ্ণব দর্শন এই তত্ত্বটা ঠিকভাবে তুলে ধরেছে। বৈষ্ণবরা নিথর শান্তি চায় নি। তারা চালাক ছিল। তারা অনন্তকাল উপভোগ করতে চেয়েছে তাঁকে with eternal conscious remembrance ( শাশ্বত সচেতন স্মৃতি নিয়ে )।

হাউজারম্যানদা—শান্তির জন্য শান্তি জিনিষটা কি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেটা শান্তি নয়। জ্বরের সঙ্কটের পর গভীর নিদ্রা সেটা শান্তি নয়। শান্তিতে conscious ( সচেতন ) থাকা চাই with a conscious go to serve the Ideal. ( আদর্শসেবার সচেতন চলন নিয়ে )। যত সুনিষ্ঠ হব সক্রিয়ভাবে, তত বাইরের আবহাওয়া সাম্যহারা করতে পারবে কম। That is the entrance gate of kingdom of peace. ( সেইটে শান্তিরাজ্যের তোরণদ্বার )। সেই জন্য ক্রাইস্ট বললেন—"Blessed is he who is not repelled by anything in me." ( যে আমার কোন কিছুর দ্বারা প্রত্যাহত হয় না, সেইই ধন্য )। এমনতর ভক্তের জীবনে তিনি প্রধান হয়ে থাকেন। There is no thirst for self but there is desire to have much for Him. There is difficulty, but peace. ( নিজের জন্য কোন তৃষ্ণা থাকে না। কিন্তু তাঁর জন্য অনেক কিছু চাওয়া থাকে। কঠোর ক্লেশ থাকে, কিন্তু শান্তি থাকে )।

হাউজারম্যানদা—Peace ( শান্তি ) না থাকলে ত মানুষ ইষ্টকাজই করতে পারবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অপ্রীতিকর অবস্থার চাপে পড়ে যদি কেউ ইষ্টকাজ ও ইষ্টচলন থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে, বুঝতে হবে তার সত্তার একটা portion ( অংশ ) তখনও self-centric ( আত্মকেন্দ্রিক ) হয়ে আছে। সেটা কেটে গেলে মানুষ সব অবস্থার মধ্যেই সাধ্যমত ইষ্টকাজ ক'রে চলে, কখনও তীব্রগতিতে, কখনও ধীরে। ইষ্টকাজে উৎসাহ যত বাড়ে স্থিরতাও তত বাড়ে, unbalanced stage ( সাম্যহারা অবস্থা ) ও তত কেটে যায়, এটা ধীরে-ধীরে হয়। কষ্টের মধ্যে নিষ্ঠা যত তাজা থাকে, তত মানুষ bloomy and alive ( প্রস্ফুটিত ও উজ্জীবিত ) থাকে।

প্রফুল্ল—শান্তির জন্য শান্তির সন্ধান কার্য্যকরী হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—না! সক্রিয় ইষ্টানুরাগের ভিতর দিয়ে আপনা আপনি আসে।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর বাণী দিলেন ঃ—

শান্তি যদি আত্মনিবেদনে
উদ্‌গ্রীব হ'য়ে না ওঠে,
সে শান্তি মূঢ়ত্বেরই নামান্তর।

হাউজারম্যানদা—Unrepelling attachment (অচ্যুত অনুরাগ) প্রত্যেকেরই হ'তে পারে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয়—It is given to every man. ( এটা প্রত্যেককেই দেওয়া থাকে )। ইচ্ছা থাকলেই ফুটে ওঠে।

হাউজারম্যানদা—ইচ্ছা করে না সবার ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আবোলতাবোল করে, তা করে আর কষ্ট পায়। কাম-ক্রোধ ইত্যাদি প্রবৃত্তি অব্যাহত রেখে তা আয়ত্ত করতে চায় according to the call of complexes ( বৃত্তির আহ্বান-অনুযায়ী ), যা কিনা ঐভাবে লাভ করা কখনও সম্ভব নয়। হয়ত লোভের তাড়নায় মুর্গী কাটছে এবং তাকেই কত রকমারিভাবে সমর্থন করছে। ভাবের ঘরে চুরির কি অন্ত আছে ? তবে unrepelling attachment ( অচ্যুত অনুরাগ ) এর কথা বেশী ভাবতে না গিয়ে নিরন্তর শ্রেষ্ঠকে নিয়ে

actively engaged ( সক্রিয়ভাবে ব্যাপৃত ) থাকতে থাকতে যা হবার তা হতে থাকে। ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠা চাওয়া এবং তার অন্তরায়ী প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় দিয়ে চলা—এ দুটো একসঙ্গে চলে না।

কেষ্টদা—এর ফয়দা কি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই টানটা জীয়নকাঠির মত। একটু এদিক-ওদিক হলে প্রাণ হাহাকার করে ওঠে।

কেষ্টদা—বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণকে পেয়েছিলেন, তিনি যে দর্শন বলে গেলেন, আজও ত মানুষ সেই সব তত্ত্বালোচনাকে মুখ্য করে চলছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তত্ত্ব বাদ দিয়েও আবার হয় না। আমি যেমন আমার অভিজ্ঞতা ও অনুভুতির উপর দাঁড়িয়ে কত কথা বলি। অনুভূতি সমন্বিত ব্যক্তি ও তত্ত্ব দুইই দরকার।

কেষ্টদা—কারণমুখীনতার চরমে ত না থাকার ইচ্ছা এসে পড়ে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওর মধ্য দিয়েও তাঁকে নিয়ে থাকার ইচ্ছা কাজ করে। সব অবান্তর বাসনা লোপ পেয়ে একটা আকুল আবেগ থাকে প্রিয়কে নিয়ে তন্ময় হয়ে চলার। আমি যেমন হঠাৎ হঠাৎ অজান্তে মাকে ডাকি। থাকাটার সার্থকতার জন্যই তাঁকে দরকার।

রাত্রে ব্রজেনদা ( চ্যাটার্জি ) বাইরে যাওয়ার জন্য বিদায় নিতে এসেছেন। ব্রজেনদা প্রণাম করে উঠে দাঁড়াবার পর শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে বললেন—আপনারা ঋত্বিকী না করে ফেলতে পারলে হচ্ছে না। সবাই ইচ্ছুক আছে। প্রত্যেকে কতখানি ত্যাগ করতে রাজী। রবির চিকিৎসা করলো যজমানরা মিলে। হালে কলকাতা দেওঘর এক ক'রে ফেলেছিল।

ঋত্বিকী করালেই করে। বরং খারাপ হয় কারও কাছ থেকে টাকা নিয়ে কথা খেলাপ করলে। আমরা আগে বাইরে বেরুবার সময় কিছু নিয়ে বেরুতাম না। কত বিরাট দল নিয়ে চলতাম। মানুষের সঙ্গে ভাব করে পথে-পথেই সব যোগার হ'তো। মানুষ অন্তরাসী হয়ে উঠতো।

ছাড়তে চাইতো না। কত করত কত দিত। আজকাল জনসাধারণকে satsang-minded ( সৎসঙ্গ-ঝোঁকা ) ক'রে তোলা হয় কম। আমি একা করি নি। কিশোরী, মহারাজ ওরাও করেছে। কত জায়গায় সদলবলে ঘুরেছে। রাধারমণরা ৮৷১০ জন টিউবওয়েল করতে গেছে। কিছুই নেবে না, তিন টাকা জোর করে দিয়েছি। পরে সেই সঙ্গে আরও ফিরিয়ে এনে দিয়েছে, সে-টাকায় হাত দেয় নি। যখন কাজ সেরে আসে, ৪০৷৫০ জন বেটাছেলে মেয়েছেলে কাঁদতে-কাঁদতে পিছে-পিছে কতদূর এসেছে। ইষ্টার্থে করলে, নিলে, ছড়িয়ে আছে। মানুষ খুশী হ'য়েই দেয়। দিয়েই তৃপ্তি পায়। ধন্য বোধ করে। সবাই কিন্তু আপনাদের সুহৃৎ। "ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি।" আপনারা নিতে জানেন না। মানুষ দিতেই চায়। তার কৌশল হচ্ছে "ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা। নিরাশীর্নির্ম্মমো ভুত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥"

এরপর নৈহাটির জনৈক দাদা শ্রীশ্রীঠাকুরকে বললেন—যখন ভাল সঙ্গে থাকি, বেশ থাকি, কিন্তু অন্য পরিবেশে গেলে মনের সে অবস্থা থাকে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে তারা তোমাকে influence ( প্রভাবিত ) করে, তুমি তাদের influence ( প্রভাবিত ) করতে পার না। তোমার ব্যক্তিত্ব কম, তাই বাইরের সংঘাতে ভেঙ্গে যায়। তার মানে অতখানি সব কিছু ভেসে যায়, তাই লাভবান হ'তে পার না কোন কাজে; অভাব, অভিযোগ, রোগ, শোক যায় না।

উক্ত দাদা আর একটি ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধান চাইলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোদের জানার বাকী কম আছে। করার বাকী আছে ঢের। উপদেশ দিতে এখন আর ঠেকে না, করায়ই যা' ঠেকে যায়। এর সুরাহা কিসে তা' তুমিই জান এখন কর।

উক্ত দাদা—ঠিক চলতে পারছি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পারছি না, পারছি না করিস্ না। ভুল হ'লেও আবার

ঠিক করে কর্, করলেই হবে। একদিন না-পারাটা ইচ্ছা করে অভ্যাস করেছিলি, এইবার সঙ্কল্প করে পারাটা আয়ত্ত কর। ভগবান যেমন ইচ্ছাময়, মানুষও তেমনি তার নিজস্ব রকমে ইচ্ছাময়।

আর এক দাদা অভাব-অভিযোগের কথা বলছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঠিকমত করি না, তাই অভাব অভিযোগ। বিধিমত করার পথে চললে অভাব-অভিযোগ কিছু নেই।

সেই দাদা—নিজে নিজে ইচ্ছা করলেই যে একটা কিছু করা যায়, তা যায় না, সেটা আমি বুঝেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি, আমি, আমার, আমার ধান্ধায় ঘুরে কাম কী? তুই তাঁর জন্য সব কিছু কর। ভগবান যত শক্তি দিয়েছেন, সবগুলি unfurl (বিস্তার) করে তোল যাতে তাঁর সেবায় লাগাতে পারিস্। তিনি বাবা, তুই সন্তান, তিনি প্রভু, তুই দাস। তিনি মুনিব, তুই চাকর—এই ত। না, আর কিছু?

আমি আছি, তোদের ভাবনা কী? যদি ধ'রে রাখিস্ যষ্টিচ্যুত হবি না। অবশ্য ধ'রে না থাকলে হাজার যষ্টিও কিছু করতে পারে না। আমি রয়েছি, তোদের আবার ভাবনা কিসের? দুঃখ কিসের? কষ্ট কিসের? স্বাস্থ্যটা ঠিক কর, কোনরকম পরিশ্রমে যেন কাবু না হয়।

২৩শে মাঘ, শনিবার, ১৩৫৫ (ইং ৫।২।৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে গোলতাঁবুতে আসীন। কেষ্টদা, হাউজারম্যানদা প্রভৃতির সঙ্গে কথাবার্তা হচ্ছে।

রসায়ন সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—রসায়নের মধ্যে আছে রস্-ধাতু। রস্-ধাতু মানে শব্দ। শব্দের পিছনে আছে ব্যোমতরঙ্গ। রসায়নের কারবার হলো ব্যোমতরঙ্গের বীচিমালার নানা সমন্বয়, সংযোগ, সমাবেশ ও বিন্যাস নিয়ে। তা যে জানে সে হলো রাসায়নিক। সৃষ্টির মূল হলো শব্দ। প্রকৃত রাসায়নিক একদিক দিয়ে সাধক অর্থাৎ শব্দতত্ত্বজ্ঞ ও সৃষ্টিতত্ত্বজ্ঞ।

শব্দ থেকে উদ্ভুত যা তা সে জানে স্তরপারম্পর্য্যে। আবার আছে 'রসো বৈ সঃ'। পরম কারণ বা পরব্রহ্মকেও শব্দ ব'লে অভিহিত করা হয়। কারণ জানা মানে শব্দব্রহ্মকে উপলব্ধি ও আস্বাদন করা। এক কথায়, তাই হ'য়ে ওঠা। কিন্তু ভক্ত চায় নিজেকে আলাদা রেখে নিজেকে তত্ত্বজ্ঞ গুরুর উপভোগ্য ক'রে নিজের জীবনটা তথা সৃষ্টিকে উপভোগ করতে।

হাউজারম্যানদা—Compromise ( আপোষ ) ও tact ( কৌশল ) কি এক জিনিষ ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপোষ মানে আদর্শকে ত্যাগ করা, কৌশল মানে **to manage one or something in favour of the principle** ( একজনকে বা কোন কিছুকে আদর্শের অনুকূলে পরিচালনা করা )।

হাউজারম্যানদা—Beloved এর ( প্রেষ্ঠের ) wish ( ইচ্ছা ) actively fulfil ( সক্রিয়ভাবে পূরণ ) করাই ত আমাদের প্রধান কাজ, এর জন্য নাম ধ্যানের কী প্রয়োজন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নামধ্যান মস্তিষ্ককোষ ও স্নায়ুকে সাড়াপ্রবণ ও গ্রহণক্ষম করে তোলে। অনেক সুপ্ত কোষকে সক্রিয় করে। ইষ্টস্বার্থ প্রতিষ্ঠামূলক কর্ম্মের ভিতর দিয়ে অর্জ্জিত উপলব্ধিকে আবার concentric ও adjusted ( সুকেন্দ্রিক ও সুনিয়ন্ত্রিত ) করতে হয়। তাতে হয় wisdom অর্থাৎ প্রজ্ঞা। তা'ছাড়া ইষ্টের কাজ করতে গেলে মস্তিষ্ক যত বিকশিত হয়, তত তা ভাল করে করা যায়।

হাউজারম্যানদা—Visions and sounds ( দর্শন ও শব্দ ) হয়। সে কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নাম করতে করতে intercellutor combustion ( আন্তঃকৌষিক বিস্ফোরণ ) হয়, মিশ্রী কামড় দিলে যেমন আলোর ঝলক বেরোয়। কোথাও হয়ত তা' হয় না। বিভূতি বাড়ে। স্নায়ুশক্তি, মস্তিষ্কশক্তি বাড়ে। অবশ্য তাই final ( চরম ) নয়। সেগুলি সুকেন্দ্রিক কর্ম্মের ভিতর দিয়ে apply ( প্রয়োগ ) করে প্রেষ্ঠের ইচ্ছাগুলিকে materialise ( বাস্তবায়িত ) করে adjust ( নিয়ন্ত্রণ ) করা লাগে।

তাতে আসে knowledge and wisdom ( জ্ঞান ও প্রজ্ঞা ), Love with knowledge always keeps us balanced ( অনুরাগ ও জ্ঞান আমাদের সর্ব্বদা সাম্যভাবারূঢ় রাখে )

পরেশদা ( ভোরা )—বিচারের ভার নিজের হাতে নিতে যেও না, একথা বলে কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার উপর কৃত অন্যায়ের বিচার নিজের হাতে না নেওয়াই ভাল। তাতে বিচারের দোষটা নিজের ঘাড়ে পড়ে। বিচারক একজন, তাই বিচারের ভার সেই বিচারকের উপর দিয়ে সাথে সাথে প্রার্থনা করতে হয়, যাতে তার ক্ষতি না হয়।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মানুষ মানুষকে exploit (শোষণ) করতে পারে তার sentiment (ভাবানুকম্পিতা) বা complex (প্রবৃত্তি) এর ভিতর দিয়ে। এর ভিতর দিয়ে ছাড়া ত exploit (শোষণ)ই করতে পারে না। মানুষের সদ্ভাব থাকা ভাল, তাই ব'লে বোকা হওয়া ভাল নয়।

প্রফুল্ল—দরিদ্রকে ধনী ত শোষণ করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অন্য যে কোন কারণ থাক বা না থাক, প্রবৃত্তিবশ্যতা না থাকলে মানুষ দরিদ্র হয় কমই এবং চরিত্র থাকলে সে-লোক নিজেকে ধনীর দ্বারা শোষিত হতে সুযোগ দেয় না। যোগ্যতা থেকেও একজনের ধনলিপ্সা বা ধন না থাকতে পারে। তাই বলে তাকে নিঃস্ব বা দরিদ্র বলা চলে না।

কাশীদা ( রায় চৌধুরী )—অপরের অবাঞ্ছনীয় সমালোচনা করার প্রবৃত্তি হয় কেন মানুষের ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Slackened urge (শিথিল সম্বেগ) যাদের, strong in principle ( আদর্শে দৃঢ় ) নয় যারা, তারাই ঐ রকম করে। চায়ের দোকানের গল্পের মত।

বিকালে খুব ঠাণ্ডা ঝড়ো হাওয়া বয়ে গেল। সন্ধ্যার পর শীত বেড়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় গোলতাঁবুতে শয্যায় শ্রীঅঙ্গে সাদা সুতির চাদর জড়িয়ে উপবিষ্ট। কেস্টদা ( ভট্টাচার্য্য ), কেমিস্ট জ্ঞানদা (চ্যাটার্জি),

ব্রজেনদা ( দে ), পরেশদা ( দত্তগুপ্ত ), দেবেনদা ( কর ), হরেনদা (বসু), সুধীরদা ( চ্যাটার্জ্জী), নীরদদা ( গাঙ্গুলী ), প্রভাতদা ( হালদার ) প্রভৃতি অনেকে উপস্থিত।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—গুরু হলেন আমাদের জীবন-বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য্য, পরিচালক ও পরিপোষক। তাঁকে কেন্দ্র করেই জীবন নিয়ন্ত্রিত, ব্যাখ্যাত ও বিবর্তিত হয়।

জ্ঞানদার সঙ্গে চিৎশক্তি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—শরীরটাই মানুষ নয়কো। চিৎশক্তির দরুণ মানুষ চেতন থাকে, সাড়া সৃষ্টি করে ও ধরে। এইটেই মানুষের প্রধান সম্পদ। প্রাণবান শরীর চৈতন্যশক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার যন্ত্রস্বরূপ। রকমারি সাড়ার সৃজন গ্রহণ ও বিন্যাসের ভিতর দিয়ে অজস্র রকমের সূক্ষ্ম যন্ত্রের উদ্ভাবন করা যায়। এই সম্ভাবনা অনন্ত। গুরু অর্থাৎ উন্নত চৈতন্যরাজ্যে যিনি বিচরণ করেন, তাঁর প্রতি concentric tension ( সুকেন্দ্রিক টান ) থাকলে, তোমার মস্তিষ্ক যন্ত্রটা বিধিমত অনুশীলনের ফলে perfect ( নিখুঁত ) হতে থাকে, সূক্ষ্মরাজ্যে অনুপ্রবেশের barrier ( বাধা ) নষ্ট হয়ে যায়। তখন উন্নত যন্ত্র সহজে আবিষ্কার করতে পার।

জ্ঞানদা—তাহলে ত চেষ্টা করলে বিগত আত্মাকে এনে কথা বলান যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে ঠিক। তুমি যদি দীক্ষা না নিয়ে থাক, তবে তোমার সব দিক fulfilled ( পরিপূরিত ) হয়, এমনতর উপযুক্ত জায়গায় দীক্ষা নাও। আরও ভাল পারবে।

জ্ঞানদা—আমার কাজের নমুনা ত আপনি দেখেছেন। আমার কি তার প্রয়োজন আছে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কাজের নমুনার কথা কী বলছ? তুমি ত একটা ভাবতরঙ্গ মাত্র। তোমার সম্বেগ আছে। করেছ, খাটছ। তুমিই ত ক'য়ে দিচ্ছ—তোমার আরোতর বিকাশের জন্য কী লাগে। আমার তা বলা লাগে না।

জ্ঞানদা—দেবদেবীর কি অস্তিত্ব আছে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আছে বই কি ? ধর সরস্বতী পূজা করি। সরস্ শব্দের পিছনে আছে সৃ-ধাতু, তার মানে গতি অর্থাৎ motion, ব্যোমতরঙ্গ যেখানে, স্পন্দন যেখানে, সেখানে তিনি বাস করেন। তাই তাঁর রূপকল্পনায় তাঁর হাতে আছে বীণা, যেটা স্পন্দন ও শব্দের প্রতীক। তাঁর আর এক নাম বাগ্দেবী। তাই, ভাব-অনুযায়ী দেবদেবীর মূর্ত্তি গড়ে। আবার অনেক দেবতা আছেন যাঁরা hero ( বীর )। তুমি যদি তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে পার, তোমার আবিষ্কারের ভিতর দিয়ে মানুষের দুঃখ, কষ্ট, ব্যথা, যন্ত্রণা মুছে দিতে পার, কেড়ে নিতে পার, তোমাকেই মানুষ দেবতা বলে পূজা করবে। দেবতা মানে যাঁর ঔজ্জ্বল্য মানুষকে দীপ্ত করে তোলে।

জ্ঞানদা—মাঝে মাঝে সত্তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সত্তার পিছনে আছে অস্ ধাতু। আছি এই ভাব আছেই। Science ( বিজ্ঞান ), philosophy ( দর্শন ), psycholcgy ( মনোবিজ্ঞান ) যাকিছু সত্তাকেই বেষ্টন করে থাকে। বস্তু ও সত্তার মূলেও থাকে তরঙ্গ। যে তরঙ্গ সত্তাকে চাঙ্গা করে, উজ্জীবিত করে, বলশালী করে, সেটা সেখানে ওষুধের কাজ করে। ধর বিশেষ অসুখে তাবিজ ধারণ করলে, তাবিজের একটা তরঙ্গ আছে। তার একটা ক্রিয়া হয় শরীরের উপর। তাতে হয়ত রোগ-প্রতিরোধী শক্তি বাড়ে। রোগের শক্তি কমে, ফলে রোগ সারে।

জ্ঞানদা নিজের জীবনের দুটি অলৌকিক অনুভূতির কথা বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—জীবনটা একটা particular wave (বিশেষ তরঙ্গ)। লিডেনজারের বিদ্যুৎ ধরার মত কতকগুলি জিনিষ ধরার ক্ষমতা আছে আমাদের। প্রতিটি গরু, গাছ, মানুষের এক একটা wave length ( তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ) থাকে। সেটা রজোবীজের সম্বেগ ও সঙ্গতির উপর নির্ভর করে। তার দ্বারা জীবনীশক্তি নির্দ্ধারিত হয়। তুক আর তাক ঠিক চাই। চিনির একটা তাক করে তাতে কায়দামত সূতো দিলে মিশ্রী দানা

বাঁধে। দানার আবার তরঙ্গ আছে। তাকে বলে বৈশিষ্ট্য। দানার তরঙ্গ তজ্জাতীয় তরঙ্গেরই সৃষ্টি করে। সজনে থেকে সজনে হয়। অতসী থেকে অতসী হয়। অবশ্য তারও রকমারি হ'তে পারে। এই বৈশিষ্ট্যের গুচ্ছ নিয়েই বর্ণাশ্রম। মিলনযোগ্য কোনটা কার, তাই বুঝে নারী পুরুষদের মিলন সংঘটন করতে হয়। সমবিপরীত সত্তার মিলন ঘটাতে হয়। সগোত্র বিয়ে ঠিক নয়। Similar ( সদৃশ ) অথচ different ( স্বতন্ত্র ) হওয়া চাই। বামুনের ছেলে বামুনের মেয়ে হলেই হবে না। সব রকমের সঙ্গতি হওয়া চাই।

কেষ্টদা কথাপ্রসঙ্গে বললেন—চিন্তা তরঙ্গের ছন্দ পর্য্যন্ত লিপিবদ্ধ করা যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মনে হয় এতে লাগে push and pause ( ধাক্কা এবং বিরতি )। গ্রামোফোন রেকর্ডিং-এ যেমন হয়।

জ্ঞানদা—উপযুক্ত ওষুধে উন্নত স্তরের মস্তিষ্ককোষ, অন্তর্নিহিত শক্তি এবং একাগ্রতার বিকাশ এবং রোগের নিরসন একযোগে হ'তে পারে বলে মনে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সবই stimulus-এর ( উদ্দীপনার ) ব্যাপার। আমাদের ভিতর আছে মিলনের আকূতি, অর্থাৎ সুরত। শুক্রকীটগুলি উত্তেজিত হয়ে মিলনের উদগ্র আগ্রহে সঙ্গতিওয়ালা ডিম্বকোষকে ভরণভৃত করে। সেখানেই গর্ভধান হয়ে জাইগটের সৃষ্টি হয়। মানুষ মানে ঐ জিনিষটা। সেইটে হলো inherent urge ( অন্তর্নিহিত আকূতি ), libido বা সুরত যা-বল। সেই জিনিষটারই বিকাশ হ'লো মানুষ। ঐ সম্বেগটা নষ্ট করে দিলে হবে না। জীবনই থাকবে না। বাইরের shock ( আঘাত ) ও রোগশোকে অনেক সময় এটা ভঙ্গুর হয়ে ওঠে। তখন জীবনের লালিমা থাকে না। যা দিয়ে feel ( বোধ ) করি, achieve ( অধিগমন ) করি, adjust ( নিয়ন্ত্রণ ) করি, তা হলো সুরত; একাগ্রতার মৌলিক মসল্লাও তাই। নানাজন নানাভাবে করে। কেউ ব্যোমে মনোনিবেশ করে, কেউ ফুলে, কেউ আলোতে, কেউ পাথরে করে,

কেউ ত্রাটক ত্রাটক করে, কেউ নেতি নেতি করে। কিন্তু এগুলিতে অনেক কসরত করতে হয়। সহজে হয় যদি উপযুক্ত আদর্শের উপর অচ্যুত অনুরাগ হয়। তখন চিন্তা কর্ম্ম সব কিছু meaningfully adjusted ও concentric ( সার্থকভাবে বিন্যস্ত ও কেন্দ্রায়িত ) হয়ে অখণ্ড ব্যক্তিত্ব form করে ( গঠিত হয় )।

"বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ॥"

( বহুজন্মের সাধন ফলে শেষ জন্মে সমুদয় জীবজগৎ বাসুদেবই,— এইরূপ জানিয়া তিনি আমাকে অতিশয় প্রেমাস্পদরূপে ভজনা করেন। সেইরূপ মহাপুরুষ অতিশয় দুর্ল্লভ )—এমনতর অবস্থা লাভ হয়। গুরু-ভক্তি বাদ দিয়ে আত্মোপলব্ধি mathematically possible (গাণিতিক ভাবে সম্ভব ) হতে পারে, কিন্তু not in reality ( বাস্তবে নয় )। মুল আকুতির মধ্যেই রয়েছে সেই জিনিষ যা নিয়ে দেহায়িত হয়েছি আর যখন চলে যাব তখনও তা থাকবে লিঙ্গশরীর রূপে। লিঙ্গ এসেছে লিন্‌গ্‌ ধাতু থেকে, যার মানে চিহ্নিতকরণ।

জ্ঞানদা—একাগ্রতার সময় ত বহুরকম অনুভূতি হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শব্দ-জ্যোতির রকমারি অনুভূতি হয়। সাধারণতঃ এই রকম সময় blue light ( নীল আলো ) দেখা যায়। ওতে অনেক সূক্ষ্ম স্তরের জিনিষ অনুভব করা যায়।

পরে শ্রীশ্রীঠাকুর জ্ঞানদাকে বললেন—একজনকে উদ্বুদ্ধ ক'রে প্রতিলোম-মিলনের অনিষ্টকারিতা পুরোপুরি বৈজ্ঞানিকভাবে বাস্তবে প্রমাণ করান চাই। এ হলে বৃক্ষলতা, পশুপক্ষী, মানুষজন ও জাতি বাঁচায়ে দিতে পার। কাঁটায় কাঁটায় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে এটা প্রমাণ করে দেওয়া চাই। সারা দুনিয়ার মহা উপকার হবে এতে। এমনতর মঙ্গল আর নেই। বুঝলে মণি !

জ্ঞানদা—চেষ্টা করব।

আপনার কাছে এসে যে এত জিনিষের সন্ধান পাব, তা ভাবতে

পারি নি। আমি দশ বছর ধরে যে চর্চ্চা করেছি তার চাইতে কত finer ( সূক্ষ্মতর ) ভাবে জিনিষগুলি জানা আছে আপনার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিদ্যা পড়ায় নেই, করায় আছে। করার মধ্য দিয়ে কোহিনূরগুলি তোলে। সব শাস্ত্রই তাই। আমার বিদ্যাবুদ্ধি নাই। করা কুড়োন পাওয়া।

এরপর কেষ্টদা বললেন—ঠাকুর নিজের বাড়ীতে ল্যাবরেটরি করে কতদিন আগে থেকে কতরকম research ( গবেষণা ) চালিয়েছেন। কেবল লোকের অভাবেই কাজগুলি সমাধা করা যায় নি। গোপালদা আমাদের সেক্রেটারী ছিলেন, তিনি এসব করতেন। তিনি মারা গেলেন। মাইনে দিয়ে লোক রাখা হয়েছিল। কিন্তু তাতে কাজ হয় নি।

জ্ঞানদা—মাইনেয় ত হবে না এ কাজ। তারা যে ছুটি চায়!

শ্রীশ্রীঠাকুর—এখানে এই মাইনা—আমি আমার জন্য নই, তোমার জন্যই আমি—এইআত্মসমর্পণের জন্যই আমার অস্তিত্ব। তাঁকে প্রত্যাশাহীন ভাবে সেবা করার সুযোগ গ্রহণই এখানকার পরম প্রাপ্তি।

জ্ঞানদা একটু ঘুরে আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর আবার কথা তুললেন—আমাদের বর্ণগুলিকে inflame ( স্ফীত ) করে, educate ( শিক্ষিত ) করে, adjust ( নিয়ন্ত্রিত ) করে যদি নিতে পারি, তবে কারও পারার জো নেই। বৈশিষ্ট্যগুলিকে নষ্ট করে দিয়ে প্রতিলোম করে দিয়ে লাভ নেই।

জ্ঞানদা—Surrender ( আত্মসমর্পণ ) জিনিষটা কী? এটা একটা নিশ্চিন্ততা না something more ( আরো কিছু )?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Infinitely more ( আরো অনন্ত )।

জ্ঞানদা—নিজেকে ছেড়ে দিলেই কি ছেড়ে দেওয়া হলো?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Surrender ( আত্মসমর্পণ ) মানে to give myself up above অর্থাৎ আমার যা কিছু সবটার উপর গুরুকে রাখা। তাঁর ইচ্ছাগুলি পূরণ করা। টান তাঁর দিকে গেলে তা' করতে পারব না, যা তাঁকে fulfil ( পূরণ ) করে না। গুরুতে যদি শ্রদ্ধা না থাকে, তাঁতে

আত্মসমর্পণ করতে পারব না। শ্রদ্ধা যত বেশী হয়, তত সম্বেগ বেড়ে যায়, লয় হতে দেয় না কাঁচা অবস্থায়। সাধন জগতে দেখা যায়, উন্নত স্তরের গুরুতে নিষ্ঠা যদি থাকে, একাগ্রতা, ভুমায়িতি, প্রসারণা যতই হোক, সহজে সচেতনতা লোপ পায় না। নানা তরঙ্গ আসে, কত রকমারি বিক্ষেপ আসে, সেগুলিতে নিজেকে হারিয়ে ফেলে না বরং সেগুলিকে একমুখী করে নিয়ন্ত্রিত, সংহত ও সার্থক করে তত্ত্ব বস্তুতে উপনীত হয়।

জলের মধ্য একটা ঢিল বা ইট ফেললাম, সে ঢেউটা কিন্তু বৃহত্তর ও বৃহত্তর বৃত্ত সৃষ্টি করতে করতে কূলে এসে না পৌঁছান পর্য্যন্ত থামে না। প্রত্যেক যা-কিছুই অনন্তের সান্ত বিগ্রহে সার্থকতা লাভ ক'রে আমাদের সার্থক করে তুলতে চায়। ঐ কেন্দ্রের প্রতি চাই অকাট্য টান।

জ্ঞানদা—সব অন্তরায় সত্ত্বেও একটা মুখ্য ভাব নিয়ে লেগে থাকাই ত দরকার?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাবের মধ্যে cohesive urge (সংসক্তিমূলক আকূতি) থাকা চাই, নচেৎ scattered (ছিন্নভিন্ন) হয়ে যাবে। সব বাধাকে উপেক্ষা করে বা বাধ্য করে মুল ধরে থাকতে হবে।

জ্ঞানদা—মন নির্ব্বাত নিস্পন্দ হয়ে যাওয়া চাইত?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মন সাধারণতঃ নির্ব্বাত নিষ্কম্প হতে চায় না, তা হতে গেলে ডুবে যায়। অচেতন হয়ে পড়ে। ইষ্টকে নিয়ে চেতন থাকা চাই, সেটা অনুরাগ ছাড়া আর কিছুতে হতে পারে না! ইষ্ট নিষ্ঠায় মনের সার্থক ও সুকেন্দ্রিক বিবর্ত্তন ঘটে। তখন মন হয় কল্যাণ-কল্পতরুর মত। সে হয় বিশ্বমনের দোসর। একেই বলে শুদ্ধ মন।

জ্ঞানদা—মানুষের সংস্কার ত আছে!

শ্রীশ্রীঠাকুর—Tendency towards unification (মিলনের ঝোঁক) যদি না থাকে তবে কিসের সংস্কার? চিৎ-এর অস্তিত্ব ঐ দিয়েই। সংস্কারের ভিত্তি অসাড় হয়ে গেলে থলের থেকে মাল পড়ে যাবে। ইষ্টের উপর টান থাকলে মানুষ তাঁকে নিয়েই মত্ত থাকে। কোন মতলব নিয়ে ভালবাসা নয়। কেন তুমি ভালবাস? আমি ভালবাসি কারণ আমি

ভালবাসি। এমন করেই হয়। অবশ্য ধর্ম্মের ভানও ভাল। করতে করতে হয়। তবে লেগে থাকতে হয়। কেষ্টঠাকুরের গুরু তাই তাঁকে আশীর্ব্বাদ করেছিলেন 'অচ্যুতোভব'।

জ্ঞানদা—আপনি যে কেমিষ্ট্রি সম্বন্ধে এত জানেন, ভাবলে অবাক লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমিও পারতে যদি তুমি পাগল হতে।

জ্ঞানদা—জিনিষটা আখ অথচ আখের test (স্বাদ) পাওয়া যায় না, এমনতর কি হতে পারে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যদি প্রকৃত আখ হয়, আখের স্বাদ পাবেই। যদি জিহ্বার রোগ না থাকে। অবশ্য বিভিন্ন জাতের আখের স্বাদের তারতম্য থাকতে পারে।

গুরুর প্রয়োজন সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার সত্তা আছে, পারিপার্শ্বিক তা ভেঙ্গে দিতে চায়। আমার যদি একজন nurturing agent (পোষণদাতা) থাকে, তবে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সুষ্ঠু ব্যবহার করে সেখান থেকে পোষণীয় যা তা সংগ্রহ করে সমৃদ্ধ হতে পারি। হিসেবী ভালবাসা ভালবাসাই নয়। সহজ ভালবাসাই যোগ আর তাতে সব আসে। কিন্তু কোন কিছুর লোভে ভালবাসলে হয় না।

ব্রজেনদা (দাস)—I love because I cannot but love (আমি ভালবাসি কারণ আমি ভাল না বেসে পারি না)—এই রকম ত !

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই কথাটা নয়, ঠিক এই ভাবটা। তাঁকে ভালবাস; তিনি রসগোল্লা পছন্দ করেন। তাঁকে তাই খাওয়াবার জন্য কোথা থেকে রসগোল্লা ঠেলে নিয়ে আসছ কত কষ্ট করে, কিন্তু কষ্টের বোধ নেই, বিরক্তি নেই। না আনতে পারলে বরং কষ্ট। যোগ তাই suffering (কষ্ট) গুলিকে dull (ভোঁতা) করে দেয়।

জ্ঞানদা—সহজ নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অতি সহজ।

বর্ণ সম্পর্কে কথা প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বর্ণটা শুধু কথার

কথা নয়। Being ( সত্তা )টা অমন হওয়া চাই। কুত্তার বাচ্চাকে জলে ফেলে দাও, সাঁতার কাটবে। মানুষের বাচ্চাকে সাঁতার শেখাতে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুরের দাঁতের ব্যথা দেখে জ্ঞানদা বললেন—আমাদের জীবনের থেকে, আপনার জীবনের দাম অনেক বেশী। দেখি আমার ওষুধটায় আপনার কোন কাজ হয় কিনা। তাহলে আমারও একটা সার্থকতা হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমরা যদি বেঁচে থাক, সুখে থাক, স্বস্থ থাক, তাহলেই আমার বাঁচার দাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর ব্রজেনদাকে বললেন—আমি ওকে বলছিলাম কয়েকজন একনিষ্ট পাগল ( গবেষণাকর্ম্মী ) জোটাবার কথা। ৫। ৭ জন পাগল জুটলে আরো কত আসবে। আমেরিকা, জারমানী, রাশিয়া থেকেও আসবে। এমন একটা strong group ( শক্ত দল ) হবে যে দুনিয়া কাঁপিয়ে দেওয়া যাবে। আমি atom-breaking ( অণু-বিভাজন ) সম্বন্ধে কতদিন আগে experiment ( পরীক্ষা ) করিয়েছি, কতরকম বলেছি। বিগত আত্মার সম্বন্ধে গোপাল বহু নিদর্শন পেয়েছিল। থাকলে এতদিন হয়ত করে ফেলত। তুমি এই কাজটা তাড়াতাড়ি করে ফেল। তাহলে 'তুমি নাই' এ ব্যথা আর কাউকে পেতে হবে না।

জ্ঞানদা খেয়ে আসার পর শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে বললেন—মানুষ মরে গেলেও দেহের যন্ত্রগুলি নষ্ট না হলে artificial respiration ও blood circulation ( কৃত্রিম শ্বাসপ্রঃশ্বাস ও রক্ত সঞ্চালন ) সৃষ্টি ক'রে, এবং মানুষের vital wave length ( প্রাণিক তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ) যদি মাপা থাকে সেই তরঙ্গের সাড়ার সাহায্যে তাকে revive ( পুনর্জীবিত ) করা যায়। প্রত্যেক জীবেরই vital wave length ( প্রাণিক তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ) আছে। Death is a disease ( মৃত্যু একটা ব্যাধি ), annihilation ( ধ্বংস ) নয়—এইভাবে নিতে হয়। প্রত্যেকেই এক একটা wave ( তরঙ্গ ), তার আবার aura ( জ্যোতি ) আছে। জ্যোতিগুলি পরস্পর resist ( প্রতিরোধ ) করে। শক্তিমান ভাবদ্যুতি দুর্বল ভাবদ্যুতিকে মলিন

করে দেয়। একজনের দুর্ব্বল সদগুণ অপরের প্রবল অবগুণের প্রভাবে নষ্ট হতে পারে।

জ্ঞানদা—Concentration (একাগ্রতা) ও hypnotisation (সম্মোহন) তো প্রায় একরকম। এই অবস্থায় observe (পর্য্যবেক্ষণ) করার সুবিধা হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Hypnotism এ (সম্মোহনে) possessed (পেয়ে বসা) ও obsessed (অভিভূত) মত অবস্থা হয়। Sedative action (অবসাদ উৎপাদক ক্রিয়া) হয়। Concentration এ (একাগ্রতায়) positive action (বাস্তব ক্রিয়া) হয়, সুপ্তভাব উদ্দীপিত হয়। একটা যেন ঘুম, আর একটা যেন সমাধি। সুপ্ত শক্তি ও জ্ঞানের বিকাশ ও জাগরণ হয়। সূক্ষ্ম জ্ঞানের ভাণ্ডার খুলে যায়।

২৪শে মাঘ, রবিবার, ১৩৫৫ (ইং ৬।২।৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে গোলতাঁবুতে বসে আছেন। বাইরে টিপ টিপ করে বৃষ্টি হচ্ছে। কালীদাসীমা বললেন—যদি বর্ষে মাঘের শেষ, ধন্য রাজার পুন্য দেশ। শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে বললেন—পুন্য দেশে যদি শীত জাঁকায়ে আসে তাহলে ত আমার কাহিল অবস্থা।

এরপর সওয়া সাতটার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর একটি বাণী দিলেন। একটু বাদে হাউজারম্যানদা জিজ্ঞাসা করলেন—মানুষের বদভ্যাস নষ্ট করা যায় কি ভাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার কথাবার্তা চালচলন এমন co-ordinated ও adjusted (সুসমন্বিত ও নিয়ন্ত্রিত) হওয়া চাই যাতে মানুষ exalted (উদ্বুদ্ধ) হয়। তোমার সবসময় মানুষের প্রতি থাকবে active sympathy (সক্রিয় সহানুভূতি) অথচ তুমি হবে strong in principle (আদর্শে সুদৃঢ়)। তুমি যদি এমনতর হও, তোমাকে মানুষ যত ভালবাসবে, তারও তত ভাল হবে। সে যদি তোমাকে এমন ভালবাসে যে তোমার জন্য sacrifice (ত্যাগ) ক'রে সুখী হয়, তাহলে সহজে হয়।

তোমার উপর এমন attachment ( অনুরাগ ) থাকা চাই যাতে তোমার সদ্‌গুণ imbibe ( আয়ত্ত ) ক'রে নেয়।

কথা প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর হাউজারম্যানদাকে বললেন—একজনের normal character (স্বাভাবিক চরিত্র) কেমন সেটা বোঝা যায় বাড়ীতে সে মা বাপ ছোট ভাইবোন, চাকর-বাকর ইত্যাদির সঙ্গে কেমন ব্যবহার করে, তাই দেখে। Charity begins at home ( উদার প্রীতি সুরু হয় বাড়ী থেকে )। ওখানেই হাতেখড়ি।

তোমাকে যেমন যেমন বললাম, তেমন তেমন কর। দেখতে দেখতে son of bliss ( অমৃতের সন্তান ) হয়ে যাবে। The satisfied can impart satisfaction ( যারা সন্তোষলাভ করেছে, তারাই সন্তোষ চারাতে পারে )। Always draw regardful love from others by your character and service placing yourself above it. Then you won't be shocked even by their bad treatment, in other words you won't be shocked thereby but will try to win them ( নিজেকে সবকিছুর ঊর্ধ্বে রেখে সর্ব্বদা নিজের চরিত্র ও সেবা দিয়ে অন্যের সশ্রদ্ধ ভালবাসা আকর্ষণ করতে চেষ্টা করো। তখন তাদের খারাপ ব্যবহারেও আঘাত পাবে না, অন্যকথায় তাতে আহত না হয়ে তাদের হৃদয় জয় করতে চেষ্টা করবে। )

সন্তোষদা ( দত্ত )—যাজনটা যে সব সময় হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাজন মানে 'ঠাকুর ধর' এ কথা নয়। তোমার আলাপ-আলোচনা-ব্যবহারে মানুষের ক্ষুধা জাগা চাই। তখন সে আপনা থেকেই শুনতে চায়।

সন্তোষদা—যজন বেশী করলে কি যাজন ভাল হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যজন মানে শুধু নামধ্যান নয়। নীতিগুলি চরিত্রে ফুটিয়ে তোলা এবং সংসারের প্রতি পদক্ষেপে সেগুলি পালন করা। চরিত্র এমন হবে যে তোমাকে দেখে ভালমন্দ সকল লোকেরই বলা চাই— Sweet man—a man of bliss ( মিষ্টি মানুষ, স্বর্গীয় মানুষ )—

এমনলোক দেখিনি। শুধু ভাল মানুষ হলেই হবে না। আদর্শে অটুট থেকে মাথা খাটিয়ে চলা চাই—যেখানে যার সঙ্গে যেভাবে যেমন প্রয়োজন তেমনি, যাতে প্রত্যেকের অন্তরের সিংহদ্বার উন্মুক্ত হয় তোমার সান্নিধ্যে তোমার মধ্যে তোমার ঠাকুরকে দেখতে পায়, তবে ত হয়।

সন্তোষদা—কেউ যদি আমার ইষ্ট কে শ্রদ্ধা না করে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আগে তোমার পর শ্রদ্ধা হওয়া চাই। তোমাকে শ্রদ্ধা না করলে তোমার ঠাকুরকে শ্রদ্ধা করবে কি দিয়ে? তোমার চরিত্রই যদি ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠ হয়, তোমাকে দেখে তার বুক ভরে যাবে, সত্তা ডগমগ হ'য়ে উঠবে, তাই তোমার ইষ্টের উপর শ্রদ্ধা তখন আপসে আপ দুর্ব্বার হয়ে উঠবে। তুমি যদি ইষ্টের হও, তোমার জগৎটাও ইষ্টের হবে। কায়মনোবাক্যে এমনতর হ'য়ে ওঠাই প্রধান কথা।

সন্তোষদা—আমার প্রতি তার শ্রদ্ধা হওয়া চাই ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সম্ভ্রমী শ্রদ্ধানতি চাই। 'এই আয় যাই চপ কাটলেট খেয়ে আসি'—এমনতর এয়ারি রকম না হয়।

প্রফুল্ল—অনেক সময় যার উপর পরিবারের লোকদের প্রত্যাশা থাকে, তারা তার ইষ্টকাজে ক্ষুব্ধ হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর তার মানে তোমার ব্যবহারে gap (ফাঁক) আছে। তোমার ব্যবহারে মনে করার সুযোগ দিয়েছ যে তোমাকে তারা হারিয়েছে। আর টাকা পয়সার দিক থেকে, উপার্জ্জনের দিক থেকে যদি তোমার অভিভাবক দেখে যে সে সারাজীবন কলম পিষে শেষ জীবনে মাসে ৫০০ টাকা পাচ্ছে, আর তুমি একজনের বাড়ী গিয়ে দাঁড়াতেই হাজার হাজার টাকার উপঢৌকন চলে আসে, তখন তার গলা আটকে আসে, বাবা বলবে না কী বলবে ঠাওর পায় না। তোমরা কথা কও, কিন্তু কথাগুলি material shape (বাস্তব রূপ) নেয় নি, সপারিপার্শ্বিক নিজেকে profitable (লাভবান) করে তোলে নি materially (বাস্তবে), আর তোমার চলা দেখে আমার প্রতি মানুষের love (ভালবাসা) অতটা overflowing (উচ্ছল) হয়নি, যাতে মানুষ অতখানি dedicated (সমর্পিত)

হয়ে খুশী হয়। তেমন হলে পরিবারকেও materially fulfil ( বাস্তবে পরিপূরণ ) করতে পারতে। কুষ্টিয়ায় যখন যেতাম, টানাটানি পড়ে যেত কোন বাড়ি নেবে। যে বাড়ি যেতাম, এত জিনিস এনে মানুষ দিত যে প্রয়োজন ছাপিয়ে স্তূপীকৃত হয়ে যেত। যাদের বাড়িতে থাকতাম তাদেরও সুবিধা হত।

সন্তোষদা—সব সময় ইষ্টের কথা মাথায় থাকে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিরন্তর অভ্যাসে ঠাকুরকে, তোমার ইষ্টকে তোমার ভাবে, চরিত্রে, চলায়, কথায়, ব্যবহারে মূর্ত্ত করে তোল।

সন্তোষদা—ভাবটা continuous ( নিরন্তর ) হয় কি করে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Continuity (ক্রমাগতি) কথার মানে তোমার চরিত্রই তাঁকে বহন করবে। কাজেকর্ম্মে মানুষের সঙ্গে মেলামেশায় সবটায় সেটা ফুটে উঠবে প্রাঞ্জল হয়ে। তুমি ডাক্তার মানুষ, তুমি রোগীর বাড়ী গেলে তোমাকে দেখেই রোগীর মনে হবে বারো আনা সেরে গেল। তোমার মধ্যে ঠাকুর দেখবে। ভাববে এই যে ঠাকুর দেখছি, তাতেই ত হেউ-ঢেউ। তিনি জানি কেমন !

সন্তোষদা—সেবার ভিত্তিতে চলতে হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অচ্যুত-আদর্শী শ্রদ্ধাকর্ষক সেবাপ্রবণ ব্যবহার চাই।

জ্ঞানদা দীক্ষার পর প্রণামী দিতে আসলে শ্রীশ্রীঠাকুর আব্দারের সুরে বললেন—আমাকে এদিলে হবে না। ঐ কয়জন মানুষ চাই, সেইটে হবে তোমার দক্ষতার দক্ষিণা। মানুষ না হলে হবে না। পাগল হয়ে যোগাড় করা চাই। রতনেই রতন চেনে। গাঁজেলেই গাঁজেল ধরে।

জ্ঞানদা—আপনি আশীর্ব্বাদ করুন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আশীর্ব্বাদ কি ? আমার বুকভরা প্রার্থনা পরমপিতার কাছে। এই ত আমার চাওয়া। টিম টিম করে চলা ভাল লাগে না। মারি ত গণ্ডার আর লুটি ত ভাণ্ডার।

পরে জ্ঞানদাকে লক্ষ্য করে বললেন,—ও এসে আমার যেন একটু

আশা হচ্ছে। যাহোক এই বার জীবনের মসলা সংগ্রহ করে ফেল।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর ব্রজেনদা (দাস)কে বললেন—৭ জন মানুষ (রিসার্চ্চ স্কলার), ২ জন ভাল মেকানিক জোগাড় কর।

দুপুরে ভোগের পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সবই wave (তরঙ্গ)—একথা বলাও যা—'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' বলাও তাই। সবকিছু একেরই রকমারি প্রকাশ।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর গোলতাঁবুতে। আজ খুব ঠাণ্ডা পড়েছে। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), জ্ঞানদা (চ্যাটার্জী), ব্রজেনদা (দাস), সরোজিনীমা, হেমপ্রভামা প্রভৃতি উপস্থিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেড়লাখ করে ফেলেন, সপ্তর্ষি (Research worker) জোগাড় করুন। তাদের devoted (ভক্তিমান) হতে হবে। যেন অর্থলোভ না থাকে। ২ জন বিশ্বকর্ম্মা (মেকানিক) আনুন, কৃষ্টিবান্ধব করে ফেলুন। কাগজগুলি ঠিক করুন। নিজেদের দৈনিক পত্রিকা বের করুন। জোর চালান কাম। যে blast (প্রবল প্রবাহ) গুলি এসেছে তা counteract (প্রতিবিধান) করতে জোর blast (প্রবাহ) লাগে।

কেষ্টদা—দেড়লাখ দীক্ষা দিতে অন্তত ৫০০ জন নিষ্ঠাবান ঋত্বিক দরকার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কাগজকে ঋত্বিক করে দেন। মানুষ আছেই, তারা সাড়া দেবেই।

বার্দ্ধক্য সম্পর্কে কথা হচ্ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ইষ্টনিষ্ঠা যদি না থাকে, বিয়েটা যদি ঠিকমত না হয়, বিরুদ্ধ মিলন যদি হয়, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যদি সদ্ভাব না থাকে, স্ত্রীর কাছ থেকে প্রীতিপ্রত্যাশা যদি ক্রমাগত ব্যাহত হতে থাকে, স্ত্রী যদি ক্রমাগত depressing impulse (অবসাদ-উৎপাদক সাড়া) radiate (বিকীরণ) করতে থাকে, ওর থেকে পুরুষ অকালে বুড়ো হয়ে যায়। পুরুষের জীবনে তখন প্রধান হয়ে ওঠে হতাশা, নিরাশা। পুরুষের মস্তিষ্ক রাজ্য যখন এইভাবে আক্রান্ত হয়, তখন তার শরীর দুর্ব্বল হয়।

Toxin eliminate ( শরীরে উৎপন্ন বিষ বহিষ্করণ ) করার ক্ষমতা কমে যায়। তা deposited (জমা) হয়। Life potency (জীবনীশক্তি) কমে যেতে থাকে। তাতে শরীর বিধানের balance ( সমতা ) ভাঙ্গতে থাকে। এছাড়া অকাল বার্দ্ধক্যের অন্য কারণও থাকে। যাহোক বার্দ্ধক্যের সঙ্গে যুদ্ধ করার সময় thorough nervine body-building material ( সুসম্পূর্ণ স্নায়ুপোষী, দেহ-সংগঠক উপাদান ) চাই। আগে ছিল কুটি-প্রবেশের বিধান। ঘর কেমন হবে তার নির্দ্দেশ ছিল। সদ ব্রাহ্মণ সেখানে নিত্য হোম করবে, তাতে ও অন্যান্য নিয়ম পালনে শরীর-মনের পুষ্টি বিধানের উপযোগী অবস্থা ও আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়। তাতে প্রতিকূল শক্তিগুলিকে দূরীভূত করে জীবনীশক্তি বাড়িয়ে দেয়। দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রী পরস্পার পরস্পরের কাছ থেকে ভালবাসা প্রত্যসা করে। উভয়েরই দেখা উচিত যাতে একজনের ব্যবহারে আর একজন সুখী হয়, উৎফুল্ল হয়। অবশ্য বিয়ে ঠিকমত হওয়া দরকার। তাছাড়া, উভয়ের পারস্পরিকভাবে মনমেজাজ বুঝে স'য়ে ব'য়ে চলা লাগে। স্ত্রী যদি স্বামীর প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হয়, সে যদি ক্রমাগত স্বামীর মনে আঘাত দিতে থাকে, শাস্ত্রে বলে তার থেকে দূরে থাকাই উচিত। স্ত্রী যদি শান্তিদায়িনী না হয় তার সঙ্গে কামসম্পর্ক থাকলে, তা পুরুষের জীবনে গোলমাল ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে।

একটু থেমে শ্রীশ্রীঠাকুর আবার বললেন—নিয়মিত ইসবগুল খেলে অনেক কিছু বদমাল বের করে দেয়। সহজে বার্দ্ধক্য আসতে দেয় না। থানকুনিও শরীরবিধানকে বেশ শক্ত করে তোলে।

শক্তিসঞ্চার সম্পর্কে কথা প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর কাশীদাকে বললেন— যারা সর্বতোভাবে সুনিষ্ঠ নয়, তাদের মাল দিলেও ধরে রাখতে পারে না। সদ্ব্যবহার করতে পারে না।

বাল্বের আলো এসে পড়ায় শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রশস্ত ললাট অপূর্ব ঔজ্জ্বল্যে চকমক করছে। হাসিহাসি মুখে স্নিগ্ধমধুর কণ্ঠে শ্রীশ্রীঠাকুর জ্ঞানদাকে বললেন—সপ্তর্ষি যদি জোগাড় করে না দাও, পথের সম্বল

কমে যাবে। আর চাই দুজন বিশ্বকর্ম্মার মত মেকানিক, যারা সবরকম কাজ জানে, কিছুতেই বিরক্ত হবে না। একটা instrument ( যন্ত্র ) ২৫ বার করতে ভাঙ্গতে হলেও না। এরা religious tendency (ধর্ম ঝোঁক) ওয়ালা মানুষ হলে ভাল হয়। Scientist ( বিজ্ঞানী ) রা disbelief ( অবিশ্বাস ) থেকে আরম্ভ করে। আমার মনে হয় belief ( বিশ্বাস ) থেকে আরম্ভ করাই ভাল। এবং সেই belief ( বিশ্বাস ) টা যত দরজা দিয়ে support ( সমর্থন ) করা যায়, prove ( প্রমাণ ) করা যায়, তার চেষ্টা নিয়ে চলা আরো ভাল।

জ্ঞানদা—কিভাবে বোঝা যাবে, কাকে দিয়ে কাজ হবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার interest (স্বার্থই) dictate করবে (নির্দ্দেশ দেবে )--তুমি কার সঙ্গে কী কথা বলে তাকে win ( জয় ) করবে। চোর হলে যে ঘরের যে তালার, যে চাবি তা জোগাড় করেই। যদি জানে সে ঘরে সোনা আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর জ্ঞানদার শরীরের দিকে লক্ষ্য করে মাতৃসুলভ স্নেহল-কণ্ঠে বললেন—Research ( গবেষণা ) করতে গেলে শরীর ভাল রাখা চাই। বেশী মোটাও না হয়, একেবারে শীর্ণও না হয়, শরীর যেন সুস্থ ও সহনশীল হয় আর পেটটা যেন ভাল থাকে। শরীরকে যদি পূজা না দাও যথোচিতভাবে, ইষ্টকৃষ্টি জ্ঞানবিজ্ঞানের ব্রহ্মাণ্ড তোমার কাছ থেকে যে পূজা পাবার তাও পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকবে। যাতে সুস্থ থাক সেই নিয়মে চলো—প্রতিষেধী উপায়ে,-যাতে কিনা infected (সংক্রামিত) না হও। গাড়ীতে, বাসে, হাটে-বাজারে, রাস্তাঘাটে যে চল infection ( সংক্রমণ ) রূপী swindlers are about ( জুয়াচোররা চতুর্দ্দিকে )।

রোগ সারান সম্পর্কে জ্ঞানদা নানাকথা বলছিলেন। সেই কথার পৃষ্ঠে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমরা কুষ্টিয়ায় একটা হাসপাতাল করেছিলাম। ৩০-৩২টা bed ( শয্যা ) ছিল। যেসব রোগীর আশা ছেড়ে দিত, তাদের উপর experiment ( পরীক্ষা ) করা হতো। রোগীর মাথা বা গায় হাত দিয়ে নাম করে তার ভিতরকার vital urge (জীবনীয় আকুতি)

বাড়িয়ে দেওয়া হতো। যদি না সারে কে কী বলবে, কে কী ভাববে, নামকরণেওয়ালাদের ভিতর তেমন ভাব থাকলে rapid effect ( দ্রুত ক্রিয়া ) হয় না। নাম করলে vibration (কম্পন ) এর সৃষ্টি হয়, ভিতরে যেয়ে তা ধাক্কা লাগায় heat ( তাপ ) হয়। যেমন বৈদ্যনাথের আদেশ হয়, bid of curative force (আরোগ্যকারী শক্তির আদেশ) হয়। রোগীকে স্পর্শ করে নাম করলে রোগীও তেমনি vital push ( জীবনীয় উদ্দীপনা ) পায়।

ছোটবেলায় একটা তেলাপোকা ভাল করে observe ( পর্য্যবেক্ষণ ) করে দেখলাম মরে গেছে। ছেলেবেলা থেকে পোকামাকড়ের প্রতি মমতা ছিল, বাঁচান যায় কিনা সেই intention ( উদ্দেশ্য ) থেকে দেখছিলাম। পায়খানা করতে বসে ওর দিকে চেয়ে নাম করতে আরম্ভ করলাম। একটু নড়ে উঠলো, সন্দেহ হলো হয়ত মরে নি। কিন্তু মরেই যে গিয়েছিল, তাত আগেই দেখেছিলাম। পরে নাম করার ফলে সে তাজা হয়ে হেঁটে চলে গেল। আর একটা গুবরে পোকা, মরা, অর্দ্ধেক খাওয়া, সেও পায়খানায় বসে দেখি। তার দিকে চেয়ে একটুক্ষণ নাম করি। নড়ে ওঠে। নাম ছেড়ে দিই আবার চুপচাপ পড়ে থাকে। ৮-১০ বার এইরকম করে বুঝলাম নামের শক্তিতেই মরা জিনিষ নড়ে উঠছে। এসব করা খুব ভাল নয়। ওদিকেই ঝোঁক যায়। তাই বেশী encourage করি ( উৎসাহ দিই ) নি।

জ্ঞানদা—অনেক সময় যে বাঁচাতে যায়, তারও ক্ষতি হতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ কাজ করতে গেলে obsession (অভিভূতি) হয়ে react ( প্রতিক্রিয়া ) করতে পারে তোমার মধ্যে। ওতে আর এক দোষ হয়। Higher tension ( উচ্চতর সম্বেগ ) dull ( নিস্তেজ ) হয়ে যায়। Miracle ( সিদ্ধাই ) দেখান ভাল না।

মণিমামা ( ভট্টাচার্য্য )—Higher tension dull ( উচ্চতর সম্বেগ নিস্তেজ ) কেন হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Concentration ( একাগ্রতা ) ব্যারামের দিকে চলে

গেলে nerve ( স্নায়ু ) গুলি ঐভাবে inclined ( আনত ) থাকে। আর obsessed (অভিভূত) হলে ত আরো ক্ষতি। Higher brain centres ( উচ্চতর মস্তিষ্ক কেন্দ্রসমূহ ) stimulated (উত্তেজিত) হবে, তা না হয়ে stimulated (উত্তেজিত) হয় lower centres (নিম্নতর কেন্দ্রগুলি)।

২৫শে মাঘ, সোমবার, ১৩৫৫ ( ইং ৭।২।৪৯ )

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে গোলতাঁবুতে তাঁর বিছানায় সুখাসীন। শীতের সকালে তাঁর বিছানায় রোদ এসে পড়েছে। তিনি আমেজের সঙ্গে তা উপভোগ করছেন। আর, বাইরে রৌদ্রে দণ্ডায়মান কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), কাশীদা ( রায় চৌধুরী ), হরিদাসদা ( ভট্টাচার্য্য ), পণ্ডিত ভাই (ভট্টাচার্য্য), ভাটুদা ( পণ্ডা ), প্যারীদা ( নন্দী ) প্রভৃতির সঙ্গে সহাস্যে কথাবার্তা বলছেন। কেমিষ্ট জ্ঞানশঙ্কর চ্যাটার্জ্জীদা আসার পর থেকে শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর খুব ভাল, বেশ একটা উল্লাস বোধ করছেন।

কেষ্টদার সঙ্গে অন্য কথা প্রসঙ্গে বললেন—আমার একটা স্বভাব আছে। কোন মানুষকে খারাপ বলে বুঝলেও স্বীকার করতে চাই না। স্বীকার করলে আমিই যেন deceived ( বঞ্চিত ) হ'য়ে গেলাম। অবশ্য তার defect ( দোষ ) কী তা বুঝি এবং তার counteracting agent ( নিরাকরণের লোক ) ঠিক করি, যাতে সে তাকে শোধরাতে পারে। কিন্তু বাইরে স্বীকার করি না। তার কারণ, ভাবি দোষটা তার একটা আগন্তুক disease (রোগ), মানুষটা তা'নয়। সে ভিতরে সুস্থ, disease ( রোগ ) টা cure ( আরোগ্য ) করতে পারলেই সে ঠিক হয়ে যাবে।

কেষ্টদা—আপনি স্বীকার না করলে ত মানুষ বিভ্রান্ত হতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' হয় না, যদি যেভাবে চলতে বলেছি সেইভাবে খারাপ প্রভাবে প্রভাবিত ও আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাব্যতা এড়িয়ে, নিজের ভিতরে তেমন একটি নির্ম্মল পরিবেষ্টনী সৃষ্টি ক'রে চলতে পারে। কূটবিশারদ হওয়া ভাল, কূটবিদ্ধ হওয়া ভাল নয়।

কেষ্টদা—যদি একটা মানুষকে ধরে ফেলে গোড়া থেকে তেমন তেমন ব্যবস্থা করি, তা কি খারাপ ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা খারাপ হবে কেন ? একজনের জ্বর। তার প্রতিকারের ব্যবস্থা যদি করেন, সে ত ভালই। তবে কোন মানুষকে বাতিল করে দেওয়া ভাল নয়। তাকে correct ( সংশোধন ) করতে চেষ্টা করা ভাল। ইষ্টনিষ্ঠাসম্পন্ন ভালবাসা, সহ্য, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় ছাড়া এটা হয় না।

কাশীদা—একটা জিনিষের ঊর্ধ্বে থাকতে না পারলে আমরা তার সদ্ব্যবহার করতে পারি না। সেইদিন যেমন বলছিলেন খাবারের কথা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা খাই, কিন্তু খাবার হয়ে যাই না, সেগুলি থেকে পুষ্টি সংগ্রহ করি। সেগুলি থেকে রস, রক্ত মাংস তৈরী হয়ে আমি যে unit ( একক ) টা আছি তাকে fulfil ( পূরণ ) করি। তেমনি আমরা যা-কিছু করি, যার সঙ্গেই মিশি তাতে identified ( একীভূত ) না হয়ে নিজেদের বৈশিষ্ট্যে অটুট থেকে সেগুলি সত্তাসম্বর্দ্ধনা, অন্য কথায় ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠায় লাগাতে যদি পারি, তবেই তা আমাদের কাজে লাগে, নচেৎ আমরাই তার খোরাক হই।

কাশীদা—মানুষের সঙ্গে co-operation এর ( সহয়োগিতার ) ধারা কেমন হবে ? আর অক্ষতভাবে তা করা যাবে কীভাবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইষ্টস্বার্থ প্রতিষ্ঠাপন্ন হওয়া লাগে কঞ্জুষের মত। তখন মানুষ প্রবৃত্তিস্বার্থে কারও সঙ্গে identified ( একীভূত ) হয় না। বিশ্বাস করে ঠকলাম, একথা আর আসে না। তার মানে বিশ্বাস করি নি। নিজেকে ঠকিয় ঠকেছি—বিহিত করণীয়গুলি না ক'রে। সত্যিকার ইষ্টস্বার্থ প্রতিষ্ঠাপন্ন হলে সে unfavourable ( প্রতিকূল ) কেও favourable ( অনুকূল ) করে নেয় সেই গরজে। যেখানে যার co-operation (সহযোগিতা) প্রয়োজন, তা সে কৌশলে জোগাড় করেই—কিছুতেই ব্যাহত না হয়ে। ভাত খেতে গেলে ক্ষেত চাষ করা লাগে, সার দেওয়া লাগে, ধান বোনা লাগে, তা না হলে ভাত খাওয়ার সুবিধা

হয় না। সেইরকম কাজের ক্ষেত্রেও co-operation (সহযোগিতা) করাই লাগে পরিবেশের সঙ্গে, তা না হলে পরিবেশের সাহায্য পাওয়া যায় না, যা কিনা বাঁচার জন্য অপরিহার্য্য। তবে real co-operation (সত্যিকারের সহযোগিতা) হয় এক আদর্শে কঞ্জুষের মত ইষ্টস্বার্থ প্রতিষ্ঠাপন্ন যারা তাদের ভিতর। তাকেই বলে একতা। তারা পরস্পর normally inter-interested (স্বভাবতঃই পারস্পরিকভাবে স্বার্থান্বিত) হয়ে ওঠে।

কাশীদা—হীন স্বার্থবুদ্ধি এতটুকু থাকলেই ত ইষ্টকাজ ব্যাহত হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কারণ সেইদিক দিয়ে গড়িয়ে যাবে। Balance (সমতা) ঠিক থাকবে না। At a great loss (বৃহত্তর ক্ষতিতে) lesser (ক্ষুদ্রতর) attain (লাভ) করতে যাবে, তাও পারবে না।

কাশীদা—Self (স্বার্থবুদ্ধি) যায় কি করে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাওয়ার দরকার নেই। তাঁকেই self (স্ব) করে নিলে হয়। ইষ্টের স্বার্থ-ই আত্মস্বার্থ। তুমি ধর কেমিষ্ট্রিকেই তোমার self (স্ব)-এর সঙ্গে জড়িয়ে নিলে। তাতেই তুমি ভাল কেমিষ্ট হতে পারবে। তাতেই তোমার, আত্মস্বার্থ সুসিদ্ধ হবে। তাই self (নিজে) কে surrended (সমর্পণ) করা ছাড়া self-interest (আত্মস্বার্থ) অধিগত করা যায় না। আর আত্মসমর্পণ মানেই সর্ব্বতোমুখী ইষ্টনিষ্ঠা।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর কথায় কথায় বললেন—বাঙ্গালদের মত মানুষ দেখি না। এমন depth (গভীরতা), এমন heart (হৃদয়)।

খুঁইমা—বহতা নদীর পাশে যারা থাকে, তারা ভাল হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এ কথা বোধহয় ঠিক।

কাশীদা—কিছুতেই বিচলিত না হওয়া আসে কি করে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা আসে কঞ্জুষের মত, নিষ্ঠুরের মত আন্তরিকভাবে ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠাপন্ন হওয়া থেকে। দেখিস্ না কৃপণ টাকার ব্যাপারে নিজের লোকসান হয় এমনতর ভাবে কিছুতেই চটে না। অপমানও তার গায় বেঁধে না। তার মানে টাকার interest (স্বার্থ) তার prominent (প্রধান)।

কাশীদা—বিচলিত হব না, এই বুদ্ধি নিয়ে চললে হয় না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠাপন্নতাই একমাত্র জিনিস যা আমাদের চলনাকে যথা-প্রয়োজন নিয়ন্ত্রিত করে। বিচলিত হব বা হব না, সেটা বড় কথা নয়। প্রধান কথা হলো—যাতে ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ থাকে, তেমন ভাবে চলব। ঐ বুদ্ধি থাকলে, যেখানে কিনা তাঁর গায় হাত পড়বে, সেখানে আমার মর্ম্ম দগ্ধ হয়ে যাবে। আমি চুপ করে থাকব না। বিহিত পরাক্রম নিয়ে রুখে দাঁড়াব। গরুর বেলায় দেখিস না, তার বাচ্চার জন্য কেমন করে? বিচলিত হওয়া না হওয়ার বালাই নেই। ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠাকে জীবনের ব্রত করে চলব—এই হ'লো মূল কথা। ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠা কথাটা বড় accurate (ঠিক) কথা।

কাশীদা—আমার ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠার ভাবটা সিদ্ধ হলে সেই ভাবটাই ত সঞ্চারিত করতে পারি মানুষের ভিতর।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি যদি কঞ্জুষের মত, নিষ্ঠুরের মত বাস্তবে ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠাপন্ন হও, তোমার চাওয়া, চলা, ভাবা, কথা, ভাল মন্দ, সুখ দুঃখ, উন্নতি অবনতির দাঁড়া যদি একমাত্র ঐইই হয়, তবে তা অন্যের মধ্যে imparted (সঞ্চারিত) হবেই। তবে সেই মানুষটার gate (দরজা) টা open (উন্মুক্ত) করার জন্য, তার গ্রহণোন্মুখ মনোভাবটা সৃষ্টি করার জন্য, তার উপরের ময়লাটা সরিয়ে দেবার জন্য যতটুকু manipulation (সঞ্চালনা) দরকার, তা করতে হয় tactfully (সুকৌশলে)। তুমি ত magnet (চুম্বক) হয়েই আছ, তখন ঐ লোহা এসে টক করে তোমাতে লেগে যাবে। নিজে বাস্তবে তেমন হওয়া আর তার ক্ষুধাটা জাগান এই ত যাজন। চরিত্রটা ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠাপন্ন হলে মানুষের সব বৃত্তিই তাঁর প্রতিষ্ঠার সহায়ক হয়। শুনেছি সেইন্ট জন ছিলেন dyspeptic peevish nature-এর (অজীর্ণতাপ্রসূত খিটখিটে মেজাজের)। কেউ যদি প্রভু যীশু সম্বন্ধে কোন রকম সংশয়োক্তি করত, তখন তিনি চটে গিয়ে আর্ত্ত ব্যাকুলভাবে এমন ভঙ্গীতে প্রভুর কথা কইতেন, যে তাতেই আবার মানুষ

গলে যেত। জনের প্রতি সঙ্গে সঙ্গে ভগবান যীশুর প্রতি প্রবলভাবে আকৃষ্ট হতো। Self ( হীন স্বার্থ ) থাকলে মানুষের ego (অহং) থাকে। Tussel (দ্বন্দ্ব) হয়। টানা হ্যাঁচড়া হয় মানুষের সঙ্গে। ওটা আবার শরীর মনের স্বাস্থ্যের পক্ষেও ক্ষতিকর। তাতে তোমার সে পবিত্র মহিমাময় রূপ খুলবে না, যে রূপ দেখে মানুষ অনিবার্যভাবে আকৃষ্ট হবে তোমার ও তোমার ইষ্টের প্রতি। নির্ম্মল হও, নিষ্কলুষ হও, প্রবৃত্তিমেঘমুক্ত হও। মানুষের মধ্যে ভগবত্তা আছেই। তোমার ভগবত্তা বিকশিত হলে মানুষ স্বতঃই আকৃষ্ট হবে তোমার প্রতি। ঠাকুর ভগবান বলে ভেউ ভেউ করে কাঁদলে বা ভিরকুটি ধরলে মানুষের মন ভিজবে না, যতক্ষণ সত্যি ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠাপন্নতা প্রকট না হয় তোমার বাস্তব চরিত্রে।

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বা সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥"

( সকল ধর্ম্মাধর্ম্মের অনুষ্ঠান পরিত্যাগ পূর্ব্বক একমাত্র আমার শরণাপন্ন হও। আমা হতে অতিরিক্ত কোন বস্তুই নাই, এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয় করে আমাকে সর্ব্বদা স্মরণ কর। আমি সকল ধর্ম্মাধর্ম্ম বন্ধন পাপ থেকে মুক্ত করব। অতএব, শোক করো না। ) ঐ ছাড়া জিনিষ নাই।

"ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥"

(পরমেশ্বরের জন্য ভৃত্যবৎ কর্ম্ম করছি, এই বুদ্ধি নিয়ে আমাতে সমস্ত কর্ম্ম সমর্পণ করে ফলাভিসন্ধিরহিত, মমত্বহীন ও শোকশূন্য হয়ে তুমি যুদ্ধ কর)। —actively (সক্রিয়ভাবে) এমনটি হয়ে ওঠ। মামলোৎ অতটুকু। কঠিন কিছু না।

যুঁইমা—এই ভাবে চললে কি সংঘাত বেশী আসে ? যেমন দেখি পঞ্চপাণ্ডবের জীবনে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সংঘাত যাই আসুক, মানুষ যখনই পুরোপুরি ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠাপন্ন হয়,তখনই সব অবস্থার মধ্যে সে জয়ী হয়ই। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পর পর জয় হ'চ্ছে—এতে অর্জ্জুনের মনে একটু আত্মগৌরবের ভাব আসলো। একদিন প্রথমে শ্রীকৃষ্ণের পদবন্দনা না করে অর্জ্জুন অহঙ্কার বশে

তাঁর মুখের দিক চাইতে চাইতে আসলেন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের মনোভাবটা বুঝলেন। তা বুঝে তিনি অর্জ্জুনের উপর যুদ্ধের ভার দিয়ে দ্বারকায় গেলেন। অর্জ্জুন বিশেষ আপত্তি করলেন না। একলা যুদ্ধে গিয়ে পদে পদে বিধ্বস্ত হতে লাগলেন। তখন তাঁর দর্প চূর্ণ হলো। তাঁর বোধে আসলো যে শ্রীকৃষ্ণের দয়া ছাড়া তিনি কত অসহায়। তখন তাঁর শরণাগত হতে বাধ্য হলেন। যুদ্ধের ঐ ভয়াবহ বিপদের মধ্যে সামান্য সাফল্যে অর্জ্জুনের মনে অহমিকা ঢুকে গেল। শ্রীকৃষ্ণের দয়ার কথা সাময়িকভাবে ভুলে গেলেন।

প্যারীদা—ঐ অবস্থার মধ্যে অহঙ্কার ঢোকে কি করে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমাদের মধ্যে ঢোকে কি করে? তোমরাও ত এক একজন অর্জ্জুন। সক্রিয়ভাবে সম্যক নিবেদিত, উৎসর্গীকৃত না হলে যা হবার, তা সবার ক্ষেত্রেই হয়। অর্জ্জুনের অর্জ্জুনের মত, তোমাদের তোমাদের মত। তাই-ত পদে পদে নাস্তানাবুদ হও, তবু চেতনা জাগে না।

কাশীদা—Self (স্বার্থবুদ্ধি) টা ছাড়ান যায় কি ভাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওখানেই self (স্বার্থবুদ্ধি) টা জড়িয়ে নিলে হয়। কত জায়গায় জড়িয়ে, কত আঁকুপাকু, ছুটোছুটি, প্রাণান্ত পরিশ্রম ক'রে, দম বেরিয়ে যায়। যারা তা করে, তারা বোঝে ঠেলাটা কী। আর এটা ত সোজা কথা—আমি চাই achieve (অধিগত) করতে। আর সেটা তাঁর জন্য, বিষ্ণুপ্রীতির জন্য। তাতে অহং-এর ভার কত কমে গেল। আত্ম-প্রদক্ষিণের গোলকধাঁধায় প'ড়ে নানা অভিভূতিতে ঘুরে মরার ব্যর্থ ক্লান্তি নেই। আছে fruitful activity (সার্থক কর্ম্ম), আছে দক্ষতা, আছে আত্মপ্রসাদ, আছে কত সহজ, স্বচ্ছন্দ চলন। রাধিকা বলে একজন কর্ম্মী ছিল প্রথম আমলে। সে জমি-জমা চাষ-বাস দেখত। যা' কিছু যেখানে সংগ্রহ করতে পারত, সব আশ্রমের জন্য নিয়ে আসত। নিজের কোন চাহিদা ছিল না। কত দরদের সঙ্গে কাজকর্ম্ম করত, এখানে সেখানে গিয়ে সৎসঙ্গ করত আর আনন্দবাজারের জন্য সংগ্রহ করত। আশ্রমের কুটোটা পর্য্যন্ত নষ্ট হতে দিত না। ঠাকুরের সব কিছু রক্ষণাবেক্ষণের ভার যেন তার

উপর ন্যস্ত। আজকাল বীরেনদার (ভট্টাচার্য্যের) ঐ রকম আছে কতকটা।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর গোলতাঁবুতে বসেছিলেন। সামনে পূজনীয় বড়দা ছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের লেপ তৈরীর জন্য অফিস থেকে মাত্র ত্রিশটি টাকা আনা হয়েছে। সেই সম্পর্কে তিনি বলছিলেন—আমার অফিস থেকে টাকা নিতে ইচ্ছা করে না, কিছু নিলেও পুরিয়ে দিতে ইচ্ছা করে। ভাবি মানুষের খোরাকিতে হয়ত টান পড়বে। ত্রিশ টাকায় সবগুলি লোকের একবেলা নুনের ব্যবস্থা অন্ততঃ হবে। তাতে হাত পড়ে আমার ভাল লাগে না, গলা আটকে ধরে। Self-sufficient (স্বয়ং-সম্পূর্ণ) অবস্থা যদি দেখতাম, তাহলে নিতাম।

রাত্রে কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) বেদসংহিতা, পুরাণ ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সেই প্রসঙ্গে বললেন— পুরাণ না বলে পুরণ বললে হয় না? দেখেন ত dictionary (অভিধান)।

অভিধান এনে দেখা গেল পূরণ পূর-ধাতু থেকে এবং পুরাণ পৃ-ধাতু থেকে এসেছে এবং উভয় ধাতুর অর্থই পূরণ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—জিনিসটা আদতে পূরণ। সত্যের পূরণ যেমন বিষ্ণু-পুরাণ মানে fulfilment of truth as given by Visnu (বিষ্ণুপ্রদত্ত সত্যের পূরণ)।

কাশীদা আজ বিকালের কয়েকটি বিস্ময়কর ঘটনার কথা বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ কঞ্জুষের মত ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠাপ্রাণ যদি হয় কী যে ঘটে যায়, কিছু বাকি থাকে না। কত miracle (অলৌকিক ব্যাপার) যে ঘটে, বলে শেষ করা যায় না। কটা লোক হ'লেই ভারত ও তার আশপাশের দেশগুলি বদলে যায়। তাদের প্রভাবে আবার আরো বৃহত্তর পরিবেশের পরিবর্ত্তন আসে।

কেষ্টদা—একটা গুচ্ছের বাস্তবে ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠাপন্ন হওয়ার সর্ত্ত যে এর মধ্যে আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা হওয়া কিন্তু অত্যন্ত সোজা—অতি সোজা। বলেই তিনি উল্লসিত হাসিতে সবাইকে মাতিয়ে তুললেন।

২৬শে মাঘ, মঙ্গলবার, ১৩৫৫ ( ইং ৮।২।৪৯ )

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে গোল তাঁবুতে ভক্তবৃন্দ-পরিবেষ্টিত হয়ে উপবিষ্ট।

শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ বললেন—সত্তা আছে ও তার সঙ্গে আছে প্রবৃত্তি। দুঃখের কারণ আছে, দুঃখও আছে, আবার তার নিরাকরণও আছে। এই তিনটিই বাস্তব সত্য।

পরে মতিদা ( চ্যাটার্জি )কে বললেন—শুদ্ধ-সত্ত্ব মানুষ যারা, তারা সামান্য go-between (দ্বন্দ্বীবৃত্তি) বা চলার ব্যত্যয়ে বেঘোরে পড়ে যায়। দোষ ক'রে তারা একটুও হজম করতে পারে না। দেখেন না মেথরের গু টেনেও হয়ত কিছু হয় না আর সদাচারী যে সে অল্প ত্রুটিতেই অসুস্থ হয় পড়ে।

একটু পরে বললেন—৫ জন মানুষ কঞ্জুষের মত ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠাপ্রাণ হলে দুনিয়ার তার চাপ সওয়া মুস্কিল। তারা তোলপাড় করে দিতে পারে। মন দোটানা করবেন না, হয় আমি, না হয় সংসার একটা ধরেন। আমি বলতে চাই, আপনার পিছে কেউ আছে বা নেই, তা নিয়ে আদৌ বিব্রত হবেন না। একমাত্র ইষ্টকে নিয়ে যদি থাকেন, তখন সব ঠিক থাকবে! সেই আমলে কিশোরী, মহারাজ, গোঁসাই পাগলের মত কী করেছে আর না করেছে! তার মধ্যে পণ্ডিত হলো গোঁসাই। ওরা দুজন ত লেখাপড়া তেমন জানত না।

এমন হওয়া চাই একটা নিঃস্বাসও বইবে না ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠা ছাড়া অন্য কিছুর জন্য। কঞ্জুষের মত, মধুমক্ষিকার মত দুনিয়ার প্রত্যেকটি জিনিস থেকে ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠা চুষে নেবেন, ও ছাড়া কিছু চাইবেন না, জানবেন না। চলন-চরিত্র, আচার-ব্যবহার, কথা-কায়দা কেবল তাঁকেই জাহির করবে। ঠাকুর আছেন আমার, এটা প্রত্যেকটা পদক্ষেপে যদি ফুটে না ওঠে ভক্তি-আপ্লুত ভঙ্গিতে, তাহলে মানুস মজবে কেন? বাইরে যান ত তেমনি অকাট্য হয়ে যান, কাজ করেন ত ভাল করে করেন—ঘরবাড়ি, ছেলেপেলে, অভাব অভিয়োগ, টাকা পয়সা, রোগবালায়—কোনটারই তোয়াক্কা না ক'রে।

দুপুরে ভোগের পর শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর ঘরে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। মায়েদের মধ্যে অনেকে এবং কাশীদা ( রায় চৌধুরী ), হরিপদদা ( সাহা ) প্রভৃতি ছিলেন।

কাশীদা জিজ্ঞাসা করলেন—ভাল কাজ করলেই ত ভাল ফল পাওয়া যায়। তার মধ্যে ইষ্টস্বার্থ কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইষ্টস্বার্থে ভাল কাজ করলে সেগুলি adjusted (বিন্যস্ত) হয়, নচেৎ সত্তার থেকে বিচ্ছিন্ন কতকগুলি স্বতন্ত্র lump (পিণ্ড) মত হয়ে থাকে।

কাশীদা—ইষ্টস্বার্থ হোক না হোক ভাল কাজের ফল ত মানুষ পাবেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কর্মের ফল পাবে, wisdom ( প্রজ্ঞা )-এর ফল পাবে না। ইষ্ট মানে ভালর একটা materialised ( বাস্তবায়িত ) কেন্দ্র—তাঁকে অবলম্বন করেই ভালর সার্থকতা। কি রকম ! ম্যালেরিয়ার রোগী ২৫ জনকে ২৫ রকমে হয়ত সারালে। রোগী সারল কিন্তু তোমার কোন analysis ( বিশ্লেষণ ) নেই কেন সারল। ম্যালেরিয়ার কেন্দ্র অর্থাৎ কারণ সম্বন্ধে তোমার কোন ধারণাই নাই। করে যাচ্ছ, quack (হাতুড়ে) রা যেমন করে। তাতে আন্দাজে রোগী সারতে পারে, পয়সাও হতে পারে। কিন্তু knowledge (জ্ঞান) হবে না, কারণ তোমার চিকিৎসা concentric ( সুকেন্দ্রিক ) হলো না।

২৭শে মাঘ, বুধবার, ১৩৫৫ (ইং ৯।২।৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে গোলতাঁবুতে আছেন। পূজনীয় বড়দা, কেষ্টদা ( ভট্টাচার্য্য ), দক্ষিণাদা ( সেনগুপ্ত ), রাজেনদা ( মজুমদার ), পণ্ডিতভাই প্রভৃতি উপস্থিত।

কেষ্টদা কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন—অনুভূতির শারীরতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয় macro-cosm ও micro-cosm

(ব্রহ্মাণ্ড ও পিণ্ড) এই দুটোর মধ্যে যেমন মিল আছে, macro-cosmic physiology ও micro-cosmic physiologyর (ব্রহ্মাণ্ডের দেহবিধান ও পিণ্ডের দেহবিধানের) মধ্যে তেমনি সঙ্গতি আছে। বাইরেরটাও যেমন করে জানি, ভিতরেরটাও তেমনি করে জানি। বাইরে যা ঘটে তা যেমন বহিরিন্দ্রিয় দিয়ে জানি, ভিতরে যা ঘটে তা তেমনি অন্তরেন্দ্রিয় দিয়ে জানি। আমরা চোখ দিয়ে যে দেখি তাও মস্তিষ্কস্থিত দর্শনকেন্দ্র উত্তেজিত না হলে দেখতে পারি না। বাস্তব দৃশ্যবস্তুও থাকা চাই, আবার তার সাড়ায় মস্তিষ্কনিহিত দর্শনকেন্দ্রও উত্তেজিত হওয়া চাই। এই দুটো জিনিসই বাস্তব। এর মধ্যে কল্পনার কোন স্থান নেই। অনুভূতিমূলক দর্শন, শ্রবণও তাই। একাগ্রতার ফলে ভিতরে বাস্তবে যা ঘটে, তাইই মস্তিষ্কস্থিত শ্রবণ ও দর্শনকেন্দ্র দিয়ে শোনা ও দেখা যায়। এটা কাল্পনিক কোন বস্তু নয়। সবটা ষোল আনা বাস্তব। এও বিজ্ঞান।

কেষ্টদা এরপর অন্যত্র গেলেন। খানিকটা পরে কেষ্টদাকে আসতে দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর দিকে চেয়ে হঠাৎ বললেন—এক একটা মানুষ যেন এক একটা wave ( তরঙ্গ ), shooting wave (তীব্রগতিসম্পন্ন ঢেউ), বীচি, তরঙ্গ, ঢেউ।

পূজনীয় ছোড়দার এক ছেলের অসুখ, রবিদা ( ব্যানার্জি ) চিকিৎসা করছেন, শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছা ঐ সঙ্গে বিশেষ একটা অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ চলুক। প্যারীদা বললেন—হয়ত রবিদার তাতে আপত্তি থাকতে পারে।

সেই কথা শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমি চাই curopathy ( আরোগ্যপ্যাথি )। আমি effectএ ( ফলে ) biased ( পক্ষপাতী ) হতাম কিন্তু theory ( উপপত্তি )তে biased ( পক্ষপাতী ) হতাম না। আমি অ্যালোপ্যাথিক ওষুধও হোমিওপ্যাথিক মাত্রায় দিয়ে ফল পেয়েছি। আমার মনে হয়, অ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, বাইওকেমিক, কবিরাজী আলাদা কিছু নয়। সবটা হল বিশেষ বিশেষ মাত্রাভিত্তিক আরোগ্য বিজ্ঞান।

খানিকটা পর রায়সাহেব পুলিন চ্যাটার্জি আর একজনকে সঙ্গে নিয়ে

আসলেন। পূজনীয় বড়দা এবং আরো অনেকে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে ছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—বৈধানিক সংস্থিতির শ্রেণীগত বৈচিত্র্যই বর্ণ-বৈশিষ্ট্য। যেমন অতসী ফুলের দুই জাত। একরকম লাল আর একরকম সাদা। ···বিবাহের সময় দেখতে হয়, পুরুষ ও নারীর জৈবী সংস্থিতি ও ব্যক্তিগত প্রকৃতির মধ্যে শুভসঙ্গতি আছে কিনা। প্রতিলোম-সংমিশ্রণে সন্তানের cohesive coherence (বৈধানিক কোষ সংলগ্নতার সঙ্গতি) ঠিক থাকে না। স্ত্রী স্বামীর nurturing (পরিপোষণী) হয় না সর্বতোভাবে। তার ফলে প্রতিলোমজাতকের মধ্যে অকৃতজ্ঞতা, প্রলোভনে আত্মসমর্পণ ইত্যাদি দোষ দেখা দেয়। বিহিত-বিবাহজাত সন্তান সাধারণতঃ উৎসকে কখনও অস্বীকার করে না, তার association of ideas (ভাব-অনুষঙ্গ) প্রায়ই তুখোড় হয়। সে ইষ্টের স্বার্থ কিছুতেই বিসর্জন দেয় না।

পুলিনবাবু—সঠিক বিবাহের condition (সর্ত) কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—স্বামী ও স্ত্রী সমবিপরীত সত্তা হওয়া চাই। উভয়ের মধ্যে প্রকৃতিগত সামঞ্জস্য চাই। পুরুষ বংশ, বিদ্যা, চরিত্র, যোগ্যতা, নিষ্ঠা, বয়স ইত্যাদি দিক দিয়ে নারীর থেকে উন্নত হওয়া বাঞ্ছনীয়। মেয়ের মধ্যে ঐ পুরুষকে বরণ করার নেশা থাকা চাই। এমনতর শ্রদ্ধা থাকা চাই যাতে সে মনে করে তাঁকে পেলে তার জীবন ধন্য হয়ে যাবে।

আগে ঘটকরা সব দিক মিল করে বিয়ে দিত। তখন মানুষের অভাব হত না। Generation after generation (বংশপরম্পরায়) মানুষ পাওয়া যেত।

পরে শ্রীশ্রীঠাকুর কথা প্রসঙ্গে বললেন—হোমিওপ্যাথ হন, কিন্তু হোমিওপ্যাথির গর্তে পড়বেন না। অ্যালোপ্যাথ হন, কিন্তু অ্যালোপ্যাথির গর্তে পড়বেন না, curopath (কিউরোপ্যাথ) হন, যাতে রোগ সারে, তাই করেন।

জনৈক দাদা—রোগীর বিশেষ খাদ্যের প্রতি আগ্রহ। তাই খেয়ে রোগ সারার দৃষ্টান্ত ত দেখা যায়!

শ্রীশ্রীঠাকুর—বুঝতে হয় ওইটের deficiency (খাঁকতি) ছিল। আবার লোভেও অমনতর আগ্রহ হয়। পেটের অসুখের রোগী পায়স খেতে চায় লোভে। কোন্‌টা deficiency (খাঁকতি) কোন্‌টা লোভ তা determine (নির্ণয়) করা ডাক্তারের কাজ।

একটু থেমে চিকিৎসার কথা প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন,—অনেক সময় বলে, অ্যালোপ্যাথিতে রোগ চাপা দেয়। চাপা দেওয়া মানে কারণ দূর না করে সাময়িক রোগ কমান। কিন্তু যেমন ধরেন, কুইনাইনে ম্যালেরিয়ার জীবাণু নষ্ট করে। কিন্তু মাত্রা আছে। তার আগে জ্বর ছাড়লেও কুইনাইন ছাড়তে নেই। সেই অবস্থায় পরে জ্বর হলে চাপা দেওয়া বলা ঠিক হবে না। বলা চলে, পুরো চিকিৎসা করা হয় নি। আবার, aggravation (রোগবৃদ্ধি) কথাটা সম্বন্ধেও অনেকের বোধ নেই। রাবারটা টেনে লম্বা করা হলো, তখন তার প্রবল প্রবণতা হয় স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার। হোমিওপ্যাথিক ওষুধ ব্যবহারের ফলে যখন রোগ সারার প্রাক্ লক্ষণ হিসাবে সাময়িকভাবে রোগ বাড়ে, তাকে বলে aggravation (রোগবৃদ্ধি) কিন্তু ঠিক ওষুধ প্রয়োগ না করার ফলে রোগের নিজস্ব গতিতে যখন রোগের বাড়াবাড়ি হয় তখন তাকে কিন্তু হোমিওপ্যাথি মতে aggravation (রোগবৃদ্ধি) বলা চলে না। হোমিওপ্যাথি মতে যে রোগবৃদ্ধি রোগনিরাময়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে সংঘটিত হয়, তাকে এ্যাগ্রাভেশন বলা যায়। চিকিৎসকের যদি এ বিষয়ে সঠিক বোধ না থাকে, তা হলে বুঝতে হবে, চিকিৎসা ব্যাপারে তার হাতে খড়িই হয় নি।

জোতিষীদেরও সূক্ষ্ম বুদ্ধি চাই। নইলে বিচারে ভুল করে বসে। মানুষ concentric (সুকেন্দ্রিক) না হলে, তার সূক্ষ্মবুদ্ধি খোলে না।

পুলিনবাবু—শান্তির পথ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—শান্তির পথ হলো ইষ্ট বা সদগুরুতে unrepelling adherence (অচ্যুত নিষ্ঠা)—কঞ্জুষের মত সব দিক দিয়ে, সব রকম

ভাবে। প্রবৃত্তির পিছনে ছুটি, তার একটার সঙ্গে একটার মিল নেই, তবু এক এক সময় এক একটা নিয়ে obsessed (অভিভূত) হয়ে থাকি আর সত্তাকে শীর্ণ করি। কিন্তু নিস্তার পেতে হলে আমাদের বাইরে একটা কিছু থাকা চাই। জলের স্রোত আমাদের টেনে নিয়ে যায়। সাঁতার জানি না, প্রবল স্রোত। তাই,বাইরে ডাঙ্গায় শক্ত খুঁটি যদি একটা থাকে এবং তার সঙ্গে শক্ত শিকল দিয়ে অচ্ছেদ্যভাবে বাঁধা যদি থাকি, তবেই জলটা enjoy (উপভোগ) করতে পারি, সাঁতার কাটতে পারি অক্লেশে। খুঁটি ঐ ইষ্ট—সত্তা-সম্বর্দ্ধনী-সম্বন্ধীয় জ্ঞান যিনি আচরণ করে লাভ করেছেন। তাঁর উপর unrepelling (অচ্যুত) টান চাই, দড়ি ছিঁড়লে হবে না। আমাদের ভিতরে আছে libido (সুরত), আছে cohesive urge (সংসক্তির আকৃতি), আছে আসক্তি। সেটা তাঁতে unrepelling (অচ্যুত) হলে, ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠায় উপচয়ী হলে তার doctrine (নীতি) গুলি মূর্ত্ত হয়ে ওঠে আমাদের মধ্যে। তার ফলে আমরা সপরিবেশ তাঁতে অনুপ্রাণিত হই। তখন complex (প্রবৃত্তি) গুলি normally adjusted (স্বাভাবিকভাবে নিয়ন্ত্রিত) হয়, জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে, experience (অভিজ্ঞতা)গুলি meaningfully integrated (সার্থকভাবে সংহত) হয়, unified হয়। আমরা wise (প্রাজ্ঞ) হয়ে উঠি। জ্ঞান হয়, কিন্তু জানার অহঙ্কার থাকে না তাতে। আমরা সর্বদা মনে করি—তাঁর দয়ায়, তাঁর রক্ষণশক্তিতে যা কিছু হয়েছে।

পুলিনবাবু—মন্দ বুঝেও ত আমরা অনেক সময় তা ছাড়তে পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ রকম একজনের উপর টান যদি হয়, তাহলেই তা সহজ হয়।

পুলিনবাবু—টান আসবে কি করে? সদগুরু বোঝা যাবে কি করে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—টান থাকলে যেমন করে, তেমনি করতে করতে টান হয়, করতে হয়, বলতে হয়, ভাবতে হয়। আর তাঁর সঙ্গ করা লাগে।

সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধয়া দৃষ্টিশুদ্ধতা,<br>
দৃষ্টিশুদ্ধের্হি বিশ্বাসঃ, বিশ্বাসাৎ নির্বিচারতা,<br>
নির্বিচারাৎ ভবেৎ প্রেমঃ, প্রেম্নশ্চাত্মসমর্পণম্।

তাঁকে দেখে নিজের দুর্বলতা ধরা পড়ে। তাঁর প্রতি ভালবাসা থাকলে তা শোধরাবার প্রবৃত্তি হয়। যে শিক্ষকের প্রতি টান থাকে, তাঁর subject (বিষয়)টা ভাল করে পড়তে ইচ্ছা করে। সদগুরুর প্রতি ভালবাসা মূর্ত্ত হওয়া চাই চলনে, চরিত্রে, ভাবে, ভঙ্গীতে, কর্ম্মে, বাক্যে, প্রতিটি শ্বাসে-প্রশ্বাসে, প্রত্যেকটি পদক্ষেপে।

পুলিনবাবু—ভাল বুঝেও করা যায় না কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধরেন বেশ্যাসক্ত, জোচ্চোর, লুচ্চা আপনি। কিন্তু আপনার উপর অন্য কেউ জোচ্চুরি করে, আপনার স্ত্রীর উপর লোভ ক'রে কেউ তাকে টেনে নিয়ে যায়, তা কিন্তু আপনি চান না। আর, আপনি নিজেও বোঝেন যে আপনি যা করেন তা খারাপ। দশজনে মন্দ বলে তাতেও মনে কত অস্বস্তি, অশান্তি হয়, তবু obsessed (অভিভূত) হয়ে আছেন, তাই ঐভাবে চলতে পারছেন। Obsession (অভিভূতি)এর খাতিরে নিজের ভাল ignore (উপেক্ষা) করছেন, এতখানি টান আছে ঐ সবের উপর। কিন্তু ঐ টানটা যদি ঘুরিয়ে দেন তাঁর উপর, তবেই কিন্তু চলন বদলে যায়। সব চলাটা ধীরে-ধীরে ইষ্টাভিমুখী হয়। তাই বলি—সাঁতার শিখতে জলে নামা লাগে। দেই শালা ঝাঁপ, যা থাকে কপালে। তাঁকে ধরেন।

পুলিনবাবু—ধরুন শুরু করলাম। ইচ্ছা কি হবে পালন করতে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মদ খাওয়াটাই বা কতদিনে শিখলাম, বেশ্যাবাড়ী যাওয়াই বা কতদিন এস্তামাল হলো?

পুলিনবাবু—কামিনীতে আসক্তি যায় কিসে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সোনা! মনটাই ত ওখানে নেয়। মনটা যদি তাঁতে ফেলা যায়, তখন আর চিন্তা কী? কথাটা বলে রতিক্রীড়া, ওর ভিতর দিয়ে well-being (স্বস্থতা) feel (বোধ) করা যায়, যদি ওর উপর control (আধিপত্য) থাকে। আর, ওটার enjoyment (উপভোগ) হয়, যখন ওর above-এ (ঊর্দ্ধে) থাকি। যাই করি, সবার আগে সত্তা। তার কত দিক আছে। চাই self-protection (সত্তা পালন), self-

preservation ( সত্তা সংরক্ষণ ), self-reproduction (সত্তার জনন)। এই প্রবণতাগুলি থেকে আসে কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মোহ, মাৎসর্য্য। যা সত্তাকে ব্যাহত করে তাকে নিরোধ করি। তাকে পুষ্টি দেয় যা তা' কামনা করি। পুষ্টি ও পরিবর্দ্ধন দুই-ই চাই। পুষ্টি না হলে পরিবর্দ্ধন হয় না। চাই সৎ অর্থাৎ সত্তা বা অস্তিত্ব, চিৎ অর্থাৎ চেতনা এবং আনন্দ অর্থাৎ বর্দ্ধনা। সব বৃত্তি দিয়ে সৎ, চিৎ, আনন্দ অক্ষুণ্ণ রাখা চাই, পুষ্ট করা চাই। রসগোল্লার লোভে সহ্যের অতিরিক্ত খেলেন, অসুখ হলো। আপনি খেলেন না রসগোল্লা, রসগোল্লা আপনাকে খেল। কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি সবটার বেলায় ঐ এক কথা। ধর্ম তাই, যাতে আপনার সত্তা সুস্থ ও সম্বর্দ্ধিত হয়—পারিপার্শ্বিক নিয়ে। যেই এই jurisdiction এর ( এলাকার ) বাইরে গেলেন, প্রবৃত্তি খেতে আরম্ভ করলো সত্তাকে।

পুলিনবাবু—সীমারেখা ধরে চলা শক্ত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সহজ, অতি সহজ, কত আরাম। ফুর-ফুরে হাওয়া বইতে থাকে। চললেই বোঝা যায়।

অপর দাদাটি বললেন—আপনি একে সোজা পথ বলেন কিন্তু কত বাধা ত আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—করেন। একজন পড়ছিল—হাঁটিতে শেখে না কেহ না খেয়ে আছাড়। খারাপের পথে যেয়ে কেবল অছাড়ই খাবেন। ফয়দা কিছু হবে না। আর এ পথে চলতে গিয়ে খেলেনই না হয় কটা আছাড়। ধীরে-ধীরে সঠিক পথে চলা ত শিখবেন। সেই ত পরম লাভ। বিপথে চলতে গিয়ে কেবলই আছাড় খেতে ইচ্ছা করে, আর সৎ চলন আয়ত্ত করতে কয়েকটা আছাড় খেতে ইচ্ছা করে না বুঝি !······ইচ্ছা মানে পুনঃ পুনঃ করন। অভ্যাস করে দেখেন। ইষ্টের পথে চলে জীবনটা উপভোগ করার স্বাধীনতা যখন আমাদের আছে, তখন সে সুযোগ আমরা গ্রহণ করব না কেন ? একে কয় freedom (স্বাধীনতা), independence (অনধীনতা) নয়। একটা কথা ঠিক আছে আমাদের, যাই করি শেষ পর্য্যন্ত বাঁচতে চাই।

মতিদা—কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভগবানের সন্তান কিনা। তাই সত্তায় স্বস্থ থেকে ভোগ করতে চাই—লীলায়িত পরিচলনে-আলিঙ্গনে গ্রহণে—পরস্পর পরস্পরকে ত্যাগ করতে নয়, কিন্তু উপভোগ করতে। ত্যাগ করতে চাই তাই, যা সত্তা-সম্বর্দ্ধনার প্রতিকূল। মরতে চাই না। তাই চাই বাঁচার অনুকূলে সব কিছু নিয়ন্ত্রিত করতে, অন্বিত করতে, বিন্যস্ত করতে। তাই ছেলেকে ৫ বছর বয়সে চূড়াকরণ করাতো অর্থাৎ গুরুগৃহে পাঠাতো, যাতে তাঁর উপর টান হয়, সে আজীবন তাঁতে সক্রিয়ভাবে মুগ্ধ হয়ে থাকে boastfully (সগৌরবে)।

পুলিনবাবু—গুরুগিরির অনেক খারাপ ফল আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর দৃপ্ত কণ্ঠে বললেন—খারাপটা দেখি, কিন্তু মূল ভালর হাড়ের কুচি, চুলের ডগা, শেষ রেশটুকু আঁকড়ে রেখেছে যারা—নিজেদের সর্বনাশ করেও; —ঐ সূত্র ধরে মূল বস্তুটা আবার হয়ত আমরা ধরতেও বা পারি। আমরা কী করেছি তাদের জন্য ? তাদের খেতে দিই নি। তখন তারা মাথার উপর পা তুলে দিয়ে কোনভাবে শালিয়ানা আদায় করেছে। আগে কেমন সামাজিক শাসন ছিল, কারও বেচাল চলার জো ছিল না। আজ শ্রদ্ধা গেছে, সম্ভ্রম গেছে। শ্রদ্ধা থাকলে সম্ভ্রম থাকে। শোনে, করে। আগে ছিল instinct (সহজাত সংস্কার) মাফিক কাজকর্ম ভাগ। কুমোর, চামার, বামুন সবারই কাজ ঠিক করা ছিল। বামুন জুতো বানান শেখাতে পারেন, কিন্তু তাঁর জুতো বানিয়ে পয়সা নেওয়ার জো নেই।

শিক্ষক হিসাবে দক্ষিণা নিয়েই খুশী থাকতে হবে তাঁকে। আগে ছিল প্রত্যেকটি শ্রমিক ধনিক, প্রত্যেকটি ধনিক শ্রমিক। পরস্পরের অকাট্য সম্বন্ধ ছিল। Strike (ধর্মঘট) লাগতে পারত না। গাতাপ্রথায় কাজ আমরাও গ্রামে দেখেছি। কতখানি সহযোগিতা আগে ছিল। আগে বৃত্তি-অপহরণ মহাপাপ বলে গণ্য হতো। আজ বৈশ্য চামারের কারখানা খুলে তার ভাত মারলেন, বৈশ্যকর্ম করলেন না। হামেশা এ সব চলছে। অথচ সমাজে উচ্চবাচ্য নেই।

পুলিনবাবু—আমি ব্রাহ্মণ, কিন্তু পেট ভরে না সে বৃত্তিতে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওরে বাবু, ব্রাহ্মণের কী বিরাট income (আয়) ছিল! তবে উঞ্ছবৃত্তি। Love-offer (ভালবাসার দান) আপনার প্রাপ্য। চাকরিতে কত টাকা পান? কতজনকে পালন করেন? বামুনের কাজ নিয়ে থাকলে আপনার বাড়িতে থেকে খেয়ে পড়ে শিখে কত মানুষ ধন্য হয়ে যেত। আজ করা যাচ্ছে না। একটা adjustment (বিন্যাস) হলো না। ধরেন black-marketing (চোরা কারবার) করতে আপনি আজ প্রকারান্তরে বাধ্য। একটা প্রয়োনীয় ওষুধ হয়ত খোলা বাজারে পাওয়া যায় না। তখন প্রাণের দায়ে কালো বাজার থেকে কেনা লাগে। এই অন্যায় ব্যবস্থাকে প্রশ্রয় দেওয়াও ত পাপ। কিন্তু সরকার ও সমাজ যদি কঠোর হাতে এর প্রতিবিধান না করে, আপনি একা করবেন কী? তাই, কৃষ্টি-অনুগ ব্যবস্থা সমাজের তরফ থেকে প্রচণ্ডবেগে করা লাগে। ভোল বদলে দেওয়া লাগে। তার জন্য জবরদস্ত মানুষ লাগে, শক্তিশালী সংগঠন লাগে।

এরপর পুলিনবাবু প্রভৃতি প্রণাম করে বিদায় নিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সুবিধা সুযোগ মত আবার আসবেন। আপনারা সমাজের শিরোমণি, আপনাদের ঢের করবার আছে।

জনৈক কর্মীর শরীর ভাল নয়।

সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কঞ্জুষের মত ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠাপন্ন হলে শরীর সুস্থ রাখতেনই। অসুস্থ হতে দিতেন না। তেমন হলে তার না থাকে মান, না থাকে অভিমান। তাতে মন ও শরীর দুইই অনেক ভাল থাকে। Ego (অহং) থাকলে সে অকারণ tussle (দ্বন্দ্ব)-এর সৃষ্টি করে। অপরকে দাবাবার জন্য অসংযত রোখালো ভাবে অনেক কটু কথা বলে। রুক্ষ ব্যবহার করে। অপরের প্রাণে ব্যথা দিতে তার গায়ে বাধে না। এর প্রতিক্রিয়ায় তার depression (অবসাদ) আসতে বাধ্য। তা থেকে সে সহজে রোগের শিকার হয়। নিজে কষ্ট না পেয়ে অপরের কষ্টের কারণ হওয়া যায় না। ইষ্টনিষ্ঠ মানুষ অতি বড় unfavourable (প্রতিকূল) জায়গা থেকেও ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠা বাগিয়ে নিয়ে আসে।

যেখানে যেভাবে প্রয়োজন, সেখানে তাইই করে। তার ত কোনভাবেই আটকায় না। সবটা থেকে ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠা টেনে বের করবার জন্য সে বদ্ধ-পরিকর। এতে সে নিজেও যেমন প্রবৃত্তির কবল থেকে বাঁচে, অন্যকেও তেমনি তা থেকে বাঁচায়। এইটেই পৃথিবীতে কাজের কাজ।

শ্রীশ্রীঠাকুর জনৈক কর্মীকে যতি আশ্রমে চলে আসতে বললেন।

উক্ত কর্মী—আপনি যদি বলেন থাকব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—না বলতেই থাকা উচিত ছিল। তাতেই আছে health and wealth ( স্বাস্থ্য ও সম্পদ )। আমি খুব ভিতরবুঁদে। কই না, দেখি আপনারা কোন পথে কিভাবে পা ফেলেন। বড় খোকাকেই বলি না। তবে নিজে থেকে আমার ইচ্ছা মত করলে, চললে খুশী হই। অবশ্য নেহাৎ প্রয়োজন হলে বলি।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় গোলতাঁবুতে এসে বসেছেন। পর্দাগুলি ফেলে দেওয়া হয়েছে। তাই তাঁবুর ভিতরে শীত কিছু কম। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য), মণিমামা ( ভট্টাচার্য ), সরোজিনীমা, ননীমা প্রভৃতি অনেকে আছেন। আলো জ্বলছে। বেশ আনন্দোজ্জ্বল পরিবেশ।

গল্পচ্ছলে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমি অনেক সময় কে কী রান্না করলো জিজ্ঞাসা করি। ওতে রান্নার কথাও হয়, কে কি রকম আছে, কেমন ভাবে চলছে, তাও জানা যায়।

প্রফুল্ল—কেমন আছে, কী করে বোঝেন তা থেকে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কে কী রান্না করে, কী খায়, কী পছন্দ করে, তা থেকে বোঝা যায়;—ঘাট বাঁধা আছে।

জনৈক দাদা—আর প্রত্যেকটা মানুষ যাতে elated ( উদ্বুধ ) হয়, সেটাও ত চান আপনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার normal tendency ( সহজ প্রবণতা ) হলো মানুষকে exalt ( উঁচু ) করা, কারণ মানুষকে আমি ভালবাসি। "দরদী সাথে মৈত্রী ঘটিতে বিলম্ব হয় না আর।"

উক্ত দাদা—দরদী মানে,?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Actively sympathetic ( সক্রিয়ভাবে সহানুভূতি-শীল )। শুধু মৌখিক নয়। টাকা পয়সা ধনরত্নের প্রতি মানুষের যেমন লোভ, আমার তেমনি লোভ মানুষে। তার মঙ্গলে।

উক্ত দাদা—অত সহানুভূতি নিয়ে নিজেকে রক্ষা করেন কি করে ? কতজনে ত অবৈধ সুযোগ নেয় !

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিজের ব্যক্তিত্ব ঠিক না রাখলে তুমি করলে কী? তোমার বৈশিষ্ট্যে তুমি যদি অটুট থাক, কেউ তোমার কিছু করতে পারবে না। আমাকে ত কতজনে ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করে। বাবাকেও ত ছেলেপিলে ফাঁকি দেয়, ভাবে বাবা বোঝে না। কিন্তু বাবা যে ছেলেকে রগে রগে চেনে, তা জানে না।

উক্ত দাদা—অনেক সময় হারিয়ে ফেলতে হয় নিজেকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কারণ, কঞ্জুষের মত ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠাপন্ন নও।

কেষ্টদা—ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠাপন্ন হলে কী হয়, সেই লোভে যদি তা হতে চায় তাহলে কি প্রকৃত ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠাপন্ন হতে পারে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহলে হবে না কখনও। আমি বলি normally ( স্বাভাবিকভাবে ) কিসে কী হয়, সেই হিসাবে।

কেষ্টদা—পুণ্যলোভে আপনার পায় হাত বুলোয় যদি !

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে নিজের পায়ে হাত বুলোচ্ছে। আমার পায়ে হাত বুলোলেও আমার পায় হাত লাগছে না। তবে হাত বুলোতে-বুলোতে হয়ত একদিন ভালবাসা জাগবে।

এরপর যতীন শীলদা লেপ নিয়ে আসার পর শ্রীশ্রীঠাকুর হাত দিয়ে বললেন—মাখনের মত হয়েছে, একেবারে সুন্দর শ্যাম রায়।

উক্ত দাদা—Numerology ( সংখ্যা শাস্ত্র ) এবং কার পক্ষে কোন নাম শুভসূচক সেই সম্বন্ধে আলোচনা করছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মস্তিষ্কে এক একটা বিভাগ আছে, এক একটা গ্রহের convolution ( ভাঁজ ) আছে। এক একটা সাড়া মস্তিষ্কের এক এক প্রদেশকে বিশেষভাবে উত্তেজিত করে। এক একটা সাড়া এক এক

এলাকাকে শুভ বা অশুভ ভাবে আঘাত করে। হে বললে কেউ হয়ত চটে যায়। কারণ conception ( ধারণা ) ঐ রকম আছে। বিশেষ এলাকার মস্তিষ্ককোষের বিন্যাস অমনতর। আবার, এক এক গ্রহের অনুকূল এক এক রকম শব্দ, নাম ও রং আছে, তাতে তার প্রীতি হয়, উৎসাহ হয়, উদ্বর্দ্ধন হয়। সৎনাম ও সন্ত সদগুরু এমন জিনিষ যে ঐ নাম জপে ও ঐ নামীপুরুষের ধ্যানে সবারই সর্ব্বক্ষেত্রে মহামঙ্গল হয়। ঐ বস্তুই ত সৃষ্টির উৎসসত্তা।

রাত্রে হাউজারম্যানদা এসে বসার পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—উঁচুদরের ডাক্তার, physicist ( পদার্থবিৎ ), chemist ( রসায়নবিৎ ), bacteriologist ( জীবাণু বিদ্যাবিৎ ), technician (প্রযুক্তিবিদ্যাবিৎ), biologist ( জীববিজ্ঞানবিৎ ), electrical engineer (ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার ), expert both in theory and practice ( তত্ত্ব এবং প্রয়োগ উভয়দিকে দক্ষ ), untussling ( নির্দ্বন্দ্ব ), sweet ( মিষ্টি ), religious minded ( ধর্ম্মপ্রাণ ), painstaking ( কষ্টসহিষ্ণু )—এমনতর সব মানুষ ফাঁক মত জোগাড় করবে। খাতায় নোট রেখে দেবে, যাতে মনে থাকে।

কিছুক্ষণ পর বললেন—সুধীরের ( দাস ) ছেলেগুলির দেখি আমাকে দেবার খুব ঝোঁক। আগে অমন দেখিনি। মাঝে মাঝেই টাকা এনে দেয়। আর বেছে বেছে চকচকে টাকাগুলি এনে দেয়। তার মানে মনটাও অমনি চকচকে আছে। দেওয়ার রোখ যাদের দেখবেন, তারা উন্নতিশীল হবেই।

কেষ্টদা প্রভৃতি চলে যাবার পর রত্নেশ্বরদা ( দাশশর্ম্মা ), জুঁইমা প্রভৃতি আছেন।

জুঁইমা—আমরা অস্তিবৃদ্ধিযাজনজৈত্র বলি, কিন্তু আয়ু না থাকলে কি বাঁচতে পারে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Normal potency of life ( স্বাভাবিক জীবনী শক্তি ) থাকে ত!

জুঁইমা—বাড়িয়ে নেওয়া যায় না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দীর্ঘ করা চলে, কিন্তু ad infinitum ( অনন্তকাল ) বাড়ান যাবে না।

জুঁইমা—সত্যবান ও লখিন্দরের জীবন ঐভাবে বোধহয় বেড়ে গিয়েছিল !

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাদের ত একটা accident ( দুর্ঘটনা )-এর ব্যাপার। Potency ( জীবনী শক্তি )-ই যে ঐ পর্য্যন্ত ছিল তা ত নয়। জীবনী শক্তি দুর্ব্বল থাকলে অনেক সময় বড় shock ( আঘাত ) bear ( সহ্য ) করতে পারে না।

২৮শে মাঘ, বৃহস্পতিবার, ১৩৫৫ ( ইং ১০।২।৪৯ )

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে গোলতাঁবুতে বসে আর্য্যপ্রাতিমোক্ষ বইয়ের আর্য্য-পঞ্চক নামক ( মূল খাতা অনুযায়ী ১১৫১ নম্বরের ) গুরুত্বপূর্ণ বাণীটি দিলেন। তখন কেষ্টদা ( ভট্টাচার্য ), বীরেনদা ( মিত্র ), দক্ষিণাদা (সেন-গুপ্ত) প্রভৃতি ছিলেন। ঐ বাণীর মধ্যে একটা কথা ছিল—মানুষের ভার হতে যেও না।

ঐ সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ভার হওয়া মানে যে ভরণ করছে, তাকে স্ফূর্ত্তিতে রাখতে পারছ না। তার প্রতি তোমার করাটা তাকে আরো উৎফুল্ল ও সক্ষম করে তুলছে না।

আর্য্যপঞ্চক পড়ে শোনান হলে শ্রীশ্রীঠাকুর ধূর্জ্জটিদাকে বললেন—নীলুকে এইরকম করে ফেল internally externally (ভিতরে, বাইরে)। অবশ্য তোমার নিজের এমনতর হওয়া লাগবে সর্ব্বপ্রথম। আমাদের চরিত্র এইরকম হলে কারও পেরে ওঠা মুস্কিল আছে। কয়েকদিন অনুশীলন করলে সব টানটান হয়ে যায়। যাই করছি প্রত্যেকটার মধ্য দিয়ে এই নীতিগুলি মূর্ত্ত করার তপস্যা চলছে। কিছুতেই তখন আর consciousness ও balance ( চেতনা ও সমতা ) হারায় না। একটা কথাও আর বেফাঁস বেরোয় না। প্রত্যেকটা পদক্ষেপে ইষ্টস্বার্থপ্রাতিষ্ঠা দেখি। তা আবার পারিপার্শ্বিকে সঞ্চারিত হয়ে, গুণিত হয়ে সুপারিপার্শ্বিক ক্রমবৃদ্ধি-পর ইষ্টস্বার্থ-প্রাতিষ্ঠাপন্নতায় সক্রিয়ভাবে মসগুল হতে হতে চলে।

জনৈক দাদা আসতেই শ্রীশ্রীঠাকুর প্রফুল্লকে আবার বাণীটা পড়তে বললেন।

পড়া হলে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এইরকম হলে মানুষের চেহারাটা কেমন সৌম্য, সুধী হয়। তখন প্রতিটি চলনে চমকে ওঁ তৎসহ। তখন আপনার চলনা দেখে মানুষ বলবে—একটা মানুষ দেখে এলাম বটে। এগুলিকে বলে শীল। এর পরিপালনে মানুষটা কিরকম হয় কল্পনা করে দেখেন ত। ঐ চরিত্র দিয়ে দুনিয়া জয় করা যায়।

এই রকম একটি মেয়েছেলেকে কল্পনা করে দেখেন—তাকে মা বলে তার পায়ে লুটিয়ে পড়তে ইচ্ছা হবে।

বিষয়সম্পদ সম্পর্কে কথা প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তাঁরই সব, আমিও তাঁরই। কিন্তু তাঁকে বাদ দিয়ে, নিজে তাঁর না হয়ে তাঁকে ভুলে তাঁর দেওয়া সম্পদকে যদি আপন করতে যাওয়া যায়, তার মালিক সাজতে যাওয়া যায়, তাতেই যত গোলমাল হয়।

কথা প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—পঞ্চবর্হি, সপ্তার্চ্চি, আর্য্যপঞ্চক এই কটা হলেই যথেষ্ট। মাত্র এই কটা মূর্ত্ত করে তুলতে পারলেই হয়। এগুলি ভাবতেও চেহারাটা কেমন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে জনৈক দাদা প্রশ্ন করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠাপন্ন না হলে কিছুই করতে পারবেন না। কোন কাজ profitably ( লাভজনকভাবে ) করার সাধ্যি থাকবে না। যে কোন সাত্বত আদর্শে মানুষ যদি সমগ্র সত্তা দিয়ে actively interested ( সক্রিয়ভাবে অন্তরাসী ) হতে পারে, তা হলেই সে প্রবল হবেই, কৃতী হবেই।

নচেৎ দুনিয়ায় কত মানুষ পড়ে রয়েছে, কিন্তু এত বড় শক্তি কারও নেই যে ঐরকম আত্মদান ছাড়া নিজে থেকেই একটা বড় কিছু করতে পারে।

এরপর কয়েকজন ভদ্রলোক আসলেন।

একজন জিজ্ঞাসা করলেন—গুরুকৃপা ছাড়া কি মানুষ সদ্ভাবে চলতে পারে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাঁর স্বার্থই যে ঐ। কথা হলো গুরু আপনাকে কতখানি ভালবাসেন, সেটা আপনার সম্পদ নয়। আপনি কতখানি ভালবাসেন তাঁকে সক্রিয়ভাবে,—সেইটেই আপনার সম্পদ। আমি বলি, জলের মধ্যে কতরকমের বিপদ—ডাঙ্গায় একটা শক্ত খুঁটো যদি থাকে, সেই খুঁটোয় দড়ি বেঁধে যদি রাখেন, এবং তার একদিক যদি আপনার মাজায় বাঁধা থাকে, তাহলে যত ইচ্ছা জলে খেলা করেন না; তবে দড়ি যেন না ছেঁড়ে। সদগুরু হলেন ঐ খুঁটো, আর দড়ি হলো তাঁর প্রতি আপনার অকাট্য টান। বৃত্তিঘেরা সংসারে আছি, কত নাকানি-চুবানি খাচ্ছি। বৃত্তির উপর আধিপত্য আছে—আমার বাইরে এমন একজন মানুষে যুক্ত না হয়ে নিজেকে নিজে ত উদ্ধার করতে পারি না।

বহিরাগত জনৈক দাদা বললেন—একজন বলছিলেন আপনার কাজের জন্য লক্ষ টাকা প্রয়োজন হলেও দিতে পারেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রধান প্রয়োজন মানুষের। থিয়েটারে শুনেছিলাম 'দে রামা! আমায় একটা মানুষ দে।' মানুষ থাকলে সব হয়। নারায়ণ থাকলে লক্ষ্মী আপনা থেকে আসে।

২৯শে মাঘ, শুক্রবার, ১৩৫৫ (ইং ১১৷২৷৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে গোলতাঁবুতে বসে আর্য্যপঞ্চকের তর্জ্জমা করে ইংরেজীতে একটি বাণী দিলেন। জনৈক দাদাকে লক্ষ্য করে বললেন— আপনারা যদি মূর্ত্ত আর্য্যপঞ্চক হন, তবে আপনাদের কাছে যে আসবে, সেই magnetised (চুম্বকে পরিণত) হয়ে যাবে। পৃথিবী একটা State (রাষ্ট্র) হয়ে যাবে। India (ভারত) ঠিক হলে, world (জগৎ) বাকী থাকবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় গোলতাঁবুতে হেনরীর সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে বললেন— If I love a great man extremely, many may persecute me, but I have a tendency to forbear it though I have to suffer

much. (আমি যদি কোন মহৎ লোককে খুব ভালবাসি, অনেকে আমাকে নির্য্যাতন করতে পারে, কিন্তু আমার অনেক কষ্ট পেতে হলেও, আমার তা সহ্য করার ঝোঁক থাকে)।

রাত গোটা নয়েকের সময় কেষ্টদা (ভট্টাচার্য), পণ্ডিতমশাই (ভট্টাচার্য), ব্যোমকেশভাই ( ঘোষ ), হরিদাসদা ( সিংহ ), জুঁইমা প্রভৃতি উপস্থিত।

কয়েকটি সদ্যপ্রদত্ত বাণী পড়া হলো।

তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—লেখার আর বাকী বড় কিছু নেই।

কেষ্টদা—বাকী হলো—একটা organisation—a machinery to run on the work (সংগঠন—কাজ চালু রাখার একটা ব্যবস্থা ও সংস্থা)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেটা আপনাদের কাজ, আপনাদের তপ।

কেষ্টদা—অবশ্য বড় খোকা, মণি, কাজলকে যেমন দেখছি, ওরা করে ছাড়বেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—রে যদি আর্য্যপঞ্চকের মত every foot-step, every breath, every twinkle ( প্রত্যেকটা পদক্ষেপ, প্রত্যেকটা নিঃশ্বাস, প্রত্যেকটা চোখের পলক ) করে নিতে পারে, তবে কেজানে রে একজন apostle (প্রভুর অন্তরঙ্গ চিহ্নিত প্রচারক) হবে না, যাকে দেখে বহুলোক আদর্শের অনুগামী হবে।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর প্রফুল্লকে জিজ্ঞাসা করলেন—আলাদা করে যে-খাতায় বাণীগুলি টুকে রাখিস, সে খাতার কতদূর হয়েছে।

খাতা দেখাবার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—একটা dictionary-র ( অভিধানের ) মত হয়েছে। কোন্ অবস্থায় কখন কী করতে হবে, তা বুঝতে আর অসুবিধা হবে না!

জুঁইমা—গীতায়ও ত কত উপদেশ আছে, তাও ত মানুষ নিল না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বইতে ত কিছু করে না। মানুষে করে, বইটা চরিত্রে আঁকিয়ে নেয়। যারা আঁকাতে চায়, বই তাদের সাহায্য করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত নয়টা পঞ্চাশ মিনিটে একটি বাণী দিলেন।

সেই বাণী পড়ে শোনান হলে জনৈক দাদা এমন প্রশ্ন তুললেন যাতে

আর একটা নতুন বাণী দেওয়া প্রয়োজন হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর তখন হাসতে হাসতে বললেন—কথায় এদের সঙ্গে পারার জো নেই। এক প্যাঁচ না এক প্যাঁচে ফেলবেই। কেবল নিজেদেরই অর্থাৎ স্ব স্ব চরিত্রকে এই প্যাঁচে ফেলে আমার মনোমত করে গঠন করবে না। তাহলে গুরুতর কাণ্ড হয়ে যেত। দুর্নিবার হয়ে পড়তো।

জুঁইমা—যে যুগে আপনি এসেছেন এবং আমরা যে ধাতুর, আপনি কি আশা করেন আমরা কেউ তেমন হতে পারবো?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আশা ত পুরোপুরি করি কিন্তু আমার কপালে হয় না। —বলেই শিশুর মত হাসতে লাগলেন।

এরপর কিছুক্ষণের মধ্যে তিনটি বাণী দিলেন।

৩০শে মাঘ, শনিবার, ১৩৫৫ ( ইং ১২।২।৪৯ )

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে গোলতাঁবুতে সমাসীন। মহিমদা (দে), গোপেনদা (রায়), জিতেনদা (রায়), গিরীশদা ( কাব্যতীর্থ ), দাশুদা (রায়), ব্রজেনদা ( চ্যাটার্জ্জী ), খগেন ( মণ্ডল ) প্রভৃতি অনেকে উপস্থিত।

জনৈক দাদা বললেন—জোতিষ বলছেন আমার গ্রহদোষ চলছে। কী করব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সব গ্রহই ত ভগবানের অধীন। অনুরাগের সঙ্গে ভগবানের নাম করলে, সব গ্রহই কেটে যায়। যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি— করলে কাটে মহাভিতি। তাঁকে নিয়ে থাক, গ্রহ নাগাল পাবে না তোমার।

এরপর প্রমথদার ( দে ) স্ত্রী ফুলমালামা এসে শ্রীশ্রীঠাকুরের সামনে আকুলভাবে কাঁদতে লাগলেন। তিনি একটুখানি স্থির হবার পর শ্রীশ্রীঠাকুর ধীরে ধীরে সস্নেহে বললেন:—দেখ আমি ত কম চেষ্টা করি নি, কিন্তু তার সম্বলই ছিল যে ঐটুকু। ফুরিয়ে গেল—টেকান গেল না। আমি বলি—তাকে যদি ভালইবাসিস, তাকে কষ্ট দিস্ কেন? তাকে যদি ভালইবেসে থাকিস্, তাকে স্বস্তি দে, তার ভাল কর। তার কাজ

করলে, সে যে কাজ পছন্দ করত, তা করলে সে খুশী হতো। শক্ত হয়ে দাঁড়ায়ে তাঁর কাজগুলি তুই কর। ভালবাসাই ভাল। মোহ কি ভাল? তার কাছেই ত যাবি, কিন্তু কেঁদে কেঁদে তাকে ঐভাবে কষ্ট দিলে, সে তখন এগুতে চাইবে না। এই কষ্টের বোধ তাকে ভীত করে রাখবে। সে এসেছিল রাজার মত, গেছেও রাজার মত—বীরের মত কাজ করে চলে গেছে। সে দীর্ঘদিন পড়ে থেকেও মানুষকে ভোগায় নি। শেষ মুহূর্তেও তাঁর চিন্তা করতে করতে আনন্দে চলে গেছে। কোন যন্ত্রণাই ঠিক পায় নি। আমি কই, জীবনটা সার্থক করাই ত ভাল। তার স্ত্রী, তাকে দেখেছিস, তার মত চলাই ত ভাল। তুই নিজেকেও কষ্ট দিচ্ছিস্, তাকেও কষ্ট দিচ্ছিস্। ছেলেপেলেগুলিকেও নষ্ট করছিস্ অযথা, এ কি ভাল? এতে কি তার শান্তি হবে, না তোর শান্তি হবে?

আমার তৈরি জিনিষ, গড়া জিনিষ, রকম করা জিনিষ, তোর মত না লাগলেও আমারও খুব লেগেছে। আমি ত চাই এদের মধ্যে বেঁচে থাকতে। আমার বেঁচে থাকার একটা ঘট ভেঙ্গে গেল। খুবই লাগে, কিন্তু কী করব? সওয়া ছাড়া উপায় কী? যা খিন্ন করে তা পরিহার করাই ত ভাল। সেই শোক ভাল যা ভগবানের দিকে টেনে নিয়ে যায়। ভগবানের থেকে বিচ্ছিন্ন করে যা, তা ত ভাল না। বেদনাকে আপন করে নিস্ না। মোহকে আপন করে নিস্ না। যাকে চাস্ না, তাকেই আপন করে নিস্ না। যে তোর আপন তাকে আপন করে নে। দুঃখ ত চাই না, তাতে আগ্রহ করে লাভ কী? তা ছিটিয়ে দেওয়াতেই বা কী লাভ? আমি বলি—ছেলেপেলেগুলিকে মানুষ কর। তার অভাব ছেলেপেলেরা বা আমি বুঝতে না পারি তেমন করে চল্। কাজ কর। আমি যতদিন আছি, ভাবনা কী? তোর কষ্ট হয়ত যাবে না, তবু এইটুকু সাংত্বনা পাবি যে তার কাজ করলি।

মাটি তখনও ম্রিয়মাণ। তাই একটু থেমে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কী বলিস্? তাজা হবি না? তুই যদি মুহ্যমান হস্ তাহলে মন্দই ত তোকে খেয়ে ফেলবে। তার করণীয়গুলি কর্, তার পূজা কর্, সেবা কর্। ছেলে-পেলেদের এমন করে মানুষ কর্ যাতে তারা পাকা খুঁটির মত হয়।

সুদীর্ঘজীবী হয়ে ওঠে। তাদের নিয়ে আবার উঠে দাঁড়া। ঐভাবে মোহগ্রস্ত থাকলে কাউকেই উঠতে দেয় না।

ফুলমালামা স্বামী-শোকে অন্নজল প্রায় ত্যাগ করেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তাকে নিবেদন করিস্ না? খাবার আগে ইষ্টকে যেমন নিবেদন করিস্ তাকেও তেমনি নিবেদন করিস্। তাকে খাওয়াস্। রোজ নিজে রেঁধেবেড়ে খাওয়াতে পারলে ভাল হয়। দুটো খেতে দিস্। কেবল শরীরের সঙ্গে সম্বন্ধ? শরীরটা ফুরিয়ে গেলে সম্বন্ধ ফুরিয়ে গেল তা ত নয়। সে ত আছে।

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—তাকে স্বপ্ন দেখিস্ না?

ফুলমালামা—হ্যাঁ!

শ্রীশ্রীঠাকুর—কী কয়?

ফুলমালামা—আগের মতই দেখি। কী কয় মনে থাকে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওই ত দেখ,—তাকে চাস্, সে আসে। কিন্তু তার কথা আর মনে রাখতে পারিস্ না। তাকে বোধ করতে পারিস্ না এই আচ্ছন্ন অবস্থার দরুণ। তাকে আসতে দে, তাকে কইতে দে তার কথা। তুইও শোন। সে যা পছন্দ করতো, তেমনি জিনিষ রেঁধেবেড়ে তাকে নিবেদন কর্। ছেলেপেলেদের খাওয়া। নিজে সুস্থ হয়ে চল। সুস্থ না থাকলে তার সেবা করবি কী করে? তাজা হ। তাজা হলে সেও খুশী হয়। আমিও খুশী হই।

যা, খা গিয়ে লক্ষ্মী!

প্রমথদা নেই, এ কথা ভাবিস্ না, আর বলিস্‌ও না তেমনি করে।...

থাকে না, কেউই থাকে না। শরীর পরিবর্তন হয়ই। ভগবান বুদ্ধ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, কেউই সেই শরীর নিয়ে নেই। মানুষের জীবন নিয়ে ত সম্বন্ধ। সে সম্বন্ধ শরীর গেলেই যায় না। পুরোনটা, ছেঁড়াটা চলে যায়। নূতনটা হয়। তার মৃন্ময় শরীর নেই, পাঞ্চভৌতিক দেহ নেই, মনোময় শরীর এখন। সেবাও করিস্ সেইভাবে। এমন আছে যে কথাও কওয়া যায়।

আবার একটু বাদে বললেন—তুই ওঠ্, তুই ওঠ্। দাঁড়া, কাজ কর্, তাকে বঞ্চিত করিস্ না; আমাকেও বঞ্চিত করিস্ না।

এরপর ফুলমালামা প্রণাম করে বিদায় নিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় গোল তাঁবুতে। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), হাউজারম্যানদা, একজন ভারতীয় খ্রীস্টান এবং আরও অনেকে উপস্থিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর উক্ত ভারতীয় খ্রীস্টান সম্পর্কে বললেন—I like to call him Punditji, because he is really a Pundit—a son of a Pundit. (আমি তাঁকে পণ্ডিতজী বলতে চাই, কারণ তিনি পণ্ডিতের ছেলে এবং প্রকৃত পণ্ডিত।) পিতৃবংশের পরিচয় যদি বাতিল করতে হয় ক্রাইস্টকে অনুসরণ করতে গিয়ে তবে সেটায়, যিনি কৃতজ্ঞতার মূর্ত প্রতীক--তাঁর নাম করে অকৃতজ্ঞতার প্রশ্রয় দেওয়া হয়। তিনি তা বলেন নি কখনও। যদি কোন নতুন নাম দিতেও হয়, তবে মূল নামের পরে যোগ করে দেওয়া যায়।

কেষ্টদা—সন্ন্যাসীরা ত নতুন নাম নেন। আগের পরিচয় মুছে ফেলে দেন। নিজের শ্রাদ্ধ নিজে করে নেন। যেন পুনর্জন্ম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার ঠিক ওটা ভাল লাগে না।

একটু পরে কেষ্টদা জিজ্ঞাসা করলেন—ধর্মে যেমন যুগে যুগে একেরই আবির্ভাবের কথা, বিবর্তনে ত বরাবর একই একথা নেই—আরও আরও অভিব্যক্তি হয়েই চলেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আরও হয়েও একই থাকে। Concentration-এর (একাগ্রতার) উপর দাঁড়িয়েই sublimation (ভূমায়িতি)।

মায়ামাসিমা কাশী থেকে এসেছেন। তিনি একজন খ্যাতনামা ধর্মপ্রবক্তার কথা বললেন—যাঁর কোন গুরু নেই এবং যিনি কোন শিষ্যও করেন না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—গুরু না থাকা আজকাল একটা ধুয়ো উঠেছে। গুরু না থাকলে বৃত্তিগুলি সংহতই হয় না, অন্বিতই হয় না। কোন বিশেষ

প্রবৃত্তি বা উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে কিন্তু ও জিনিস হয় না। Living Centre (জীবন্ত কেন্দ্র) না থাকলে সেগুলি অন্বিত হয় না। অনেক শক্তিমান পুরুষ এক একটা অবান্তর ধুয়ো তুলে মানুষকে বিভ্রান্ত করে। ধারাটা নষ্ট করে দেয়। মানুষকে আবোল তাবোল পিণ্ডি চটকিয়ে বোঝায়। পূর্বতনদের সঙ্গে কোন সঙ্গতি থাকে না। আলাদা দল সব হতে থাকে। জীবনের পথ থেকে অনেক সময় বিচ্ছিন্ন করে দেয়। যার যেমন খুশি সে সেইভাবে চলতে থাকে। গুরু মানা নেই, বিয়ে থাওয়া যেমন খুশি করে। সর্বনাশের পথ পাকা করে দেয়। এই স্রোত ফেরানই দায় হয়ে দাঁড়ায়। রামকৃষ্ণদেব অনেক চেষ্টায় তদানীন্তন হাওয়াটা খানিকটা ফিরিয়েছিলেন। কিন্তু বর্তমানের মহাজনেরা ইদানীং যে প্রবল উল্টো হাওয়া বইয়ে দিয়েছেন তা আর ফেরান যাবে কিনা বলা যায় না।

যতীনদা (দাস)—দেড় পাটটা চাদর কি শুধু ঋত্বিকদের জন্য?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা কেন? যার খুশি সেই পরতে পারে।

১লা ফাল্গুন, রবিবার, ১৩৫৫ (ইং ১৩।২।৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে গোলতাঁবুতে বসে একটা বাণী দিলেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), যতীনদা (দাস), মহিমদা (দে), সুকুমারদা (সেনগুপ্ত) এবং মায়েরা উপস্থিত।

কেষ্টদা—সদ্‌গুরু পেল, টান নেই, অনুসরণ নেই, কিন্তু আর একজন হয়ত মার উপর সক্রিয়টান নিয়ে কত বড় হয়ে গেল। কোন্‌টা ভাল?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ছুঁলেই কিছু না কিছু সোনা হয়ই।

কেষ্টদা—ওটা ত ব্যাখ্যার বেলায়, কিন্তু বাস্তবে হয়ত দেখা গেল তাড়িখোরের মার খেল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাড়িখোরের মারই খাক বা কুত্তারই মুখ চাটুক, তার হয়ই কিছু না কিছু। আর সেটা solid (নিরেট)।

কেষ্টদা—সঙ্গ করছে একজন হয়ত কত বছর। অথচ হয়ত চুরি করছে—বাইরের একজনের থেকেও খারাপ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তারই মধ্যে 'সে যা, অন্যে তা' নয়।······আমার মনে হয়, গিরীশ ঘোষ ও রামমোহন রায়—দুজনের মধ্যে গিরীশ ঘোষের দর্শন বাস্তবে বেশি কল্যাণকর। অবশ্য গিরীশ ঘোষের টান ছিল রামকৃষ্ণদেবের উপর। সদগুরু যদি থাকে, তাতে স্বল্প টান থাকলেও জৌলুষ থাকে তার।

কেষ্টদা—জেমস্ বলেছেন—আমি যদি আমা অতিরিক্ত পবিত্র ও বাস্তব কিছুর প্রতি সক্রিয়ভাবে স্বার্থান্বিত না হই, তবে আমার বিকাশ ও নিয়ন্ত্রণ হতে পারে না। এই বাস্তব বস্তুটি যদি জীবন্ত হয়, তাহলে তার কাছ থেকে প্রাণবন্ত বাস্তব সাড়া পাওয়া যায়। তখন সেই 'ইদম্' চিরন্তন ভুমিতে পর্যবসিত হয়।

বেলা প্রায় এগারটার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর অশোকদা (রায়)-কে বললেন—তুমি ভাল থাক, মন্দ থাক, কিছুতে এসে যায় না। যা আছ তাইই যদি ইষ্টে adjusted (বিন্যস্ত) হয়, এই কাণ্ডটা যদি ঘটাতে পার তাহলে তুমি রত্নাকর থাকলেও বাল্মিকীতে পরিণত হবে। চাই অচ্যুত আনতি, তাঁর বাড়া তোমার কিছুই থাকবে না। আবার ইষ্টনেশা নেই, তুমি সচ্চরিত্র, টাকাপয়সাওয়ালা শিক্ষিত মানুষ, সৎকাজ কর, অথচ একটা পথের ভিক্ষুক, কিছু জানে না, সে যদি ইষ্টে সবছাপান আকুল টান নিয়ে জেগে ওঠে, তাহলে সেই তোমার থেকে superior (উন্নততর) হয়ে যাবে একলহমায়।

রাত্রে শ্রীশ্রীঠাকুর গোলতাঁবুতে বসে পরপর বাণী দিচ্ছেন, কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), কালীদা (সেন) প্রভৃতি এবং তরুমা, সুধাপাণিমা, হেমপ্রভামা, রেণুমা, রাণীমা, সুষমামা, মঙ্গলামা, সুশীলাদি প্রভৃতি আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কথাটা উচ্চারণ করছেন ধর্ম। ধরে রাখা যতটা বাতিল হল, ততটা ধর্ম কম পড়লো।

কালীদা—কী ধরে রাখবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সত্তা।

কালীদা—সেটা ত absolute (অখণ্ড)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার সত্তা ত আছে। সত্তাটা অখণ্ডও, আবার ব্যক্তিগতও। নিজের অস্তিত্ব দিয়েই ঠিক পাও।

কেষ্টদা—অস্তিবৃদ্ধি বলি—অস্তিরই বৃদ্ধি ত ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—একেরই aspect ( অবস্থা )—আলাদা নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর একটু পরে বললেন—যতখানি crude ( সাদামাঠা ) করে ধরতে পারি, ধরেছি। Fine mechanism ( সূক্ষ্ম মরকোচ )টা যেখানে unfold ( প্রকাশ ) করতে গিয়েছি, সেখানে ভাষাটা কঠিন হয়ে গেছে। উপায়ও নেই তাছাড়া।

৪ঠা ফাল্গুন, বুধবার, ১৩৫৫ ( ইং ১৬।২।৪৯ )

গত ১লা ফাল্গুন, রবিবার রাত্রি থেকে শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর অসুস্থ! জ্বর, সর্দি, কাশি। আজ সারাদিন বড়াল বাংলোর দালান ঘরে (শ্রীশ্রীবড়মার ঘরের পাশে ) শুয়েছিলেন। কাতর হয়ে ছটফট করছিলেন। প্যারীদা (নন্দী), পূজনীয়া রাঙ্গামা, সরোজিনীমা, কালীদাসীমা, ননীমা, সুধাপাণিমা, রেণুমা, সেবাদি, হরিপদদা ( সাহা ) প্রভৃতি সেবাশুশ্রূষায়রত ছিলেন। শ্রীশ্রীবড়মা ও ছোটমা, পূজনীয় বড়দা, কেষ্টদা, সুশীলদা, মায়ামাসিমা প্রভৃতি সর্বদা খোঁজখবর নিচ্ছিলেন।

সন্ধ্যাবেলায় শ্রীশ্রীঠাকুর মায়ামাসিমাকে বললেন—মানুষ সবচেয়ে বেশি কষ্ট পায় প্রীতি-প্রত্যাশা ব্যাহত হলে, আর পায় প্রিয়জনের বিয়োগে। মৃত্যুই ত প্রধান সমস্যা।

প্যারীদা—শরীরের জন্যও ত মানুষ কম কষ্ট পায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শরীর যদি মনকে কষ্ট দিতে না পারত, তাহলে কি কষ্ট বোধ হতো ?

৫ই ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার, ১৩৫৫ (ইং ১৭।২।৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর আজও খারাপ। তবে সকাল থেকে অপেক্ষাকৃত ভাল। বড়াল-বাংলোর ঘরে রোগশয্যায় শুয়ে বসে দুই একটি বাণী দিচ্ছেন। এবং অল্প অল্প কথা বলছেন।

কথা প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়দাকে জিজ্ঞাসা করলেন—আমেরিকায় কোন স্বামী যদি সন্তানব্রতী স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহবন্ধন ছিন্ন করে, তবে সন্তান কার কাছে থাকে ?

বড়দা—কোর্টের থেকে ঠিক করে দেয়।

এমন সময় হাউজারম্যানদা এসে ঐ কথাই বললেন—এবং সঙ্গে সঙ্গে বললেন—অনেক সময় ছেলে হয়ত বলছে মার কাছে থাকবে। Judge ( বিচারক ) বলছে—বাবার কাছে থাকবে। এর ফলে ছেলে-মেয়েরা কান্নাকাটি করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বড় কষ্টের। Divorce ( বিবাহ বিচ্ছেদ ) মানেই tyranny against children ( সন্তানদের বিরুদ্ধে অত্যাচার )। হয় তারা fatherless ( পিতৃহীন ) হবে, নয় তারা motherless (মাতৃহারা) হবে।

সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর ঘরে বিছানায় বসে আছেন। সুবোধদা ( সেন ), রত্নেশ্বরদা ( দাশশর্ম্মা ), হাউজারম্যানদা, প্যারীদা ( নন্দী ), সরোজিনীমা, লাবণ্যমা, তরুমা, কালিষষ্ঠীমা প্রভৃতি অনেকেই কাছে আছেন।

দেশের বিশিষ্টদের কৃষ্টিবিরোধী ও প্রবৃত্তিমার্গী সক্রিয় প্রবণতা ও প্রয়াস সম্বন্ধে কথা উঠলো। শ্রীশ্রীঠাকুর আপশোষের সুরে বললেন—বড়দুস্তর সময়ে গরীবের ঘরে এসেছি আমি।

এরপর হাউজারম্যানদা আরউইন স্রুডারের একখানি চিঠি শ্রীশ্রীঠাকুরকে পড়ে শুনিয়ে সেই সম্পর্কে তাঁর নির্দ্দেশ নিলেন।

ইষ্টের কাছে বা দূরে থাকা সম্পর্কিত কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কাছে থাকলে ভালই, কিন্তু দূরে থাকলেও in tune ( যুক্ত ) থাকলেই হয়। কাছে থাকলেও tune (যোগ) না থাকলে সুবিধা হয় না। তবে কাছে থাকলে সেই লোকটিকে adjust (নিয়ন্ত্রণ) করার ব্যাপারে ইষ্টের সুবিধা হয়।

ইষ্টকে ভালবাসা সম্পার্কে বললেন—ভালবাসতে চাইলে তোমার সবকিছুর মধ্যে তাঁকে living first and foremost ( জীবন্ত প্রথম ও প্রধান ) রাখতে চেষ্টা করবে। এটা যত keen (তীব্র) হয়, ততই ভাল।

পরে ধ্যান সম্পার্কে বললেন—ধ্যানে suppressed ( নিরুদ্ধ ) বহু

কিছু জেগে ওঠে। আবার অনেক কিছু স্থির হয়েও আসতে থাকে। ধ্যান করতে করতে concentration ( একাগ্রতা ) হয়, তখন সাধারণ মানুষের থেকে conception ( বোধ ) অনেক up ( উন্নত ) হয়ে যায়। ······ধ্যানের সময় নিজেকে পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন ও সেদিক দিয়ে কিছুটা নিঃসঙ্গ মনে হলেও ইষ্টের উপর ভালবাসা থাকলে, তাঁর সঙ্গসুখ উপভোগ করা যায় এবং কোনই কষ্ট হয় না। লোকসঙ্গ পরিহার করে সর্ব্বদা নির্জ্জনে থাকার চেষ্টা না করে কখনও নির্জ্জনবাস ও কখনও যাজনে ব্যাপৃত থাকলে কষ্ট হয় না। যাজন করতে গেলে পরিবেশের উর্দ্ধে থাকতে হয় এবং তাদের influence-এ (প্রভাবে) অভিভূত না হয়ে, তাদের ইষ্টের দিকে mould ( নিয়ন্ত্রণ ) করতে হয়। ইষ্টের প্রতি টান concentrated ( একাগ্র ) হলে, তা sublimation-এ (ভূমায়িতিতে) ভরে যায়। তখন মানুষ সবাইকে আপন করে নেয়।

পরে বললেন—নামধ্যানে nerve-system ( স্নায়ুতন্ত্র ) strengthened ( শক্তিশালী ) ও abler ( সমর্থতর ) হয়। হঠাৎ মাত্রা খুব চড়িয়ে দিতে নেই। Gradually (ক্রমশঃ) বাড়াতে হয়, তখন system ( শরীর বিধান ) ধীরে ধীরে habituated ( অভ্যস্ত ) হয়। স্নায়ুবিধান শান্ত থাকে এমনতর খাদ্য খেতে হয়, যেমন butter (মাখন), milk (দুধ), honey ( মধু ), plantain ( কলা )। Association ( সঙ্গ )ও তপস্যার অনুকূল হওয়া চাই। নামধ্যানে nervous system (স্নায়ুতন্ত্র) অত্যন্ত sensitive ও receptive ( সাড়াপ্রবণ ও গ্রহণমুখর ) হয়, just like a powerful camera ( ঠিক একটি শক্তিশালী ক্যামেরার মত )—যা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জিনিষ ধরে নিতে পারে।······

যজন যাজন সম্পর্কে বললেন—যজন হচ্ছে to materialise in character the principles of beloved (প্রিয় পরমের নীতি চরিত্রে মূর্ত্তকরা) আর যাজন হচ্ছে to make the environment exalted to Ista through love, service and elatement ( ভালবাসা, সেবা ও উদ্দীপনার ভিতর দিয়ে পরিবেশকে ইষ্টে উন্নীত করা )।

সাধনা সম্পর্কে বললেন—যদি কোন জিনিষের জন্য জলদিবাজী থাকে, তবে তাই-ই হয় একাগ্রতার কেন্দ্র বিন্দু। ওতে আদৎ জিনিষ পাওয়া কঠিন হয়। তাঁকে ভালবাসতে হয়, যা কিছু করতে হয়, তাঁর জন্য। তখন যা করার ও হবার আপ্‌সে আপ হয়। Let him witness what occurs in him ( ভিতরে যা হয় তা যেন সাক্ষীস্বরূপ দেখে )।

একটি দাদার মাঝে মাঝে ইষ্টভৃতি করতে ভুল হয়ে যায়। সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—That one mistake creats many more mistakes ( সেই একটা ভুল আরো অনেক ভুল সৃষ্টি করে )। যে দিন ভুল হয় না, সেদিন অন্য চলনাগুলিও অনেকটা সেই তালে চলে।

প্রফুল্ল—যদি জীবন্ত সদগুরুর নাম পায় অথচ না দেখে তাঁকে তবে কী হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কম হয়। আবার তাঁর সঙ্গে খানিকটা concentric tuning ( সুকেন্দ্রিক একতানতা )-ওয়ালা লোকের সান্নিধ্য যদি পায়, তার উপর দাঁড়িয়ে তার থেকেও…… উন্নত হয়ে যেতে পারে। যেমন হয়েছিল ক্রাইস্টের, কবীরের, চৈতন্যদেবের। তবে ঐ concentric agent ( সুকেন্দ্রিক প্রতিনিধি ) কিন্তু চাই-ই।

৬ই ফাল্গুন, শুক্রবার, ১৩৫৫ ( ইং ১৮।২।৪৯ )

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় বসে পূজনীয়া পিসিমা ও পূজনীয় পাগলুদাকে চিঠি লেখার জন্য প্রফুল্লকে বয়ান বলে গেলেন।

কল্যাণীয়াসু, খুকি!

তোমার চিঠি সময়মত পেয়েছি। আমার অপটু শরীরের দরুণ উত্তর দিতে দেরী হলো।

পাগলুর জন্য আর যে দুটি মেয়ে দেখবার কথা ছিল, আশাকরি এতদিনে তা দেখা হয়েছে। এ ব্যাপারে তোমার পছন্দ যেখানে, আমারও মত সেখানে জানবে। কারণ, জানি সদ্বংশজাত ভাল মেয়ে ছাড়া তোমার পছন্দ হবে না। লেখাপড়াই মেয়েদের একটা বড় qualification (গুণ)

নয়। গৃহস্থালী চলন, চরিত্র, আচার, ব্যবহার, নৈপুণ্য—তাদের বংশানুক্রমিক ধারা সর্ব্বতোভাবে সুষ্ঠু, সমঞ্জসা ও পোষণী কিনা দেখা প্রয়োজন। এসব দিক ঠিক হয়ে মেয়ে যদি রূপসী না হয়েও প্রিয়দর্শী হয়—তা হলেও চলে। রং একটু ময়লা হলেও আটকায় না। আমার যা' মনে হয় লিখলাম। অবশ্য তুমি ভাল করে দেখেশুনে পছন্দ করো।

খেপু, তুমি, শান্তু, কানু, অর্চ্চনা, তোতা, মঞ্জু—সকলে কেমন আছ জানিও। পাগলুর চিঠি মাঝে মাঝে পাই—সে ভাল আছে।

আমার শরীর খারাপ। মাঝে ক'দিন সর্দ্দিজ্বরে ভুগলাম। এখনও সুস্থ হতে পারি নি। খেপু এই সময় এখানে এসে কয়েকদিন যদি থাকতে পারে—অবশ্য তোমাদের পক্ষে যদি অসুবিধা না হয়—তাহলে ভাল হয়। তার পক্ষে কি সম্ভব হবে?

বড়খোকা ও মণির শরীর ভাল নয়। তোমরা আমার আন্তরিক "রাস্বা" জেনো।

ইতি
তোমাদেরই
"দাদা"

কল্যাণবরেষু,

পাগলু!

তোমার চিঠি পেলাম। তুমি যে টাটা কিম্বা বার্ণপুর আসতে চেষ্টা করছ জেনে সুখী হলাম। কাছাকাছি থাকলে যখন তখন আসতে পার। আমারও ভাল লাগে। তাছাড়া এসব জায়গায় অনেক সৎসঙ্গী আছে—তারা সদাসর্ব্বদা তোমার খোঁজখবর নিতে পারে। আমি একটু নিশ্চিন্ত থাকতে পারি। আমিও তোমার জন্য টাটায় চেষ্টা করছি। Ray (হাউজারম্যান) ওখানকার একজন British Officer-এর কাছে তোমার কথা বিশেষভাবে লিখেছে। অবশ্য খবর পাওয়া গেল সে সাহেব নাকি বর্ত্তমানে বিলেত গেছেন এবং সেখানেই সে চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছে।

আমার শরীর ভাল নয়, মাঝে ক'দিন আবার সর্দ্দিজ্বরে ভুগলাম—এখনও সুস্থ হতে পারি নি। বড়খোকারও শরীর তত ভাল নয়, মণিও অসুস্থ।

মাঝে মাঝে চিঠি দিও। আমার সস্নেহ "রাস্বা" জেনো।

ইতি
তোমাদেরই
জ্যাঠামহাশয়

শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর বারান্দায় বসে কেষ্টদা প্রভৃতিকে বলছিলেন—কলকাতায় ডাক্তারী পড়ার সময় গ্রে ষ্ট্রীটে কয়লার গুদামে থাকাকালীন কী কষ্টই গেছে। তখন হোমিওপ্যাথিক ওষুধের দোকান লাহিড়ী কোম্পানীর একজন কর্ম্মচারী আমাকে একখানা হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার বই ও এক বাক্স ওষুধ জুটিয়ে দিলেন। তা দিয়ে কুলিদের মধ্যে চিকিৎসা শুরু করে দিলাম। রোগের আরোগ্যও হতো খুব। কুলিরা দুই আনা, চার আনা, আট আনা যা দিত নিতাম। মাসে ৪০।৫০ টাকা পেতাম ও থেকে মাঝে মাঝে ওদের জামাকাপড় কিনে দিতাম। ওরা যেন তখন একেবারে আনন্দে ও কৃতজ্ঞতায় গলে যেত। এমন মুখের চেহারা হতো ক্যামেরা থাকলে ছবি তুলে নিতাম।…আমি দেখেছি মানুষকে যদি ভালবাসা যায়, প্রত্যাশাহীন হয়ে স্বতঃদায়িত্বে সেবা দেওয়া যায়, অভাব থাকে না।

৮ই ফাল্গুন, রবিবার, ১৩৫৫ (ইং ২০।২।৪৯)

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর বারান্দায় ভক্তবৃন্দ-পরিবেষ্টিত হয়ে তক্তপোষে উপবিষ্ট। এমন সময় বিহার সরকারের সি০ আই০ ডি০ অফিসার রায়বহাদুর রামকেদার সিং আসলেন। তাঁকে বসতে দেওয়া হলো। তিনি প্রণাম করে বসার পর মজঃফরপুরের যতীনদা (মুখার্জ্জী) বললেন যে তিনি রামশঙ্করদার মুক্তির ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

রামকেদারবাবু— আমি এবং ক্রস সাহেব দুই জনেই গোড়া থেকেই বিরোধী ছিলাম। রামশঙ্কর শতবার বললেও কিছু হতো না। কিন্তু ঠাকুরের দয়ায় কিভাবে যেন সব ঘুরে গেল।

কেষ্টদা কথা প্রসঙ্গে বললেন—হাজার হাজার উদ্বাস্তুকে ঠাকুরের খাওয়াতে হচ্ছে।

রামকেদারবাবু—ঠাকুরের দ্বারাই এটা সম্ভব। …যা হোক দরকার হলে সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের সঙ্গে আমি অপনাদের যোগাযোগ করে দিতে পারি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এখানে আপনাদের আওতায় এসে দেখছি—প্রত্যেকে প্রত্যেকের জন্য feel ( বোধ ) করে। আমার খুব ভাল লাগে।

রামকেদারবাবু বিশিষ্ট কয়েকজন অফিসারের নাম ঠিকানা বলে দিলেন। এরপর তিনি বিদায় নিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর ঘরের মধ্যে গিয়ে বসলেন। হাউজারম্যানদা ও হেনরী জ্যোতিষশাস্ত্র, ভবিষ্যদ্বাণী ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ সাধারণতঃ complex ( প্রবৃত্তি ) ও characteristics (বৈশিষ্ট্য) অনুযায়ী চলে। এগুলি জানলে কার কী হবে, horoscope ( কোষ্ঠী ) না জানলেও বলে দেওয়া যায়। প্রবৃত্তির উর্দ্ধে যদি কেউ থাকেন এবং তাঁর উপর প্রবৃত্তিপরায়ণ কোন মানুষের যদি টান থাকে, তবে তিনি তাকে প্রবৃত্তিমুক্ত হতে সাহায্য করতে পারেন। গুরুর প্রয়োজন এইখানে। Love for Ideal ( ইষ্টানুরাগ ) যত বাড়ে, complex ( প্রবৃত্তি )গুলিকে তত সত্তা থেকে আলগা করে চেনা যায়। তখন সেগুলি নিয়ন্ত্রণের সুবিধা হয়।

১০ই ফাল্গুন, মঙ্গলবার, ১৩৫৫ ( ইং ২২।২।৪৯ )

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে ভাবমুগ্ধ অন্তরে বড়াল-বাংলোর উত্তরদিকের বারান্দায় উত্তরাস্য হয়ে তক্তপোষে উপবিষ্ট। স্মরজিৎদা ( ঘোষ ), হরিদাসদা ( সিংহ ) প্রভৃতি অনেকেই তাঁর মধুর সান্নিধ্যে আনন্দে মসগুল হয়ে বসে আছেন।

ভুবনেশ্বরীমা আসতেই শ্রীশ্রীঠাকুর সোল্লাসে জিজ্ঞাসা করলেন—কিরে কী মাল আনিছিস্?

ভুবনেশ্বরীমা—আমলকির মিষ্টি আচার।

লীলাময় প্রভু বললেন—তা' বেশ। এদের হাতে হাতে একটু করে দে ত! এরা খেয়ে দেখুক কেমন হয়েছে।

সবাই হাত ধুয়ে হাতে করে আচার নিয়ে খেলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—কেমন?

সবাই বললেন—খুব ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর ভুবনেশ্বরীমাকে বললেন—যা, বড়বৌয়ের কাছে দিয়ে আয় গিয়ে।

ভুবনেশ্বরীমা চলে গেলেন। ডাঃ কালীদা (সেন), মহিমদা (দে) প্রভৃতি দয়ালকে প্রণাম করে বসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রসঙ্গতঃ বললেন—Sublimated কথার বাংলা করা যায় ভূমায়িত। টানটা প্রথম কেন্দ্রায়িত হয়, তারপর তা ভূমায়িত হয়, ব্যাপ্ত হয়, বিস্তার লাভ করে। এমনতর হলেই তা ঠিক হয়, স্বাভাবিক হয়, সত্যিকার হয়। কেন্দ্রটা আবার ভূমায়িত হওয়া চাই, ভূমায়িত কেন্দ্রে কেন্দ্রায়িত না হলে কেন্দ্রায়িত হওয়ার পূর্ণ সার্থকতা লাভ হয় না। নিজের মনকে অনুসরণ করলে হয় না, যাঁকে অনুসরণ করব তিনি beyond me (আমার বাইরে) ও আমার শ্রেয় হাওয়া চাই। স্বামীর প্রতি টান থাকলেও মেয়েদের ঢের হয়। সীতা, মৈত্রেয়ী, সাবিত্রী, বেহুলা, গার্গী ইত্যাদির জীবন দেখলেই হয়।

প্রফুল্ল—পিতামাতাও সন্তানের গুরুজন। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় পিতামাতা সন্তানের থেকে বেশী প্রবৃত্তিমার্গী। তেমনতর ক্ষেত্রে তাদের অনুসরণ করে লাভ কী হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ যে বললাম কেন্দ্র ভূমায়িত হওয়া চাই। নইলে সবখানি হয় না। কিন্তু নিজের খেয়ালকে অনুসরণ করার থেকে মা-বাবাকে অনুসরণ করা ভাল, কারণ তারা স্বভাবগুরু। মা-বাবার খুশীর জন্য নিজের খেয়ালখুশীকে উল্লঙ্ঘন করার শক্তি ও অভ্যাস যদি গজায়, তার একটা বিশেষ মূল্য আছে। কিন্তু শুধু তাতেই চলবে না।

'পিতামাতা গুরুজনে শ্রদ্ধাভক্তি যাই রাখ না,
ইষ্টানুগ না হলে তা' আনবে নাকো সম্বর্দ্ধনা।'

যারা বাবা-মাকে ভালবাসে তারা বাবা মা-র মঙ্গলের জন্যই ইষ্টের শরণাগত হয়ে সুনির্দিষ্ট ভাবে তাঁকে অনুসরণ করে এবং সেবায় তুষ্ট করে তাদিগকেও ইষ্টে যুক্ত করে তোলে। বাপ মা-র উপর ভক্তিই সার্থক হয়ে ওঠে; যদি তা ভগবদ্ভক্তিতে পর্য্যবসিত হয়।

পরে শ্রীশদা ( রায় চৌধুরী ), সুকুমার ( রায় ), পূজনীয়া অন্নপূর্ণামা প্রভৃতি আসলেন।

অন্নপূর্ণামা কথা প্রসঙ্গে বললেন—আমার খুব ইচ্ছা করে নিজেদের মধ্যে পরস্পর মেলামেশা, যাতায়াত, আদান-প্রদান খুব থাকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রীত হ'য়ে বললেন—সেই ত ভাল। তা'তে শক্তি বাড়ে, ঐক্য হয়, বৈশিষ্ট্য ঠিক থাকে, আত্মীয়তা গজায়। প্রত্যেকে মনে ভাবে যে আমার কেউ আছে। মনের বল বেড়ে যায়। সুখী হওয়ার পথ হলো অপরকে সুখী করা। ঐ নেশা নিয়ে নিরন্তর লেগে প'ড়ে থাকতে হয়। সহযোগিতা খুব ভাল। দেওয়া-নেওয়া। আমি তোমার জন্য করি, কিন্তু একবাটি কাঁঠালের তরকারি রেন্ধেও আমাকে দেওয়ার কথা মনে পড়ে না, তার মানে আমি এতখানি দূরে আছি তোমার মনের থেকে। ওতে দানা বাঁধে না।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর পারিবারিক সেবা, সহযোগিতা, ঐক্য ও সংহতি সম্বন্ধে একটি বাণী দিলেন। কয়েকজন চ'লে গেলেন। পরে দক্ষিণাদা ( সেনগুপ্ত ), বঙ্কিমদা ( দাস ), নিরঙ্কুদা ( মিত্র ) প্রভৃতি আসলেন।

পূর্ব প্রসঙ্গের সূত্র ধরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আগে কত বড় বড় পরিবার ছিল। একশ দেড়শ লোকের একান্নবর্ত্তী বিরাট পরিবার ছিল। পরিবারের কর্ত্তাকে কেন্দ্র করে সবাই কেমন সংহত হয়ে থাকত—সকলেই যেন সকলের জন্য—কেমন একটা একগাটটাভাব – অন্তহীন প্রাণ-ঢালা দরদ ও মমতা। পরস্পরের সুখ শান্তি এবং সংসারের উন্নতির জন্য সকলেই প্রাণের আবেগে করত আর পরিবারের কর্ত্তা যার যথাপ্রয়োজন

যোগান দিতেন, যাতে প্রত্যেকেই তার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ফুটে উঠতে পারে, সার্থক হতে পারে। একেই বলে Indian Communism ( ভারতীয় সাম্যবাদ )। দক্ষিণাদাদের দেশে এই ধরণের একটা পরিবার এখনও আছে শুনেছি।

দক্ষিণাদা—কালিয়ার সেন পরিবারে এমনতরই ছিল। কিন্তু দেশ বিভাগের পরে কী অবস্থা হয়েছে জানিনা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ এক সর্বনাশা ব্যাপার হয়েছে।

১১ই ফাল্গুন, বুধবার, ১৩৫৫ ( ইং ২৩৷২৷৪৯ )

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় তক্তপোষে উপবিষ্ট। নিরঙ্কুদা ( মিত্র ), সুকুমার রায় প্রভৃতি কাছে আছেন।

কথা প্রসঙ্গে প্রফুল্ল (দাস) জিজ্ঞাসা করল—আপনার বিভিন্ন কাজে সৎসঙ্গীরা ত বেশ যোগান দেয়, অথচ উপযুক্ত সংখ্যক লোক যথাসময়ে সাড়া না দেওয়ায় আপনার পরিকল্পিত কাজ যথাযথভাবে উদ্যাপিত হতে পারে না। এরজন্য দায়ী কে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দায়ী আমরা প্রত্যেকে। আমাদের urge (আকূতি) নেই। মুষ্টিমেয় সৎসঙ্গী আছে, তারা খুব করে। তারাই বারবার করে। মায়েদের মধ্যে পর্যন্ত কতজন আছে যেন roaring lioness ( গর্জনকারী সিংহী ) —তারা ইষ্টের জন্য সবকিছু করতে পারে। আবার সৎসঙ্গীদের মধ্যে অনেকে আছে যাদের আমরা সেবা সাহচর্য্য ও প্রেরণা যুগিয়ে তেমনতর উদ্বুদ্ধ ও সক্রিয় করে তুলতে পারি নি। সে ত্রুটি আমাদেরই। আমার কেবলই মনে হয়, কিছু মানুষ ভাল করে লাগলে আজ কি দেশের এই অবস্থা হতে পারত ? নেতাদের কতজনকে বললাম, তোমাদের বললাম। তোমরা যেমন করে যতখানি যা' করবার তা' করলে না, তাই বিপর্য্যয় এড়ান গেল না। মূল কথা কি জান ? ইষ্ট ছাড়া অন্য কোন স্বার্থবুদ্ধি থাকলে, তাদের দিয়ে এ কাজ হয় না, হবার নয়। ইষ্টের জন্য নিজের দেহ-মন-প্রাণ, অর্থ-সামর্থ্য-সময় বিলকুল সঁপে দিতে হয়। তখন

পরমপিতার শক্তিই কাজ করে ভক্তের ভিতর দিয়ে। হনুমানের মত সে অসাধ্য সাধন করে ফেলে।

জনৈক দাদা—সৎসঙ্গীদের তো বিশ্বাসও আছে, ভক্তিও আছে, কিন্তু তেমন urge ( আকূতি ) দেখা যায় না কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তারা তো ভালই। আমরা যারা উপরে আছি, তারাই অন্যরকম। ( এমন সময় মতিদা আসলেন )। এই মতিদাই কত করেছে। এখন আর পারে না। বিয়ের পর কেমন হয়ে গেছে। মতিদা এখন আদর্শে সুদৃঢ় থেকে energised (উৎসাহিত) থাকতে পারে না। Go-between ( কথা খেলাপ ) ক'রে ফেলে—down ( নীচু ) ক'রে দেয় নিজেকে। অথচ মতিদাই ছিল রত্ন, বেফাঁস কিছু করত না। মানুষ কত শ্রদ্ধা করত তাঁকে। যা হোক আমার এখনও ধারণা, কয়েকটা মানুষ ফিঙ্গে হয়ে লাগলে দেশ বিভাগই হতে পারত না এবং সেটা হিন্দু মুসলমান সবার পক্ষেই মঙ্গলজনক হত। একবার ভাঙ্গন শুরু হলে সেইটেই বেড়ে চলে।

প্রফুল্ল—অনেক সময় দেখা যায় যে একজনের হয়ত চাকরি বা অন্য জীবিকা আছে এবং সেই সঙ্গে সে ইষ্টকর্ম করছে। তখন সে টাকা পয়সার ব্যাপারে কথা খেলাপ কমই করে। পরবর্তীকালে সে হয়ত অনন্যকর্ম্মা হয়ে ইষ্টকর্ম্মে ব্রতী হল এবং আর্থিক ব্যাপারে তখন থেকে তার ত্রুটি বিচ্যুতি দেখা দিতে লাগল। আমার মনে হয় প্রয়োজনের চাপে পড়ে এমনতর হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে প্রয়োজনবুদ্ধি বেড়ে যায়। ইষ্টস্বার্থ প্রতিষ্ঠার ধান্ধা, বুদ্ধি এমনভাবে পেয়ে বসে না, যার ফলে অন্য সব প্রয়োজনবোধকে উপেক্ষা করা যায়। স্বার্থছাপান, প্রবৃত্তি-ছাপান ইষ্ট নেশাই এপথে প্রধান সম্বল। ঐটে থাকলে পিছটান, দুঃখ কষ্ট, মান-অপমান তাকে কাবু করতে পারে কমই। মনে করো তুমি আগে যখন বিয়ে না করে ছিলে, তখন এক রকম মন ছিল, এখন বিয়ে করেছ, বৌ আছে ছেলেপিলে আছে। তোমার তো মমতা আছে তাদের পরে।

তারাও চেপে ধরে তোমাকে। না দেখলে, না দিলে চলে না। আবার তোমার শরীরও সুস্থ নয়। যা হোক এ অবস্থার মধ্যে যাই কর, তার মধ্যে পিছুটান থাকেই। সেই দুর্বলতা উপেক্ষা করে বা ত্যাগ করে নিরাশী নির্ম্মম হয়ে কাজ করতে পার না। তাই জীবনটাও উপভোগ করতে পার না। প্যারীকে আমার আবার বিয়ে দেবার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু ওর স্ত্রী মারা যাবার পর কালীদাসী ওরা সবাই নানাভাবে বিয়ের প্রয়োজনের কথা বলল। প্যারীও বাস্তব অসুবিধার কথা বলত। তখন যে আমি না করব, তাতে যে কোন কষ্টই আসুক না কেন, তাতে মনে করত বিয়ে না হয়েই আজ আমার এত সব দুর্ভোগ ভুগতে হচ্ছে। তাই অগত্যা মত দিতে হল। নানাজন নানাভাবে জড়িয়ে পড়ে। কিন্তু এটা ঠিক—যে পাছটান ignore (উপেক্ষা) করতে না পারে, সে চিরদিন suffer করে ( দুর্ভোগ ভোগে )। আগে কেমন সুন্দর ছিল ! কর্ম্মীরা টাকাপয়সার ধার ধারত না, স্ফূর্তিতে কাজকাম করত, আনন্দবাজারে যা জুটত খেত। বিলাসিতা ছিল না, আরামের চাহিদা ছিল না। অর্জন-পটুত্ব ছিল যথেষ্ট। কেউ হয়ত বাইরে কোথাও যাবে। রাস্তার খরচ মাত্র তিনটে টাকা নিয়ে গেছে, তাও খরচ না করে ফিরিয়ে এনে দিত। ভিক্ষাটিক্ষা করে পথের খরচ চালিয়ে নিত। ২ পয়সার মুড়ি কিনে দশ-জনে ভাগ করে খেত। কত আনন্দ ! ভাই ভাই ভাব। কি সুখের দিনই না গেছে।

প্রফুল্ল—আপনার কাজের জন্য বিয়ে না করা একদল সন্ন্যাসী যদি করতেন, তাহলে বোধহয় ভাল হত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা তো হয় নি। আর সন্ন্যাসী হলে aloof (আলগা) হয়ে যায় সংসারীদের থেকে। যেমন রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীরা আছেন। কিন্তু গৃহস্থদের মধ্যে থেকে যদি সন্ন্যাসী হয়, তাদের সংসর্গে গৃহস্থরা উন্নত হয়, সমাজ উন্নত হয়। এইজন্যই যতিআশ্রমের পরিকল্পনা। এর মধ্যে থেকে গোটা কয়েক লোক ঝেড়ে দাঁড়ালে বা কটা তেমন লোক আসলে স্রোত উলটে যায়।

প্রফুল্ল—আমাদের চাইতে কম যোগ্যতাসম্পন্ন লোক বাইরে আর্থিক স্বচ্ছলতা ভোগ করছে। আমাদের ব্রাহ্মণোচিত কর্ম্মে যোগ্যতা কম, তাই বোধহয় আশানুরূপ হচ্ছে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আর্থিক স্বচ্ছলতা যারা ভোগ করছে, তাদের কোনো না কোন দিকে efficiency ( যোগ্যতা ) আছেই যার ভিতর দিয়ে অর্থাগম হয়। আর কিছু না হোক, হয়ত জোচ্চুরিতেই efficiency ( যোগ্যতা ) আছে, তা না হলে পেত না। অবশ্য অসাধু উপায়ে অর্থ উপার্জনের সামর্থ্য আদৌ কাম্য বস্তু নয়। আমাদের এরাই পারে অনেক কিছু করতে। করেছেও, এখন তেমন উৎসাহ সহকারে করে না। যখন ছিল না, তখন করেছে, পেল যখন, তখন থেকে ঢিল দিল।

প্রফুল্ল—তাহলে কাজ আদায় করে নিতে হয়। তাতে করতে বাধ্য হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে বাধ্য হওয়া তো চাই না। আমি চাই ভালবাসাজনিত স্বতঃস্বেচ্ছ বাধ্যতা। অন্যরকম চাইলে ত একটা ফার্ম্ম খুলে বসতাম।

হরিদাসদা—যারা কখনও স্বতঃস্বেচ্ছ দায়িত্ব নিয়ে করবে না, তাদের বাধ্য করিয়ে কাজ করান ত ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাতে তোমার কী হলো ? তারা ত asset ( সম্পদ ) হলো না তোমার, নিজেরাও আত্মশক্তির সন্ধান পেয়ে বেড়ে উঠলো না। কতকগুলি চাকর হলো। দেখ না বেশীর ভাগ অবসরপ্রাপ্ত চাকরদের অবস্থা ! পরের চাকরীতে বাঁধা লাইনে খুব খাটতে পারে, কিন্তু যেই চাকরী চলে গেল, অমনি আর করবার কিছু খুঁজে পায় না। Initiative ( স্বাধীন উদ্যোগ ) বা urge (আকূতি) বলে কিছু থাকে না, নিজে থেকে কিছু করতে পারে না। একটা মানুষ যদি মানুষ না হয়, নিজের কাছেই বা তার কী মূল্য আর তোমারই বা সে করবে কী ? প্রধান কাজ হলো প্রত্যেককে আত্মোপলব্ধির পথে এগিয়ে দেওয়া। সেইটেই আমার কাছে মুখ্য। নইলে একটা কেমিক্যাল ওয়ার্কস-এ লোক খাটিয়ে ত কত টাকা উপায় করা যেত।

প্রফুল্ল—কাজ করিয়ে নিলে কাজের habit (অভ্যাস) টা ত অন্তত হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Habit ( অভ্যাস ) urge (আকূতি) থেকে না হলে তা character (চরিত্র) হয় না। চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব না গজালে চাকরী ছাড়া পথ দেখে না। চাকরেদের একেবারে ছিবড়ে করে ছেড়ে দেয়। Retired hands ( অবসর নেওয়া মানুষদের ) দেখ না? চাকরীতে অভ্যস্ত যারা, তারা প্রায়শঃ হুকুমে চলা ছাড়া চলতে জানে না। মাথা খাটিয়ে স্বাধীনভাবে উপার্জন করতে পারে না। মানুষের ability ( যোগ্যতা ) বাড়ান লাগে, আর সেটা বাড়ে auto initiative active urge-এ ( স্বতঃ স্বেছ সক্রিয় আকূতিতে )। তবে একটা কথা খুবই ঠিক, —আত্মোন্নয়নে শ্রেয়কে দেওয়া ছাড়া তাঁর কাছ থেকে নেওয়ার সংশ্রবই ভাল না। প্রত্যাশা থাকলেই মানুষ দুর্বল হয়ে পড়ে।

প্রফুল্ল—তাহলে অন্য কাজের দ্বারা জীবিকা আহরণ করে, তারপরে ত এ কাজ করা ভাল!

শ্রীশ্রীঠাকুর—তারাই ত করছে। তবে শ্রেয় এইটে। কতকগুলি সন্ন্যাসী চাই, যারা কিনা মানুষের সর্বাঙ্গীন স্বার্থ দেখবে। তারা না থাকলে সকলের ভালমন্দ দেখবে কে? সবাইকে inter-interested ( পারস্পরিকভাবে স্বার্থান্বিত ) করে তুলবে কে? তোমাদের ব্যক্তিগত জীবনে যজন, যাজন, ইষ্টভৃতির অনুষ্ঠান এবং সঙ্ঘগত জীবনে পারস্পরিকতার ফলে যতটুকু হয়েছে, তাতেই এত বড় বার্মা, কলকাতা নোয়াখালি ইত্যাদির disaster ( বিপর্যয় ) গুলি কোন সৎসঙ্গীকে তেমন কাবু করতে পারে নি। পরম পিতার দয়ায় তোমরা যে জিনিষ পেয়েছ, তার তুলনা হয় না। দয়াল শতহস্তে তোমাদের আগলে রাখছেন, রক্ষা করছেন। তোমাদের কাজ হলো সবাইকে এইমহামঙ্গলের অধিকারীকরে তোলা। তাই বলি অনন্যমনা অনন্যকর্মা হয়ে পরম পিতাকে পরিবেশন কর, তাঁর মঙ্গলইচ্ছা দিকে দিকে মূর্ত্ত করে তোল। গোটা কয়েক লোক—

"ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা
নিরাশীর্নির্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ।"

(পরমেশ্বরের জন্য কর্ম করছি—এই বুদ্ধি নিয়ে আমাতে সমস্ত কর্ম সমর্পণ করে ফলাভিসন্ধিরহিত, মমত্বহীন ও শোকশূন্য হয়ে যুদ্ধ কর)—এমনতর হয়ে লাগ। দেখ কী হয়, করেই দেখ।

দুলালীমা বললেন—আমার কি করে চলবে? মানুষের কাছ থেকে নিতে যাওয়া মানে তাদের কষ্ট দেওয়া।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কষ্ট দিয়ে নেবে কেন? সুখী করে নেবে। তোমার বোলচাল ও ব্যবহারে যদি মানুষ শান্তি পেয়ে দেয়, তা হলে কষ্ট দিয়ে নেওয়া হবে কেন? মানুষকে রেঁধে বেড়ে খাওয়াতেও পার, তাতে মানুষ খুশী হয়ে দেয়।

দুলালীমা—তাও আমার এই শরীরে পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর দরদের সঙ্গে বললেন—না পার, আমি ত আছি। তুমি ধর্মপথে চল। তাঁর নীতি পরিপালন কর, তোমার ভাবনা কী?

দুলালীমা—আপনার কাছ থেকে নিতে মন চায় না। আপনার দয়ায় নিজের চেষ্টায় দাঁড়াতে ইচ্ছা করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা ভাল। তবে না পারলে নেবে।

শীতের সকাল। উত্তর দিক থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে। শ্রীশ্রীঠাকুর ভাল করে চাদরটা গায় জড়িয়ে নিয়ে সরোজিনীমাকে বললেন—ভাল করে এক ছিলুম লাগাও। তামাক টেনে একটু গরম হয়ে নিই। ঠাণ্ডায় জমে যাওয়ার দশা। ফাল্গুন মাস পড়ে গেল অথচ শীত যাওয়ার নাম নেই।

সরোজিনীমা তামাক এনে দিলেন। গড়গড়ার নল টানতে টানতে শ্রীশ্রীঠাকুর সস্নেহে স্মরজিৎদাকে বললেন—পাব বলে যদি তুমি আমার কাজ কর, পাবে না। আমাকে দেবে বলে যদি কর, পাওয়া কেউ আটকাতে পারবে না। পাওয়ার বুদ্ধি বড় হলে ফটক পড়ে যায়, মাথা খেলে না, পা চলে না।

প্রফুল্ল—আপনার কাজ আমাদের দিয়ে হতে পারে কি? না, অন্য-রকম জন্মগত বৈশিষ্ট্যওয়ালা লোক দরকার?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের মত লোক দিয়েই হয়। ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠাই যাদের জীবন, ঐ যাদের ধ্যান, জ্ঞান, নেশা, Life interest (জীবন-স্বার্থ)-ই যাদের ইষ্ট, তারাই পারে। যীশু তাঁর পরিষদদের যেমন চরম ত্যাগ, বৈরাগ্য, ভক্তি, বিশ্বাস ও নির্ভরতা নিয়ে কাজে বের হতে বলেছিলেন ঐ ভাবে লাগলে হয়। নিরাশী, নির্মম হয়ে ঝাঁপ দিলে হয়। প্রকৃত সন্ন্যাসী হওয়া লাগে।

প্রফুল্ল—তা হলে ত দেখছি—আমরা ইচ্ছা করছি না বলে হচ্ছে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ! We have luxury of wishes, but no will. (আমাদের হাউসের বিলাস আছে, কিন্তু প্রকৃত ইচ্ছা নেই)।

ঢুলালীমা—ভগবানের ইচ্ছা কি এক এক যুগে এক একভাবে প্রকট হয়? শ্রীকৃষ্ণ একভাবে করেছিলেন, এ যুগে আর একভাবে হচ্ছে!

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভগবানের ইচ্ছা বাঁচাতে চায়। কালের ইচ্ছা মারতে চায়। তিনি বাঁচাতে চান, কিন্তু অনেকে তাঁকে ছেড়ে প্রবৃত্তিকে ভালবাসে বলে বাঁচতে পারে না। ভগবানের যাঁরা স্মরণ নেয়, অনুসরণ করে, তারা প্রবৃত্তির কবলে পড়ে কম, তাই দুঃখ, দুর্ভোগ ও অকালমৃত্যুকে অনেকখানি এড়াতে পারে।

প্রফুল্ল—তাঁর ইচ্ছাই অমোঘ!

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাঁর ইচ্ছা অমোঘ হয়ে দাঁড়ায় যার কাছে, সেখানে তা অমোঘই।

বিকালে দয়ালবাগের একজন বিশিষ্ট সৎসঙ্গী এবং আরো কতিপয় স্থানীয় ভদ্রলোক শ্রীশ্রীঠাকুর দর্শনে এসেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল বাংলোর উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে রোদ পিঠ করে ইজিচেয়ারে উপবিষ্ট। বীরেনদা (ভট্টাচার্য্য), স্মরজিৎদা (ঘোষ), জিতেন ভাই (দেববর্মণ) প্রভৃতি এবং মায়েদের মধ্যে অনেকে দয়ালকে ঘিরে বসে আছেন। সবাই প্রণাম করে উপবেশন করলেন।

দয়াল বাগের সৎসঙ্গী—আমি বোধহয় আপনাকে দয়ালবাগে দেখেছি বলে মনে হচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি একবার মাত্র এলাহাবাদ গিয়েছিলাম আর গিয়েছিলাম কাশীতে মহারাজ সাহেবের তিরোধানের প্রাক্কালে। তখন ছোট ছিলাম, মার সঙ্গে গিয়েছিলাম। আমার মা হুজুর মহারাজের কাছ থেকে দীক্ষা নিয়েছিলেন, তখন সাধু দয়াল শরণ ছিলেন।

প্রফুল্ল—সাধু দয়ালশরণ কে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনি হুজুর মহারাজের সঙ্গে থাকতেন। তাঁর অনেক চিঠি আমাদের বাড়ীতে আছে। হুজুর মহারাজের চিঠিও আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনি কতদিন আগ্রা আছেন?

উক্ত ভদ্রলোক—১৯২০ সাল থেকে।

ভদ্রলোক পরে বললেন—বাংলাদেশের লোককে সৎনাম বিতরণের জন্য দয়াল আপনাকে পাঠিয়েছেন সেখানে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দয়াল কাকে দিয়ে কী করান, তা তিনিই জানেন। তাঁর কাছে বাঙালী নেই, বেহারী নেই, পাঞ্জাবী নেই, গুজরাটী নেই, আমেরিকান নেই, ইংরেজ নেই, হিন্দু নেই, খ্রীস্টান নেই, মুসলমান নেই। তিনি আমাদের শিখিয়ে দেন যে আমরা সবাই তাঁর এবং আমরা সবাই তাঁর বলে আমাদের প্রত্যেকে প্রত্যেকের, যেমন বাপের পাঁচ ছেলে পরস্পর পরস্পরের। মানুষ ভগবৎপ্রেমী হলে মানব সমাজে প্রেমের সাম্রাজ্য বিস্তারলাভ করে।

ভদ্রলোক—সন্ত সদগুরু কি এক সময় একাধিক থাকেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাঁরা যতজনই থাকুন, তাঁরা বহু নয়। তাঁরা একজনই। তাঁদের মধ্যে কখনও বিরোধ বা অসঙ্গতি বলে কিছু থাকতে পারে না। তাঁরা এক কথাই কন।

ভদ্রলোক—এখন ত কত জায়গায় রকমারি আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আসলের সঙ্গে যেখানে ভেদ আছে, সেখানে কোন গলতি আছে বুঝতে হবে।

ভদ্রলোক—সবাই ত সেই কথা বলেন, আসল কে বুঝব কী করে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যার যেমন অনুরাগ, সে বুঝবে তেমন।

দুলালীমা—মহারাজ সাহেব লিখেছেন, তিনি বাংলায় আসবেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি ও সব বুঝি না, আমি বুঝি—তাঁর প্রতি ভক্তিমান যে যেমন, বুঝবেও সে তেমন। তিনি বাংলায়ই আসুন, মাদ্রাজেই আসুন, পাঞ্জাবেই আসুন, তাতে আসে যায় না। যে যেখানকারই মানুষ হোক, সাচ্চা ভক্তি থাকলেই তাঁকে চিনতে পারে। বাহ্যিক বিচারে তাঁকে ধরা যায় না।

ভদ্রলোক—নেপালের মহারাজ সৎসঙ্গকে ওখানে নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন সনাতন ধর্মবিরোধী বলে। আমি গিয়েছিলাম সেখানে, আমি শাস্ত্র প্রমাণ দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছি এইই সত্যিকার জীবন্ত সনাতন ধর্ম। It is old wine in new bottle (এ জিনিস নতুন বোতলে পুরোন মদ)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রাচীনকে বাদ দিতে নেই, প্রাচীনের পরিপূরণ যাতে হয় তাই করা লাগে।

এরপর ভদ্রলোক বিদায় নিতে চাইলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনি আসাতে আমার খুব ভাল লাগল। সুযোগ মত আবার আসবেন।

উনি চলে যাবার পর শ্রীশ্রীঠাকুর দুলালীমাকে লক্ষ্য করে বললেন—আমার সামনে আমার সম্বন্ধে বললে আমার অত্যন্ত খারাপ লাগে। আমি কতবার বারণ করেছি, কিন্তু সেদিকে অনেকেরই খেয়াল থাকে না। আমার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলতে গেলে আমার অসাক্ষাতে বলতে হয়। এবং তাও সবার কাছে সব কথা বলা ভাল না। যার কাছে যাই বল না কেন, তা স্থান, কাল, পাত্র ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে শ্রদ্ধার উদ্বোধন করে যেখানে যখন যতটুকু সমীচীন ততটুকু বলতে হয়। যেখানে যে কথা বললে কদর্থ হওয়ার সম্ভাবনা আছে, সেখানে সে কথা না বলাই ভাল। সত্যিকার ভাবভক্তি থাকলে বেফাঁস কথা মুখ থেকে বেরয়ই কম।

সন্ধ্যার দিকে শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তবৃন্দ পরিবেষ্টিত হয়ে গোল তাঁবুতে শুভ্র শয্যায় সুখাসীন। উজ্জ্বল বিজলী বাতির আলোয় তাঁর বদন কমল উদ্ভাসিত। ভক্তবৃন্দ তাঁর সান্নিধ্যে পরম পুলকিত। এমন সময় পূজনীয় বড়দা আসাতে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রীত হয়ে তাঁকে বসতে বললেন।

কথা প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমি অনেক সময় অনেক কিছু করতে বলি, তার মানে সবগুলি এখনই যে করতে হবে, তা নয়। কোনটার পর কোনটা করতে হবে ঠিক করে নিও। সব কাজেরই একটা পর্যায় আছে। সেইভাবে করতে হয়। ভবিষ্যতে করতে হবে তারও প্রস্তুতি আগে থাকতে করতে হয়। দূরদৃষ্টি চাই, ধ্যান চাই। মাথায় ছবিটা স্পষ্ট না ফুটলে বড় কাজ করা যায় না।

বড়দা—আজ্ঞে !

১৩ই ফাল্গুন, শুক্রবার, ১৩৫৫ (ইং ২৫।২।৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর সামনের বারান্দায় আসীন। বর্ধমানের জমিদার যামিনী বাবু (সিংহ), স্থানীয় এক ভদ্রলোক, কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), গোপেনদা (রায়) প্রভৃতি অনেকেই কাছে আছেন। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন— মনের স্বাস্থ্যের উপর শরীরের স্বাস্থ্য খুব নির্ভর করে। তাই মনের শুদ্ধতা, সুস্থতা ও সবলতার উপর খুব নজর রাখতে হয়। মানুষ যত প্রবৃত্তিপরায়ণ ও স্বার্থসন্ধিৎসু হয়, ততই তার মন রুগ্ণ ও সঙ্কীর্ণ হয়ে ওঠে। এইগুলি আবার রোগব্যাধি ডেকে আনে। পারিপার্শ্বিক যাতে সুস্থ, সদাচারী, শুদ্ধ ও প্রফুল্ল থাকে সেদিকে সক্রিয় দৃষ্টি দিতে হয়। এতে মানস প্রসারণা বেড়ে যায়। তার ফলে জীবনীয় উল্লাসের আবির্ভাব হয়। সবচেয়ে গোড়ায় লাগে ইষ্টপ্রাণতা। নামধ্যান ও মানসিক সমতা খুব দরকার। সাত্বিক আহার গ্রহণ করতে হয়। কথাবার্তা, চালচলন, আচার-ব্যবহারে সংযত হতে হয়। যাদের মেজাজের উপর control (আধিপত্য) নেই, যারা বিরোধ ও

বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে মানুষের মনে ক্ষতের সৃষ্টি করে, তাদের শরীরও দিন দিন ভেঙ্গে পড়ে। আবার Sex-life ( যৌন জীবন ) well-regulated ( সুনিয়ন্ত্রিত ) হওয়া দরকার। পরিশ্রম ও বিশ্রাম মনোমদ-হওয়া চাই। রোজ বেড়ান ভাল। আবেগপরায়ণতা ও কর্ম প্রবণতার সমন্বয় দরকার। আর চাই পারিবারিক শান্তির ব্যবস্থা। রোজ তিল বাটা ও ইসবগুল খাওয়া ভাল। নিত্য কোষ্ঠ পরিষ্কার হলে গলদ জমতে পারে না।

কেষ্টদা—পেটে যে নানারকম রোগবীজাণুর সৃষ্টি হয়ে মানুষকে মেরে দেয়, তা কমে কিভাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অবিহিত খাদ্য, পানীয়, অপরিচ্ছন্নতা ও কদাচারের ফলে যাতে ক্ষতিকর সংক্রমণ না ঘটতে পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হয়। তাছাড়া আমার মনে হয় তিলবাটা অনেক বদমাল বের করে দেয়। ওতে পাকস্থলীকে অনেকখানি মসৃণও পিচ্ছিল করে রাখে। ভিতরে কঠিন আস্তরণ জমতে দেয় না। তাই ওগুলি বিশেষ বাড়তে পারে না। তিলবাটা স্বাস্থের পক্ষেও ভাল। শরীর সুস্থ থাকলে রোগজীবাণু স্বতঃই প্রতিরুদ্ধ হয়।

বাবা বৈদ্যনাথের মন্দিরে বেশ ভিড়। সেই প্রসঙ্গে কথা উঠলো।

যামিনীবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—ভগবানের প্রতি টান ত অন্তরের জিনিস। ভিড় ঠেলে মন্দিরে গেলেই কি হ'লো?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মন্দিরে যাবেন কিনা সে আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু ভগবানের জন্য বিধি মাফিক করার ভিতর দিয়ে যে তার প্রতি টান গজাতে থাকে, এ কথা ঠিকই। তাই আছে ইষ্টপ্রীত্যর্থে যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি করার কথা। ঐ করার ভিতর দিয়ে ইষ্টানুরাগ বাড়ে। তাঁর জন্য করা চাই। যেমন ছেলের জন্য অতো খাটি, অতো করি, তাই তার উপর টান বাড়ে।

যামিনীবাবু—কামনা নিয়ে কী তাঁকে ডাকা ভাল?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাঁর পূজাটাই অর্থাৎ সুখ সম্বর্দ্ধনাই হওয়া চাই কামনার

বস্তু। নিজের জন্য চাইলেই বন্ধন আর ইষ্টের জন্য চাইলেই মুক্তি।

যামিনীবাবু—ভক্তি না জ্ঞান কোনটা বড় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভক্তি থাকলে জ্ঞান আপনিই আসে। ভক্তি বাদ দিয়ে প্রকৃত জ্ঞান হয় না। ভক্তিটা হলো নেশা। নেশায় interest (অনুরাগ) হয়। আর interest-এ (অনুরাগে) activity (কর্ম্ম) ও observation (পর্য্যবেক্ষণ) ভাল হয়। তার থেকে জ্ঞান সহজে আসে।

যামিনীবাবু—ভক্তিতে ত মোহ আসতে পারে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভক্তিতে মোহ আসে বলছেন ? যদি তাকে মোহই বলেন, সেই মোহই সব মোহ নষ্ট করে। ভক্তিতে ভগবান ও তাবৎ বিশ্ব আপন হয়। তখন আপনজনের প্রতি যে টান থাকে, তাও ভগবৎ-প্রীতির পরিপোষক হয়।

যামিনীবাবুরা বিদায় নিলেন।

দুলালীমা—শব্দ মিলনা কঠিন নেহি হ্যায়। গুরু মিলনা কঠিন হ্যায়। এর মানে কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—গুরু মিললে তাঁর প্রতি টান নিয়ে সাধন করলে শব্দ আপনিই মেলে। গুরু মিলনা মানে গুরু সে মিলনা—গুরুর প্রতি প্রেম হওয়া। প্রেম জিনিসটাই অহেতুক। কেনা ভালবাসি জানি না। আমার কোন স্বার্থ নাই, প্রয়োজন নাই, সর্ত নাই। গুরুকে সুখী করাই, গুরুর ইচ্ছা পূরণ করাই, গুরুর অনুগত হয়ে চলাই, গুরুগত প্রাণ হয়ে তাঁর সেবা করাই আমার একমাত্র স্বার্থ, একমাত্র প্রয়োজন। এতেই জীবের চরম সার্থকতা। এতে মানুষ সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ, বন্ধন-মুক্তির পারে চলে যায়। চাওয়া পাওয়ার বালাই থাকে না। ভক্ত গুরুর জন্য তখন ক্রমাগত আত্মোৎসর্গ করে এবং আনন্দে মসগুল হয়ে ওঠে।

দুলালীমা—আবার আছে শব্দই গুরু।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরে শব্দই গুরু হন। ওই ধরেই যাওয়া লাগে। ও পথেও গুরুর প্রতি টান ছাড়া অগ্রসর হওয়া যায় না। নচেৎ লয় আসে।

দুলালীমা—গুরুর প্রতি খুব ভালবাসা হয় কি করে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ছেলেকে মানুষ করি। তাকে খাওয়াই-দাওয়াই যত্ন করি। গুরুর জন্য ঐ রকম করা লাগে। তাঁর কথাই ভাবতে হয়। তাঁর কথাই বলতে হয়, তাঁর তুষ্টিপুষ্টি স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠার জন্যই যা কিছু করতে হয় এবং এটা নিরবচ্ছিন্নভাবে। এইভাবে করতে করতে টান আপনি আসে।

দুলালীমা—অমন ত করতে পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে যতটা পারে। যা করণীয় সে ব্যাপারে না বলতেও হয় না, ভাবতেও হয় না বরং যা করণীয় তা করায় যথাসাধ্য লেগে থাকতে হয়। তাতে নেশা চেপে যায়। তাঁকে না হলে ত আমার চলবে না। সুতরাং নেতিবাচক ভাবের প্রশ্রয় দিয়ে আমার লাভ কী? বরং যেমন বলায়, যেমন ভাবায়, যেমন করায় টান অচ্যুত হয়, তেমন বলা, তেমন ভাবা ও তেমন করার স্রোতের মধ্যে ফেলে রাখতে হয় নিজেকে। হবেই, করবই, এমনতর রোখ চাই। মন্ত্রের মত বলতে হয়—আমি ইষ্টের, আমি ইষ্টের। ইষ্টের জন্যই আমি ও আমার যা কিছু। আমার দেহ মন প্রাণ তাঁরই সেবার উপকরণ মাত্র। এই ভাবে করতে করতে মনপ্রাণ সক্রিয় অনুরাগের আবেগে উত্তাল হয়ে ওঠে।

তাঁর চোখমুখ এখন আনন্দে পরিস্ফীত ও উদ্ভাসিত। ভক্তবৃন্দের অন্তর গভীরভাবে প্রেরণা প্রদীপ্ত।

খগেনদা (তপাদার) আসতে শ্রীশ্রীঠাকুর যতি আশ্রমের ঘরের কাজকর্ম সম্পর্কে জানতে চাইলেন।

খগেনদা – ঠিক সময় মতই সব হয়ে যাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কাজ করতে হয় ন্যূনতম সময়ে নিখুঁত ও সুন্দরভাবে এবং স্বল্পতম ব্যয়ে। এইভাবে কাজ করতে করতে দক্ষতা বেড়ে যায়। ইষ্টকে খুশি করে খুশি হওয়ার নেশা থাকলে দক্ষতা ও ক্ষিপ্রতা আপনা থেকেই বেড়ে যায়।

অনৈক দাদা—সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা গেল, এখন রাজনৈতিক দলাদলির দাঙ্গায় পড়ে ত প্রাণ যায়। উপায় কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সামঞ্জস্য করে আমাদেরটা ধরে চলা লাগে। একদেশ-দর্শী কোন মতবাদ ধরে চললে বাঁচার পথ হবে না। কারও সঙ্গে আমাদের বিরোধ নেই। আমরা চাই সবারই পরিপূরণ। ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত সত্তার সবখানি নিয়েই আমাদের কারবার। মানুষের প্রকৃত স্বার্থ কোথায় সেইটে তাদের ধরিয়ে দিতে হয়। ভগবদনুরাগ ছাড়া সত্তা ও তার স্বার্থ সম্বন্ধে বোধ গজাতে পারে না।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর কয়েকটি বাণী দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে গোলতাঁবুতে তক্তপোষে দক্ষিণাস্য হয়ে উপবিষ্ট। কেষ্টদা ( ভট্টাচার্য ), বীরেনদা ( মিত্র ), শ্রীশদা (রায় চৌধুরী), হরিদাসদা ( সিংহ ), কালীদা ( সেন ), গুরুদাসদা ( সিংহ ), মায়া মামীমা, কালী-দাসীমা, কালিষষ্ঠীমা, ননীমা, সরোজিনীমা প্রভৃতি চারিদিক ঘিরে বসে আছেন।

আজ প্রদত্ত বাণীগুলি পড়ে শোনান হল। তারপর কেষ্টদা কথায়-কথায় বললেন—নাম পেয়ে আপনা থেকে যারা সাধনভজন করে, তাদের ত হয়ই, কিন্তু জোর জবরদস্তি করে করলে কি কিছু হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—জোর করে করতে করতে পরে হয়ত spontanious ( স্বতঃ ) হয়।

কেষ্টদা—পাহাড়-টাহাড়ে নির্জনে সাধন করলে কি হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—গুরুভক্তি না থাকলে যেখানেই যেয়ে সাধন কর কিছুই হবে না। একটা মক্স হয় মাত্র। মক্সতে প্রাণের ক্ষুধা মেটে না। গানে আছে—ত্রিসন্ধ্যা যে বলে কালী পূজা সন্ধ্যা কিবা চায়?

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর বাণী দিলেন—

শ্রেয়ের প্রতি প্রীতি
আত্মনিয়োগ,
সেবা সংরক্ষণী চর্য্যা,
—এর ভিতর দিয়ে যে আগ্রহ উন্মাদনা আসে—
প্রাণের ক্ষুধার ওষুধই ওখানে।

এরপর স্বগতভাবে বললেন—আমার মনে হয় প্রত্যেকটা মানুষই এক একটা ভাবতরঙ্গ বা ভাববীচি বিশেষ। বীচিটা বিবর্তিত হয় ইষ্টানুগ

tuning ( একতানতা ) মাফিক। কিন্তু তার বৈশিষ্ট্য থাকেই। দুটো জিনিস কখনও একরকম হয় না। গাছের দুটো পাতা, দুটো মানুষ, দুটো কুকুর কখনও এক রকম নয়। স্তরে স্তরে বীচি আছে—এক এক জাতির, এক এক গুচ্ছের। এক এক প্রকৃতির, এক এক বিশেষের এক এক বীচি। নির্বিশেষ ultimate ( চরম ) সত্তাটাও একটা বীচি। যার থেকে সব বিশেষের আবির্ভাব, সেইটেই সৃষ্টির মূল বীজ বা কারণ বীজ বা সৎনাম। আমরা তাকেই বীজমন্ত্র বলি যা কিনা আদিম তরঙ্গের শাব্দিক প্রতিমূর্তি। প্রকৃতপক্ষে এটা সত্তাগত অনুভূতির শাব্দিক প্রতীক। আদিম তরঙ্গের অন্তর্নিহিত প্রাণমর্ম যখন আমাদের বোধগোচর হয় তখন অফুরন্ত শক্তি ও জ্ঞান আমাদের করতলগত হয়। গুরু নিষ্ঠাই এ পথে প্রধান পাথেয়।

কেষ্টদা—উইলিয়াম জেমস বলেছেন এমন মানুষ চাই যার ভিতর sensory nerve ( বোধপ্রবাহী স্নায়ু ), motor nerve ( কর্মপ্রবোধী স্নায়ু ) এবং central nervous system ( কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র ) সমভাবে চরম বিকাশ ও সঙ্গতি লাভ করেছে। আদর্শের কথা এইভাবে বলাতে অনেকে তাকে বস্তুবাদী দার্শনিক বলে অভিহিত করেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমারটা তাই বলবে না ত ?

কেষ্টদা—না, তবে তথাকথিত ধার্মিক ও সিদ্ধাই-বাতিকগ্রস্ত লোকেরা হয়ত পছন্দ করবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Miracle ( সিদ্ধাই ) কথার মানেই হল অবচেতন মনের ইচ্ছায় সংঘটিত একটা ঘটনা যা কিনা সচেতন মনের চেতনার-পরিধির বাইরে।

কেষ্টদা—ভাববাণীতে আছে—miracle ( সিদ্ধাই ) দেখার বুদ্ধি যতক্ষণ, ততক্ষণ দীক্ষা দিবি না।

১৪ই ফাল্গুন, শনিবার, ১৩৫৫ ( ইং ২৬।২।৪৯ )

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর সামনের বারান্দায় তক্তপোষে এসে বসেছেন। অনেকেই তাঁকে প্রণাম করে যাচ্ছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য),

বীরেনদা ( ভট্টাচার্য্য ), শঙ্করদা ( কর্ম্মকার ), নিরঙ্কুদা ( মিত্র ) প্রভৃতি এবং মায়েদের মধ্যে অনেকে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বাণী দিলেন।

তারপর বললেন—উচ্চবংশের মেয়েবিয়ে করলে সন্তানের gene-cohesion ( জনি-সংসক্তি ) দুর্ব্বল হয়ে পড়ে, ফলে জন ও সমাজ অল্পায়ু হ'তে থাকে। তাছাড়া আমার মনে হয়, প্রতিলোম যৌন সংস্রবের ফলে পুরুষ ও নারী উভয়েরই স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে।

এরপর সদাচার সম্বন্ধে কথা উঠলো।

কথাপ্রসঙ্গে কেষ্টদা বললেন—হিসাবমত একট মাছি গায় বসলেও স্নান করা উচিত, সে সদাচার ত আমরা পালন করি না অথচ বেঁচে থাকি। তাহলে ত মূল জিনিষ হলো জীবনীশক্তি বাড়ানো। কোন্ সদাচারে তা বাড়ে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তপশ্চারণ preventive ও curative force ( রোগপ্রতিষেধী ও রোগদূরীকরণী ক্ষমতা ) accelerate ( ত্বরান্বিত ) করে। আর সদাচারে সেটা maintained ( পরিরক্ষিত ) হয়।

কেষ্টদা—পাতঞ্জলে আছে শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায়, ঈশ্বর-প্রণিধান এইগুলি হলো নিয়ম এবং অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ এইগুলি হলো যম অর্থাৎ সংযম।

প্রফুল্ল—তপশ্চারণ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কেষ্টদা যা' বললো ঐগুলি। গুরুকেন্দ্রিক হয়ে ঐগুলি করতে হয়।

কেষ্টদা—আবার আছে যে অপরিগ্রহস্থৈর্য্যের ভিতর দিয়ে পূর্ব্ব-জন্মের স্মৃতি জাগ্রত হয়। মনটা বাধ্যবাধকতা ও অপরের অশুভপ্রভাব থেকে মুক্ত থাকে বলে বোধহয় অনেকখানি পবিত্র ও স্থির থাকে। তারফলে ওটার সুবিধা হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ। মানুষের মন যত অভিভূতিমুক্ত, স্বার্থপ্রত্যাশা-হীন, নির্লোভ, নির্ম্মল ও প্রশান্ত হয়, ততই সেখানে স্মৃতি ও চেতনা উজ্জ্বল হয়। সত্য প্রতিভাত হয়।

কেষ্টদা—মনুতে আছে গুরুর সামনে বসতে নেই। তা কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয় তাঁর দৃষ্টি অবরুদ্ধ হয় এমনতরভাবে তাঁর সামনাসামনি বসতে নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর একটুপর বললেন—কাল রাজেন গভর্ণরের সঙ্গে দেখা করে এসেছে।

কেষ্টদা—রাজেন গিয়েছিল ইউনাইটেড প্রেস অফ ইণ্ডিয়ার বিশেষ প্রতিনিধি হিসাবে। আমাদের আরো কয়েকজনকে বিধুবাবু ইউ পি আই এর বিশেষ প্রতিনিধি করে দিলেন। কিন্তু তারা সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয় কাজ করতে যে বিদ্যেবুদ্ধি বেশী লাগে, তা নয়। কিশোরী, মহারাজ এদের কতটুকু বিদ্যা ছিল? ওই নিয়েই ওরা কত বড় বড়লোককে যাজনে মোহিত করে দিত। নিস্প্রশ্ন করে দিত। তা পারত urge (আকূতি) ছিল বলে। এখানে যারা আছে, বিদ্যে কিছু যে কম আছে কারও, তা নয় কিন্তু সেই চরিত্র নেই, প্রচণ্ড টানের ভিতর দিয়ে যে চরিত্র গজায়।

হরিদাসদা (সিংহ), পণ্ডিতভাই (ভট্টাচার্য্য), প্যারীদা (নন্দী) প্রভৃতি এসে বসলেন।

কেষ্টদা বললেন—তাদের যেরকম কষ্টে কেটেছে, সেইরকম কষ্টের মধ্যে ফেললে ঠিক হয়ে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কষ্ট তারা বোধই করত না। তখন ছিল না কিছু। তাদের প্রত্যাশাও ছিল না। তারা মুসড়েও পড়ত না। আনন্দের সঙ্গে করে যেত। খুব যে বুদ্ধি করে, plan (পরিকল্পনা) এঁটে কিছু করত, তা নয়। নেশার ঝোঁকে যখন যেমন প্রয়োজন,করত। মানুষের ভাল না হলে আমার ভাল হতে পারে না। এবুদ্ধি ছিল। আজীবন কম পরিশ্রম করেছে মানুষের জন্য? খুব ইষ্টানুগ সেবাপ্রাণ ছিল। কিশোরী নিজের কথা বলত বলে কেউ কেউ বলে। কিন্তু তার নিজের জীবনে সে কী ছিল এবং একজনকে ভাল বেসে সে কিসের থেকে কী

হয়ে উঠেছিল, তাই ছাড়া আর তার বলার কীই বা ছিল? এই যে নিজের কাহিনী বলত, তার মধ্যে তার আত্মপ্রতিষ্ঠার বালাই ছিল না। অকপটে সে ভালমন্দ সব তুলে ধরত। আর তাই শুনেই মানুষ কত অনুপ্রাণিত হত। ওর যাজন সত্যিই উপভোগ্য ছিল। যাজনের সময় ওর চোখমুখ চুল দাড়ি কেমন হয়ে উঠত। ভাষার দিক দিয়ে দেখেন মহারাজ যে চিঠিগুলি লিখেছে—কী সুন্দর ভাষা। আর স্বভাবও ছিল কেমন মিষ্টি। আসল কথা কঞ্জুষের মত ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠাপন্ন হওয়া। ওই ছাড়া আর কোন qualification (গুণ) qualification (গুণ) নয়।

কেষ্টদা—এমন মানুষ না হলে সংখ্যা বাড়া একটা ভার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভার হোক না হোক, তারা করতে পারে না কিছু।

কেষ্টদা—তা'হলেই ভার হলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বেশী মানুষ লাগে না। বুদ্ধদেব ত পাঁচ জনকে নিয়ে আরম্ভ করলেন। আনন্দ-টানন্দ ত তার পরে।

একটু থেমে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আগে আমি কাজ করতাম। মা যাওয়ার পর আমি কাজ করতে পারি না। সেইদিক থেকে অসুবিধা হয়ে গেছে। আর কাজের লোক যারা আছে, go-between (দ্বন্দী-বৃত্তি) আবার তাদের অনেককে খুঁতো করে রেখেছে। চলন-চরিত্র ঠিক না থাকলে শুধু বাইরের চটকদারিতে ত পরমপিতার কাজ হবার নয়।

এরপর কথাপ্রসঙ্গে কেষ্টদা বললেন—ধাতুগত অর্থের দিক দিয়ে দেখতে গেলে ক্ষমা কথার মানে হওয়া উচিত সক্ষম হয়ে ওঠা ও সক্ষম করে তোলা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ।

কালীদা (সেন)—আমি কাউকে যথেচ্ছ গালাগালি দিলাম। তার মনে রূঢ়ভাবে আঘাত করলাম, পরে তার কাছে লোক-দেখানভাবে ক্ষমা চাইলাম, এবং বাহ্যতঃ মিটমাট হয়ে গেল, এতে কি ক্ষমার ঐ অর্থ সার্থক হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মনের ক্ষত জুড়ে দেওয়া চাই। তা যদি না দাও, ওই ক্ষত থাকবে এবং একদিন সে ছোবল মারবে। তাই ক্ষমা চাওয়া বা ক্ষমা করা ব্যাপারটা উপরসা হলে হবে না। যে ক্ষমা চাইবে তার অন্তরে এমন অনুতাপ জাগা চাই, যাতে সে বারংবার একই অপরাধ না করে। আবার যার কাছে ক্ষমা চাইবে তা এমনভাবে চাইবে যাতে তার অন্তরের সব বেদনা ধুয়ে মুছে যায় এবং তার অন্তরে প্রীতি ও সহানুভূতির একটা প্লাবন বয়ে যায়। এতখানি হওয়া চাই। জ্ঞান ও প্রেম যাদের অন্তরে উচ্ছল, তারা স্বতঃই বুঝতে পারে কে কোন্ অবস্থায় পড়ে কেন কী আচরণ করে, তাই তারা যেন মানুষকে ক্ষমা করেই আছে। তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করলেও তারা তা'গায়েই মাখে না। এতে অনেকখানি ক্ষমতা লাগে। আবার এমনতর মহৎ যারা, তাদের প্রতি শ্রদ্ধার ভিতর দিয়েও অপরে লাভবান হয়।

পরে কথায় কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এমন কতকগুলি পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, যেখানে মানুষ একেবারে অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়ে যায়। যেখানে প্রতিকারের কোন পথ থাকে না। চুপচাপ স'য়ে যেতে হয়। মনে পড়ে, একসময় একটা মেয়ে আমাকে বিয়ে করতে চায়। তা' না পেরে শেষটা তার আমার উপর দারুণ আক্রোশ হলো। বলতো—ওর রক্ত চাই। —বলেই শ্রীশ্রীঠাকুর আপনমনে হাসতে লাগলেন।

নিরঙ্কুদা—অকাট্য বিশ্বাসে নাকি সব কিছু হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বেশীরভাগ সময় আমরা হরিও বলি, কাছাও খুলি। যেটা ব্যত্যয় হলো সেটা ভগবানের। যেটা হাসিল করলাম সেখানে আমি করেছি। এমনতর রকমে হয় না। একটা দাঁড়া ঠিক থাকা চাই। সবকিছু ভগবানের ইচ্ছাতে হচ্ছে যদি বল তবে জয় পরাজয়, খ্যাতি অখ্যাতি, লাভ ক্ষতি, সবকিছুর মধ্যেই তাঁর মঙ্গল-ইচ্ছা দেখে মনের সমতা বজায় রাখতে হবে। সব চাইতে ভাল, সব অবস্থায় ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠার দিকে নজর রেখে চলা।

দুপুরে ভোগের পর শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর ঘরে বিছানায় বসে তাম্রকুট সেবন করছেন। মায়েরা এসে জড় হয়েছেন।

প্রফুল্ল—আপনি লাভজনক কর্ম্মের কথা বলেন, এর মানদণ্ড কী? ঋত্বিকদের ত ঋত্বিকী একটা মানদণ্ড, যাঁরা অন্য কাজ নিয়ে আছেন, তাদের কাজের বিচার হবে কী দিয়ে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—একজনের কাজ কতজনকে exalt (উন্নত) করলো, integrate (সংহত) করলো, তাই-ই কাজটা কতখানি profitable (লাভজনক) তার মাপকাঠি। তুমি যে এত বাণী ও কথোপকথন লিখছ, হয়ত বুঝতে পারছ না ওর ফল কী। কিন্তু সাজিয়ে যদি বের করত পার, ওতে কত লোকের যে কত উপকার হবে, তা হয়ত ভাবতে পারছ না। সেইটে করতে পারলে একটা বিরাট profitable work (লাভজনক কাজ) হয়।

প্রফুল্ল—ফিলান্থ্রপি অফিসে যারা কাজ করছে, ঐ দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের কাজের মূল্য কিভাবে নির্দ্ধারিত হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তারা যদি নিখুঁতভাবে সময়ের কাজ সময়ে করে রাখে, সেইটের পর দাঁড়িয়ে organisation (সংগঠন) আরোর পথে এগিয়ে যেতে পারে।

প্রফুল্ল—সংগঠন যদি তার সদ্ব্যবহার না করে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তখন সে ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

……যেখানে যেমন কাজ, সেখানে তার পরিপ্রেক্ষিতে বুঝতে হয়। ধর একজন হয়ত অফিসে খরচের বরাদ্দ করছে। সে wisely (সুষ্ঠুভাবে) কত save (সঞ্চয়) করতে পারে, এইটে দিয়ে বোঝা যাবে সে কতখানি profitably (লাভজনকভাবে) কাজ করছে। Save (সঞ্চয়) করতে গেলে মানুষকে তার আবার অতখানি exalt (উন্নত) করা লাগবে। মানুষকে তাজা না রেখে টাকা বাঁচাবার ত কোন মানে হয় না। প্রত্যেকে যাতে দক্ষ হয়, যোগ্য হয়, অর্জ্জনপটু হয় তাই করা লাগে। এইভাবে প্রত্যেক ব্যাপারে।

তোমার ঐ কৃষ্টিবান্ধবের খাতা যদি খোল, কে কতগুলি কৃষ্টিবান্ধব করেছে বোঝা যায়। এরমধ্যে নিয়মিতভাবে করছে এমনতর কৃষ্টিবান্ধব

যাকে দিয়ে যতটা হয়েছে বলতে হবে তার কাজ ততটা profitable (লাভজনক)। কেউ profitable (লাভজনক) কাজ করছে কিনা, সে নিজেই তার কাজের ফলাফলের দিকে চেয়ে বুঝতে পারে। একজন হয়ত চিঠিপত্র লিখছে। তাতে কতগুলি মানুষ অনুপ্রাণিত হচ্ছে, তাদের উৎসর্গপ্রবৃত্তি কতখানি জাগছে এবং organisation (সংগঠন) তার ভিতর দিয়ে কতখানি লাভবান হচ্ছে, তা দেখে বোঝা যায় তার কাজ কোন দরের। এইভাবে প্রত্যেক কাজের ঐ দিকটা আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে ভক্তবৃন্দপরিবেষ্টিত হয়ে বড়াল-বাংলোর প্রাঙ্গণে ইজিচেয়ারে বসে আছেন। এক বহিরাগত দাদা তাঁর নানাপ্রকার বিপদ আপদের কথা নিবেদন করছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাঁকে ভালবাস। যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি কর। ভেবো না, ঠিক আবার উঠে দাঁড়াবে। তবে একটু সময় নেবে।

উক্তদাদা—সময় লাগবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ! নামতে দেরী লাগে না। উঠতে দেরী লাগে তবে খুব সুকৃতি ছিল। তাই এত বিপদের মধ্যেও এসে পরেছ

উক্তদাদা—অনেকদিন থেকে আসব ভাবি, কিন্তু কেবল বাধা পড়ে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কাল আসতে দেয় না, ভাবে আমার হাতছাড়া হয়ে যাবে। এসেছ যেমন, এখন পরমপিতার পথে চললে ভয় নেই।

উক্তদাদা—এখন আপনার দয়াই সম্বল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরমপিতার দয়াতে আমরা কর্ম্মের ভিতর দিয়ে পাব। বাধাবিঘ্ন আসবেই, তা অতিক্রম করে এগোন লাগবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় গোলতাঁবুতে। প্যারীদা (নন্দী), হরিপদদা (সাহা), ভগীরথদা (সরকার), শচীনদা (ব্যানার্জ্জী), হরিদাসদা (সিংহ) প্রভৃতি এবং মায়েদের মধ্যে অনেকে কাছে আছেন।

সুশীলামা (বিশ্বাস) জিজ্ঞাসা করলেন—লোকে বলে ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্য করেন, সেটা কি ঠিক ? আমার এই ঘটনায় (পুত্র রুণুর মৃত্যুতে) কী মঙ্গল আছে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভগবান যা করেন তা মঙ্গলের জন্যই করেন। শয়তান যা করে তা মঙ্গলের জন্য নয়। জীবনীয় যা ভগবান তাই করেন। মৃত্যুপন্থী যা, শয়তানই তার পিছনে। তিনি জীবনস্বরূপ। তিনি জীবননাশের ব্যবস্থা করেন না। যে মৃত্যুস্বরূপ অর্থাৎ কাল বা শয়তান, সেইই মৃত্যু ঘটায়। আমরা যাকে সক্রিয়ভাবে বরণ ও আবাহন করি, তার কাছ থেকে যা প্রাপ্য তাই পাই। তাই ভগবানকে দায়ী করা বৃথা।

সুশীলামা—পট করে ঘটল কিভাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঘটল কি? ঘটালি। কথা শুনলি না।

সুশীলামা—যা বলেছিলেন, বুঝতে পারি নি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওর থেকে আর পরিষ্কার করে বলে কি করে? বললেও শুনতে না। তোমরা দোপাতে চল। নিজের বুদ্ধি ছাড় না, আবার আমার কাছেও জিজ্ঞাসা কর। আমার কথা শুনতে গিয়ে সামান্য অসুবিধা হলে দোষ চাপাও আমার উপর। তখন নিজেদের খেয়ালে চল। কিম্বা আমার কথামত চললেও ভিতরে আমার প্রতি বিরক্তিবোধ থাকে। তাতেও তোমাদের ক্ষতি। আমার লাভ নেই কোনটাতেই।

সুশীলামা—এখানে থাকলে কিছু হতো না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এখানে থাকা অবস্থায় কিছু হলে আমি আমার মত চেষ্টা করতে পারতাম। এখন আপশোষ বেশী হচ্ছে।

একটু চুপ করে থেকে শ্রীশ্রীঠাকুর আপনমনে বললেন—সাধনাকে শ্বশুরবাড়ী পাঠান ও শেষটা কলকাতায় নিয়ে যাওয়া আমার ইচ্ছা ছিল না। ভোটে হেরে গেলাম। ভেলকুকে শ্বশুরবাড়ী পাঠান আমার মত ছিল না। কিন্তু ভেলকুর মা বুঝল না। ভাবল—শ্বশুরবাড়ী থেকে কী মনে করবে। মাকে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করান আমার আদৌ মত ছিল না। কিন্তু মা কিছুতেই শুনলেন না। কোনক্ষেত্রেই আমি কিছু করতে পারলাম না।

সুশীলামা—যে চলে যায়, তার কষ্ট হয় না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কষ্ট হলেও আমাদের যেমন উপায় থাকে না, তারও তেমনি উপায় থাকে না। পরে ভুলে যায়।

সুশীলামা—এসব শ্রেণীর জন্ম হতে বোধহয় দেরী হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—জায়গা পেলেই জন্মায়।

সুশীলামা—জন্ম কেমন হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভালই হবে।

সুশীলামা—ভালবাসার জনের মধ্যে আসতে পারবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অন্তরে যারে চায়, সেখানে জায়গা যদি পায়, তাহলে ত আসতে পারে। Tuned (একতান) হওয়া চাই।

মায়া মাসিমা আসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন—প্রবৃত্তিবশ হলে পরে যমে তাড়না করে। তুমি আছ, আমি আছি। আমি ভেলকুকে পাঠাতে বারণ করলাম। তখন আমার কথা তোমার কাছে মুখ্য হলে ভেল্কুকে পাঠাতে না। আবার শ্বশুরবাড়ী থেকে যাতে না চটে বুদ্ধি করে সে ব্যবস্থাও করতে, সেইভাবে বুদ্ধি খাটাতে। প্রবৃত্তিই ঐভাবে তোমার বুদ্ধিকে পরিচালিত করল। জীবনকে সহায়তা না করে যমের সহায়তা করলে। আর এখানে মরলেও কাশীতে মরার মত হত। ইষ্টই ত তোমার বিশ্বনাথ। প্রমথদা গেল কষ্ট খুব আছে, আপশোষ নেই। সাধ্যমত যা করার ত্রুটি করিনি। অন্যত্র গেলে হয়ত একবার রক্ত ওঠাতেই টিকতে পারত না। মার খেয়াল হল গুণেন ডাক্তারের ওষুধ খাবেনই। গোকুল ডাক্তারকে এনে বসিয়ে রাখলাম। গুণেন ডাক্তারের ওষুধ ছাড়া খাবেন না, কেমন মন খারাপ করে বসে থাকলেন। শেষটা মা বললেন—'গুণেন! তুমিও পারলে না, আমিও পারলাম না।'

সুশীলামা—কী দেখে বোঝা যাবে একজনের মৃত্যুটা ভাল?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে যেমন জিনিষ স্মরণ করে যায়, তার তেমন পরিণতি হয়।

সুশীলামা—কেউ কেউ খুব কষ্ট পায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওদেখে ঠিক করা যায় না। একজনের হয়ত জীবনীশক্তি আছে, সে লড়াই করে। আর একজনের হয়ত তা নেই, তার মৃত্যু কম সময়ে সহজে হয়। এই যা।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এইসব কথা মনে হলে গোপালের কথা মনে হয়। গোপালের ধরাবাঁধা কথা ছিল অমুকদিন আসবে। রওনাও হলো সেইদিন। কিন্তু কলকাতায় গেল। আমার কাছ থেকে ও ঘুরেও যেতে পারত।......এইসব কথা মনে হয়, কিন্তু যে যায়, সে যায়।

সুশীলামা—আমি অরুণকে এত ভালবাসতাম, কিন্তু তবু ত সে চলে গেল।

মাসিমা—তুমি বলছ ভালবাস। আমার ক্ষেত্রে আমি দেখি ভালবাসি নি মোটে, ভালবাসলে রাখতে পারতাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার আত্মবিচার এসেছে। তুমি ভাগবত শুনেছ অতো। তোমার দৃষ্টি অনেকটা খুলে গেছে।

সুশীলামা—আমি ভালবাসতাম খুবই। কিন্তু ভাল করতে জানতাম না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভালবাসা মানেই ত ভাল করা। প্রবৃত্তিগ্রস্ত মন প্রবৃত্তির যোগান দিয়ে চলে। সত্তার যোগান দিতে সেই পারে যে অমৃত-আমন্ত্রণী ওযুধ জানে। ভগবান বুদ্ধ, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীরাম-কৃষ্ণদেব এঁরা সব সেই ওযুধ জানতেন। এঁরা খেলিয়ে খেলিয়ে মানুষের ভাল করতেন। এমনতর বেত্তাপুরুষের প্রতি একনিষ্ঠ অচ্যুত অনুরাগ ছাড়া আমাদের পথ নাই। আর তা ভাব বা চিন্তায় হলে হবে না। কার্য্যতঃ হওয়া চাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর মাসিমার দিকে চেয়ে গভীর আবেগে অন্তরঙ্গ সুরে বললেন—যাদের ভালবাসি, যাদের টানে আমরা থাকি, তারা যখন যায় আমাদের থাকাটাকেও আলগা করে দিয়ে যায়, থাকাটার কোন লালিত্য থাকে না।

সুশীলামা—এত কষ্ট লাগে। এই জীবনটাকে ভাল করা যায় কি করে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ একই পথ। একনিষ্ঠ অচ্যুত অনুরাগ মনপ্রাণকে যত অধিকার করে বসে, তত কষ্ট কমে।

মাসিমা—পরমপিতার দয়া এবং ভালবাসা পাওয়ার জন্যই কি পৃথিবীতে আসা? করাটা দেওয়াটা এজীবনে ত কিছুই নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বৈষ্ণবরা একে বলে লীলা। তুমি তাঁকে জড়িয়ে ধরবে। তিনি তোমাকে গ্রহণ করবেন।

মাসিমা—তাঁর ধরাতেই এত। আর আমি যদি ধরতাম, তা হলে ত কথা ছিল না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনি ধরলে আমি যদি ছুটে যেতে চাই, তাতেই কষ্ট হয়। আমি যদি ধরে থাকি, তাহলে আর কোন কষ্ট থাকে না।

মাসিমা—তাঁকে ছেড়ে যতই ছোটা যাক, তিনি কিন্তু পিছু পিছু ছোটেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ। তাঁকে পেয়ে, তাঁর প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়ে প্রবৃত্তির পেছনে ছুটি। আমাদের খেয়াল তাঁকে বরদাস্ত করতে পারে না। তাই তাঁকে ফেলে ছুটে পালাই। আবার তাঁর কাছে থেকেও কালের পেছনে ছুটি।

মাসিমা—তবু ত ক্ষমা আর দয়া। এই কি তাঁর বিচার! এতে কি আমাদের ভাল হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাঁর ত দয়া ও ক্ষমার অন্ত নাই। তিনি জানেন আমরা কিসের দরুণ কী করি। তাই তিনি আমাদের সব দোষ ত্রুটি উপেক্ষা করে আমাদের বাঁচাতে চেষ্টা করেন। তাঁর দয়া আমাদের কত-ভাবে রক্ষা করে। তিনি কষ্ট পান আমরা কষ্ট পাই বলে। প্রাণপণে চেষ্টা করেন যাতে আমরা কষ্ট না পাই। আমরা কষ্টে পড়লে, সে কষ্ট তাঁতেই পৌঁছায়। তিনি সচ্চিদানন্দঘন হয়ে আমাদের মধ্যে থাকতে চান। সৃষ্টির পিছনে এই তাঁর অভিপ্রায়। নিজেদের চিন্তা চলন আচার ব্যবহার দিয়ে তার ব্যাঘাত ব্যাহতি যতখানি ঘটাই ততখানি কষ্ট পাই আমরা। তার মানে অন্তর্নিহিত সচ্চিদানন্দ কষ্ট পান। সেইটে যাতে

না হয় আমাদের অস্তিত্ব যাতে অটুট থাকে তার জন্য তাঁর প্রাণপণ চেষ্টা।

একজন আর একজনের মাথায় বাড়ি দিয়ে প্রাণভয়ে দৌড়াচ্ছে। যার মাথায় বাড়ি পড়লো, সেও বাঁচাও বাঁচাও বলে ডাকছে। এখানে দুজনের জন্যই তাঁর কষ্ট। কষ্ট উভয়কে নিয়েই। এখানে যে মারে সেও আরাম পায় না, কারণ, তাকেও কালে পেয়েছে। অপরের সত্তাকে বিপন্ন করার দরুণ তার নিজের সত্তাও অজ্ঞাতসারে খিন্ন হয়ে ওঠে।

সুশীলামা—সৃষ্টি করে কি ভগবানের কষ্ট বাড়ে না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের প্রবৃত্তিগুলি তাঁর সেবার জন্য। তাদের সেভাবে নিয়োজিত না করলে আমাদেরও কষ্ট, তাই তাঁরও কষ্ট। সাধারণ একটা লোক তিনদিন আসল। তাকে ইচ্ছা করলে তিনদিনেই মদ ধরিয়ে দিতে পার। কিন্তু হয়ত তিনমাস ধরে ভালবেসে বুঝিয়ে বলছ—ভগবানের পথে চল, তাঁকে ভালবাস, তাঁর নাম কর, শান্তি পাও, তা সে ধরবে না। জীবনের পথে চলতে মানুষ এতই নারাজ।

মাসিমা—নিজের ভাল বোঝে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাল মানে বোঝে—প্রবৃত্তিফুল্ল হওয়া।

মাসিমা—ভোগের স্পৃহা থাকতে সৎপথে মন যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বেঁচে ত ভোগ। বাঁচাটা খরচ হয়ে গেলে ভোগ করবে কি? যারা বাঁচার তোয়াক্কা করে না, তারাই প্রবৃত্তির দাস হয়ে চলে। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় তাই বলেছেন—'ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্'। (হে সব্যসাচী! তুমি নিমিত্তমাত্র হও)।

আদৎ কথা তিনি আমাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠা পান না। দোপাতে থাকি। যতক্ষণ সব মনমত হয়, ততক্ষণ রাজী, যেই প্রবৃত্তির সঙ্গে বিরোধ বাধে অমনি বেঁকে বসি। আমরা ছেলেপেলেদেরও ঠিক ঠিক ভালবাসি না। বৃত্তি জড়ান থাকে। তাই তাদের সত্যিকার ভালটা বুঝি না। তারাও বৃত্তি অনুযায়ী চলতে চায়। আমরাও বৃত্তি-অনুযায়ী চালাতে চাই। এর ফলে সিদ্ধান্তটা নির্ভুল হয় না। তাই দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে যাই।

মাসিমা—আগেরও পাপ জমা হয়ে থাকে বোধহয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পাপ মানেই ত যা বাঁচাটার অপলাপ করে।

মাসিমা—বৃত্তিগুলির সার্থকতা কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বৃত্তিগুলি দিয়ে ভোগ করি, বাঁচার উপকরণ সংগ্রহ করি। কিন্তু বেশীরভাগ ক্ষেত্রে হয় উল্টো। ওরাই আমাদের খায়।

রেণুমা রান্নাঘর থেকে আসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্যে জিজ্ঞাসা করলেন—আজ রাত্রে কী আয়োজন ?

রেণুমা—পরটা, আলুর দম, বুটের ডাল, বেগুনভাজা, চাটনি আর রাজভোগ।

শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে বললেন—জবর ব্যবস্থা।

পূর্ব্বপ্রসঙ্গে মায়ামাসিমা জিজ্ঞাসা করলেন—বৃত্তিগুলি কিছুতেই ছাড়ে না বুঝি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ছাড়ে না কি ? ওগুলি ত বাঁচে না সত্তা ছাড়া। আমরাই ওদের কবলে পড়ে মরতে চাই। ওদের চালনা না করে ওদের দ্বারা চালিত হতে চাই। ওরা যে অবুঝ তা আর বুঝি না।

মাসিমা—আমার মনে হয়, যে ভালবাসে সে চলে গিয়েও আমাদের নানাভাবে দেয় বহুর ভিতর দিয়ে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কিন্তু লাখ পাওয়াও পাওয়া হয় না। সে যে বহুরূপে বহুর মধ্য দিয়ে ভগবানের দয়া ছিটিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে, তবু মন ভরে না। কাঙ্গালত্ব ঘোচে না। তাই জীবন্ত মানুষের দাম অতো। ওর কোন বিকল্প হয় না।

মাসিমা—উপায় !

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রফুল্লকে বললেন—প্রাণের ক্ষুধার ওযুধ বলে লেখাটা পড়ে শোনা ত।

পড়া হলো—

শ্রেয়ের প্রতি প্রীতি,
আত্মনিয়োগ

সেবা সংরক্ষণীচর্য্যা
এর ভিতর দিয়ে যে আগ্রহ উন্মাদনা আসে,
প্রাণের ক্ষুধার ওষুধই ওখানে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইষ্টকে যদি ভালবাসি, তখন নিজের সব দুঃখ ভুলে তাঁকেই আরো খুশী করতে চেষ্টা করি। বল দিতে চেষ্টা করি। কবীরসাহেবের দোঁহা আছে, কান্তিদা অনুবাদ করেছিল—

"বিরহেরই অগ্নি তাপে দ'গ্ধে মরে যারা
তাদেরই মন পূর্ণেতে রহে স্থির।"

১৫ই ফাল্গুন, রবিবার, ১৩৫৫ ( ইং ২৭।২।৪৯ )

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর বারান্দায়। অনিল গাঙ্গুলীদা, কাশী রায় চৌধুরীদা, হরিচরণ মজুমদারদা, সুরেন সেনদা, মাণিক মৈত্রদা প্রভৃতি উপস্থিত।

ধর্ম্মঘট করার প্রবণতা সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যখন তখন যেখানে সেখানে ধর্ম্মঘট করা ভাল না। যেখানে ধর্ম্মঘট করলে সবদিক সুচারু সুষ্ঠু হয়ে ওঠে, তেমনতর মৌলিক ব্যাপারের জন্য ধর্ম্মঘট করা ভাল। তাও লক্ষ্য রাখতে হয় যাতে লোকের কষ্ট অযথা না বাড়ে। Fundamental error (মৌলিক ভুল) থাকলেও প্রথমে চেষ্টা ক'রতে হয় যাতে অন্যভাবে তার নিরাকরণ হয়। তা' যেখানে না হয়, সেখানে অগত্যা ধর্ম্মঘট করা চলে। ওর নামই ধর্ম্মঘট অর্থাৎ বাঁচাবাড়ার জন্য ঘোট।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যাবেলায় গোলতাঁবুতে। প্যারীদা ( নন্দী ), কাশীদা ( রায় চৌধুরী ) প্রভৃতি এবং মায়েদের মধ্যে অনেকে কাছে আছেন।

কাশীদা—আপনার এত কথা শোনা সত্ত্বেও আমরা নিজেদের জীবনে তা' গ্রহণ করিনা কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Urge টা ( আকুতিটা ) বৃত্তিতে খেয়ে ফেলে। অনুরাগের প্রাখর্য্য যেমনতর, গ্রহণও তেমনতর করে। করতে করতেই হয়।

ভাললাগা এসে যায়। 'তেরা বনত বনত বনি যাই'। মানুষ হয় ভগবানের পথে যাবে, না হয়, প্রবৃত্তির পথে যাবে। মানুষের প্রকৃত মঙ্গল যাঁরা চান, মঙ্গলের পথ যাঁরা জানেন, তাঁরা যুগে যুগে ভগবানের কথাই বলেন, তাঁর দিকেই মানুষকে আকৃষ্ট করতে চেষ্টা করেন। এই-ই চিরন্তন পথ। পূর্ব্বের সবাই যে কথা বলেছেন, আমিও তাই বলছি। পরে যাঁরা আসবেন, তাঁরাও সেই কথা বলবেন। এ যেন বিজ্ঞান।

পরে পূজনীয় বড়দা আসলেন। ইষ্টকর্ম্ম সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ concentric (সুকেন্দ্রিক) না হওয়া পর্যন্ত তার চলা আরম্ভই হয় না। একটা normal (স্বাভাবিক) রকম থাকে, তাঁতে interest (অনুরাগ) থাকে, তাঁকে ছেড়ে থাকতে পারে না, সেটা ভাল লাগে না। এমনি ছোট ছোট tendency (প্রবণতা) থেকে শুরু হয়। ওইটে ধীরে ধীরে বেড়ে যায়।

বড়দা—করতে করতে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অভিপ্রায় থাকা চাই। যেমন অনেকে পূজাপান্নি ব্রত ট্রতও করে অথচ কিছুই হয় না। তার মানে সেই ভাব থেকেই করে না।

কাশীদা স্থানীয় কতিপয় বিশিষ্ট কর্ম্মীর অবাঞ্ছিত মনোভাব সম্বন্ধে উল্লেখ করে বললেন—তাদের নামও এখানে এতলোকের মধ্যে বলা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এত লোকের মধ্যেই বলা ঠিক। এরা বুঝতে পারে। মানুষ চুরি ডাকাতি ইত্যাদি কতরকম আকাম করে এসে আমার কাছে বলে, প্রাণ গেলেও তা আমার মুখ দিয়ে বেরোয় না। কিন্তু মানুষের গোড়ায় গলদ যেটা দেখি, সেটা তাকে এবং যার কাছে বললে তার প্রতিকার হয় সেখানে বলেই ফেলি। কারণ, ওটা maintained (পরিপোষিত) হলে, corrected (সংশোধিত) না হলে সে কিছুতেই দাঁড়াতে পারে না। মূলে খাঁকতি থাকলে কোন আশা থাকে না।

সেটা না শোধরালে অন্যেরও ক্ষতি। যা' আদত সম্বল তা' খোয়ালে চলবে কী নিয়ে ?

কাশীদা কয়েকজনের নাম বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাদের সামনেই যা বলার তা' বলা লাগে।

কাশীদা—বলতে গেলে তো গোলমাল বেধে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা যে বলতেই জানিনা, হয়তো অহং এ আঘাত করে বলি, ফলে মানুষ চটে যায়, corrected ( সংশোধিত ) হয় না। অপ্রিয় কথাও প্রিয় করে কওয়া যায়। কথারই মোড় ঘুরে যায় ভিতরের intention ( অভিপ্রায় ) দিয়ে। যাকে বলেছি, তার ভালই যদি আমার কাম্য হয়, কথাটাও বেরোয় তেমনি করে।

অন্যান্য কথাবার্ত্তা সুরু হল। শ্রীশ্রীঠাকুর কথাচ্ছলে বললেন—মানুষ বিশেষ বিশেষ প্রবৃত্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে থাকলে আমার কাছে এসে বেশী সময় টিকতে পারে না। কেমন জানি back করে (পিছন দিকে চলে)। সরে যেতে পারলে বাঁচে। দূরে-দূরে থাকতেই ভাল ভালবাসে। আবার এমন আছে যে খুন করে এসে স্বীকার করে ফেলল। তখন আর ওঠতে চায় না। হয়ত বলছি—'উঠবি না ? স্নান করবি না ? খাবি না ?' তবু উঠতে চায় না। বসেই থাকে। এ লক্ষণ বরং ভাল।

কিছুক্ষণ পরে পূজনীয়া ছোটমা শ্রীশ্রীঠাকুরকে চুপি চুপি কী যেন বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বহুনৈষ্ঠিক হওয়া ভাল নয়। তাতে জ্ঞানই ফোটে না। অভিজ্ঞতা ও জানাগুলি আলাদা আলাদা বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে।

রাত গোটা দশেকের সময় রত্নেশ্বরদা ( দাশশর্ম্মা ) আসলেন। ভৃগুর কোষ্ঠী সম্বন্ধে কথা উঠলো।

রত্নেশ্বরদা—সুশীলদার ( বসু ) কাছে শুনেছিলাম ভৃগুর কোষ্ঠী বোঝার কী যেন সঙ্কেত আছে। এমনি বোঝা যায় না। এমনি জ্যোতিষের এক একটা শ্লোক এমন পাই যে তার সঙ্গে একটু আধটু যোগ না দিলে মানে করা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐভাবে লেখা আছে, যাতে মানুষ ওনিয়ে বেশী করে ভাবে। তাতে সত্যটা unfold করে ( প্রকাশ পায় )। Underlying meaning ( অন্তর্নিহিত অর্থ ) ধরা পড়তে থাকে। Intuition ( অন্তর্দৃষ্টি ) ও inference ( অনুমান )-এর শক্তি বাড়ে। তাছাড়া যতদিক দিয়ে চিন্তা করে, ততরকমের তাৎপর্য্য দেখা দেয়।

রত্নেশ্বরদা—উল্টো ভাবতেও তো পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহলে তো মিলবে না। যেমন যে নম্বরের তালা সেই নম্বরের চাবি না হলে খোলে না।

রত্নেশ্বরদা—কোথাও গিয়ে যদি একটু ভাল করে শিখে আসতাম, ভাল হত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাতে সুবিধা হত না। এতখানি মাথা খুলত না, এতখানি বুঝতেনও না। আমি যদি কোন একটা মতবাদের মধ্যে গিয়ে পড়তাম, তবে এমন naked (খোলা) ভাবে জিনিষগুলি দিতে পারতাম না। পাতঞ্জলে আছে—'তস্মিন্ নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞত্ববীজম্'। সর্ব্বজ্ঞত্ব নয়, সর্ব্বজ্ঞত্ববীজম্—সর্ব্বজ্ঞত্বের বীজ আছে। তেমন যোগাযোগে fertilise করবে ( উদ্গত হবে )। আবার বলেছে--নিরতিশয়ম্ (আত্যন্তিক)। একেবারে positive ( ইতিবাচক ) কথা।

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর রত্নেশ্বরদাকে স্নেহল কণ্ঠে সহাস্যে বললেন—আপনার রকম বদলে গেছে, চলাচলতি, কায়দা বদলে গেছে। অন্যবার চুল কাটেন, এবারও চুল কেটেছেন। তারমধ্যে একটা স্বাতন্ত্র্য আছে।

রত্নেশ্বরদা—আমি ত কাটিনি, বা কিছু বলেও দিই নি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Impulse of a man impels people to do unto him accordingly ( কারও ভাবের দ্যোতনা মানুষকে তার প্রতি তেমনতর করতে চালিত করে )।

১৬ই ফাল্গুন, সোমবার, ১৩৫৫ ( ইং ২৮।২।৪৯ )

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর সামনের বারান্দায় বসে জনৈক দাদাকে বলছিলেন—তুমি যতই ভাল লেখ না কেন, তার effect ( ফল )

মানুষের মনের উপর গিয়ে কী দাঁড়াবে, সেটা বুঝে তেমনভাবে adjust ( বিন্যাস ) করে লিখতে হয়। তা না হলে একটা ভাল জিনিষ লিখে মন্দ ফল হয়ে যেতে পারে। লেখা, বলা সব ব্যাপারেই এটা খেয়াল রাখা দরকার। নচেৎ ক্ষতি হতে পারে।

পাশে ডাক্তার কালীদা ( সেন ), অরুণ জোয়ার্দ্দার প্রভৃতি ছিলেন। কালীদা বল্লেন—আপনার বিশ্বাস আপনি যা বলেন তাতে মানুষের কল্যাণ হবে। কিন্তু সবাই তা' স্বীকার নাও করতে পারে। নানা মত নানা দলের লোক ত থাকবেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কল্যাণ কেন হবে তা' আমার বলা আছে। একটা psychological ও scientific adjustment(মনোবিজ্ঞান ও বিজ্ঞান-সম্মত বিন্যাস ) আছে আমার মত করে। মোৎফরাক্কা কিছু বলিনি। কল্যানের একটা বিধি আছে। কল্যাণ পেতে গেলে তেমন করেই চলতে হয়। এটা বিজ্ঞান। কারও মতামতের উপর নির্ভর করে না।

কালীদা—বহু মত তো থাকতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—লাখো মত থাক। সবমতের মধ্যে একটা system ( বিধান ) আছে। Fact ( তথ্য ) বাদ দিয়ে চলা যায় না। তোমার যেমন নাক, কান, চোখ মুখ আছে। এটাকে কি অস্বীকার করার উপায় আছে ? যদি কেউ অস্বীকার করেও, থাকটা না থাকা হয়ে যাবে না। এটাকে বলা যায় divine law ( ভাগবত বিধান )। যেটার মধ্যেই থাক, এটা বাদ দিতে পারবে না। এটার অকাট্য প্রয়োজনীয়তা যদি তেমন করে দেখিয়ে দেওয়া যায়, কারও সঙ্গে বিরোধ থাকবে না।

কাশীদা—সংস্কার ও ধারণা বিভিন্ন রকমের তো থাকবেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যতরকমই হোক চোখ দেখেই, কান শোনেই। যদি এমন হয় যে চোখ শোনে, কান দেখে, তখন otherwise ( অন্যরকম ) হতে পারে।

কালীদা—সাধারণ মানুষ সূক্ষ্ম জিনিস বোঝে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সূক্ষ্ম জিনিস বোঝে না, মোদ্দা জিনিষ বোঝে ত ?

ঠাকুর রামকৃষ্ণ যে কথা বলে গেছেন, তুমি কি মনে কর, তার মধ্যে কোন সত্য না থাকলেও শুধু ভক্তদের প্রচারের জন্যই তা' দুনিয়ার লোকে গ্রহণ করেছে ?

কাশীদা—স্বামিজী প্রভৃতি প্রচার ত করেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Fact ( তথ্য ) না থাকলেও কি নিত ? আকাশ কুসুমের মত যদি কিছু বলতেন তবে কি মানুষ ধরত ? তাঁর সবকিছু বলা বাস্তব অনুভূতির উপর দাঁড়িয়ে।

কালীদা—অতটা সামঞ্জস্য করে ক'জন বলতে পারে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে যার মত পারে। যে যতটা তা' পারে, সেটাই ততখানি গ্রহণীয়।

কালীদা—তা' হলেও গণ্ডী ছাড়া উপায় নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার গণ্ডী তোমার মত, আমার গণ্ডী আমার মত। গণ্ডী থাকলেও universal fundamental truth ও fact ( সার্ব্বজনীন মৌলিক সত্য ও তথ্য ) না মেনে উপায় নেই।

এরপর কেষ্টদা ( ভট্টাচার্য্য ), যতীনদা ( দাস ) প্রভৃতি অনেকে আসলেন। কথা প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর যতীনদাকে জিজ্ঞাসা করলেন—নামটাম করছেন ত ?

যতীনদা—তেমন করা হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কিছুদিন জোর করে করেন। অবরোধটা ফেটে ফুটে যাক মুস্কিল হয়—কিছুদিন বাদ দিলে, পরে যেন পেরে ওঠা যায় না।

এরপর কেষ্টদা একটা বই থেকে পড়ে শোনালেন—হঠযোগ করে মার্কণ্ড যমকে বঞ্চনা করে সপ্তকল্পান্ত পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হঠযোগ করে অর্থাৎ সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক চিন্তা ত্যাগ করে। সঙ্কল্পবিকল্প মানে যা' ইষ্ট থেকে টেনে নেয়। Concentric ( সুকেন্দ্রিক ) থাকলে তা' পারে না। যতীনদা যদি যাজনের জন্য হোমিওপ্যাথি পড়ে, সেটা হবে concentric ( সুকেন্দ্রিক ), আর যদি টাকার জন্য পড়ে তবে সেটা হবে decentric ( বিকেন্দ্রিক )। গীতায়

শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—'সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ।' অর্থাৎ যথেচ্ছা-প্রণোদিত কর্ম্মেউৎসুক্য ও সম্বেগকে উপেক্ষা করে যে আমাকে ভজনা করে সেই আমার প্রিয়। সাধারণতঃ মানুষ প্রবৃত্তির খেয়ালে চলে। ভক্তি হলেই ঐ অভ্যাস যেতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর যতীনদাকে কিছুদিন নামধ্যান করে কেষ্টদার কাছ ভজন নিতে বললেন।

কেষ্টদা—এখানে ( যতি আশ্রমে ) না আসলে হবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আসা না আসা কি ? এখনই সুরু করে দিতে হয়।

'সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ।'

এরপর যোগ সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যোগের জন্য চাই আমার সামনে একজন উপলব্ধি-বান প্রাজ্ঞ মানুষ এবং তাঁর প্রতি আমার concentric ( সুকেন্দ্রিক ) টান। ঐ টান ঘনীভূত ও কেন্দ্রায়িত হতে হতে তার চরমে সমাধি হয়। কেন্দ্রায়িত টানটা ভূমায়িত হয়ে পড়ে। তখন মন আর বেয়াড়াপনা করে না। সর্ব্বতোভাবে গুরুমুখ—হয়ে যায়।

কেষ্টদা চণ্ডীদাসের টান সম্বন্ধে কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওখানে transference (স্থানান্তরকরণ)-এর ব্যাপার আছে। রামীর প্রতি টানটা দেবীর উপর গিয়ে পড়ল।

অরুণ (জোয়ার্দ্দার)—Sublimation ( ভূমায়িতি ) হলে কী হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Sublimation ( ভূমায়িতি ) মানে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে যাওয়া। গোপীরা গাছের সঙ্গেও কথা বলত। ভাবত তারাও বুঝি conscious ( সচেতন ), তারাও বুঝি কৃষ্ণে interested ( অন্তরাসী )।

পরে শ্রীশ্রীঠাকুর রহস্যচ্ছলে বললেন—অনেকে নিজেদের প্রবৃত্তির মতলব আমাকে দিয়ে sanction ( অনুমোদন ) করিয়ে নিতে চায়, কতরকম reason (যুক্তি) দেখিয়ে বলে। ভাবে আমি বুঝি বুঝি না কি জন্য কী বলছে। আমারও একেবারে না কওয়ার উপায় থাকে না। দেখি

খুব ঝোঁক। যতটা mould ( নিয়ন্ত্রিত ) করে, বলা যায় বলি, যাতে suffering ( দুর্ভোগ ) কম আসে।

এরপর কেষ্টদা কথাপ্রসঙ্গে থেকে শ্রীশ্রীঠাকুরের অনুভূতির বর্ণনা দীর্ঘসময় ধরে পড়ে শোনালেন। শুনতে শুনতে সবারই কেমন একটা অন্তর্মুখী আবেগ এসে গেল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—খুব টান না থাকলে অনেকসময় ঐ অবস্থায় merge করে ( নিমজ্জিত হয়ে ) যায়।

কিছু সময় চুপচাপ কাটলো তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর আপন মনে বললেন—মানুষের পণ্ডিতি করার প্রয়াস আছে, কিন্তু করেনা কিছু। তাই বইটেই লেখে বটে, কিন্তু কী বলতে কী কয়, তার ঠিক নেই। আত্মপ্রতিষ্ঠার বুদ্ধি নিয়ে চলে।

হোমিওপ্যাথিতে মানসিক লক্ষণের উপর কেন গুরুত্ব আরোপ করা হয় সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যখন শরীরের কোন অংশের কার্যকারিতা নষ্ট বা বিকৃত হয় তখন তা উপযুক্ত সাড়া দিতেও পারে না, নিতেও পারে না, সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ-তরঙ্গের মধ্যে একটা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়, সেটা শুধু সেখানেই সীমাবদ্ধ থাকে না, তদ্দরুন মানসিক রোগ-লক্ষণও দেখা দেয়। শরীর, প্রাণ, মন-এর যে কোন জায়গায় বিকার দেখা দিলেই তা দেখতে দেখতে এই তিনস্তরে ছড়িয়ে পড়ে। কোনটা আগে, কোনটা পরে, তা' অনেকসময় নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়ে। অনেক সময় রোগের বাহ্যিক লক্ষণ প্রকাশ পাবার আগেই মানসিক লক্ষণ হাজির হয়, যার দরুন সুস্থ অবস্থাটা ভাঙ্গতে সুরু করে। তখনই তার প্রতিকার করতে পারলে দৈহিক রোগের আক্রমণ অনেকখানি প্রতিহত হয়। তাই মানসিক লক্ষণের উপর জোর দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। অসুস্থতার বোধ যখন যে স্তরেই মানুষের হোক, তখনই তার প্রতিবিধান করতে পারলে, আমার মনে হয় রোগের বাড়াবাড়ি হতে পারে না। যাদের নাম-ধ্যান, আত্মবিচার, আত্মসংশোধন, সুনিয়ন্ত্রিত উপবাস, সৎচিন্তা, সৎকর্ম্ম, সদালোচনা, সদ্গ্রন্থপাঠ, সৎসঙ্গ, প্রসন্নতা, প্রফুল্লতা ও

পবিত্রতার অভ্যাস আছে, তারা অনেক সুস্থ থাকতে পারে। যারা খুব সুকেন্দ্রিক ও সচেতন তাঁরা রোগ সুরু হবার আগেই বুঝতে পেরে তা এড়িয়ে যেতে পারে। শুধু অসুখবিসুখে নয়, এইভাবে বহু বিপদ আপদ ও দুর্ঘটনা এড়িয়ে চলা যায়। যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি, করলে কাটে মহাভীতি—এ একেবারে নির্ঘাত সত্য। যে যত নিষ্ঠাসহকারে করে সে তত টের পায়।

কেস্টদা—সোরা, সাইকসিস, সিফিলিস—এই তিনটের মানে ত বুঝি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমিও ঠিক বুঝি না। বরং বায়ু, পিত্ত, কফ এই ধরনে বললে ভাল হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর একটু পরে রবি ব্যানার্জ্জীদাকে লক্ষ্য করে বললেন—আমি জানি রোগ আর লক্ষণ। লক্ষণে প্রকাশ রোগ। লক্ষণ দেখে বুঝব রোগ। ওষুধও দেব লক্ষণমত। তারমধ্যে ওগুলির প্রয়োজন কী? লক্ষণকে যখন বাদ দিতে পারি না, লক্ষণ যখন পথ, তখন ওগুলির সুবিধা কী? ওগুলি বাদ দিয়ে পারব না কেন? জিনিষটা সোজা হলে জটিলতার মধ্যে যাই কেন? ভেবে দেখ্।

রবিদা—যাঁরা এই সবের অবতারণা করেছেন, তাঁরা অনেক সুক্ষ্ম ও মৌলিক কথা বলেছেন। সেগুলিও ফেলবার নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রসঙ্গত বললেন—রোগনিরাময়ের ব্যাপারে রোগীর feeling (বোধ)টা বিশেষভাবে দেখা লাগে। Feeling (বোধ) normal (স্বাভাবিক) না হলে রোগ আছে বুঝতে হবে, যদিও স্পষ্টতঃ রোগের কোন লক্ষণ দেখা যায় না। স্বস্তিবোধ না হওয়াটাও একটা রোগলক্ষণ। ওটাকে উপেক্ষাও করতে নেই, প্রশ্রয়ও দিতে নেই। সুস্থ হয়ে ওঠার ব্যাপারে রোগীর ইচ্ছাশক্তি ও সক্রিয় সহযোগিতার একটা অবদান আছে। ডাক্তারের এমনতর হাবভাব, কথাবার্তা ও ব্যবহার রপ্তামাল করা লাগে, যাতে রোগীর মনে সুস্থ হওয়ার ইচ্ছা প্রবল হয়ে ওঠে। রোগীর খাদ্য, চিন্তা, সঙ্গ ও আচার ইত্যাদি রোগ নিরাময়ের সহায়ক হওয়া দরকার।

বিকালে হরেনদার ( বসু ) সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—প্রত্যেকটা মানুষ, প্রত্যেকটা পরিবার, প্রত্যেকটা সম্প্রদায় ও সমাজ বৈশিষ্ট্যানুগ পারস্পরিক পরিপূরণী সহয়োগিতার সঙ্গে পরস্পর স্বার্থান্বিত হয়ে একই আদর্শকে সেবা করার ভিতর দিয়ে ব্যষ্টি ও সমষ্টির বিহিতভাবে সম্বর্দ্ধিত হওয়াটাই ভারতীয় সমাজতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য। সবারই বৈশিষ্ট্যপালী সর্ব্বপূরণী আদর্শ যিনি, তিনিই হলেন সবার স্বার্থকেন্দ্র। তিনি যেন State ( রাষ্ট্র )-এর stay ( স্থিতি )। এমনতর আদর্শের সঙ্গে সংযোগ ঠিক থাকলে সবার অভ্যুদয় অবধারিত। কম্যুনিজম্ বলতে আমি এমনতর রাষ্ট্রব্যবস্থাকে বুঝি। এতে প্রত্যেকের বাঁচা-বাড়া, আত্মবিকাশ ও ঈশ্বরলাভের পথ সুগম হয়। বর্ণাশ্রমের বিধান যে কী অপূর্ব্ব জিনিষ তা বলে শেষ করা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় গোলতাঁবুতে অর্দ্ধশায়িত। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), বীরেনদা ( মিত্র ), পণ্ডিতভাই ( ভট্টাচার্য্য ) প্রভৃতি তাঁবুর মধ্যে আছেন এবং বাইরে অনেকে দাঁড়িয়ে আছেন।

কর্ম্মী কেমন হওয়া উচিত সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সত্যিকার বামুন-কায়েতী বুদ্ধি অর্থাৎ simple ( সরল ) অথচ tactful ( কৌশলী ) না হলে কর্ম্মী হয় না।

একটু পরে পূজনীয় বড়দা এসে বসলেন। কথা প্রসঙ্গে নাড়ী দেখা সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তিনটে আঙ্গুল দিয়ে সমান চাপ দিয়ে ধরলে, যেটা প্রবল সেইটেই বেশী টোকা দিতে থাকে। বায়ু অর্থাৎ স্নায়ুতে গোল থাকলে সেইটের স্পন্দন বেশী হয়। পিত্তে অর্থাৎ মূলতঃ লিভারে ( যকৃতে ) গোলমাল থাকলে মাঝেরটায় টোকা বেশী দেবে। কফ বেশী থাকলে আর দুটো ছাপিয়ে সেইটে প্রবল হবে। এর আবার নানারকমারি অবস্থান ও সমাবেশ আছে। তাই দিয়ে determine ( নির্দ্ধারণ ) করা যায়, কার ধাত কিরকম।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা সম্পর্কে আলোচনা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর

উঠে বসে বললেন—অনেক সময় যে অসুখ সেরেও আবার হয়, সেই দরুন আবার ওষুধ দিতে হয়। তার কারণ রোগে যে disturbance (গোলমাল) নিয়ে এসেছিল, তার জন্য যে maladjustment (অব্যবস্থা) হয়েছিল, তার কিছুটা থেকে যায়। যেমন একটা ঘা শুকিয়ে গেলে তার দাগ থাকে। তখন একটা alterative medicine (পরিবর্ত্তক ওষুধ) যেমন আইওডিন দিয়ে সেই দাগটা দূর করা হয়। আবার যে ওষুধ দিয়ে সারল মনে হয়, সে ওষুধ সব সময় ঠিকমত গভীরে যেয়ে নির্ব্বাচন করা হয় না। জিনিষটা ধরায় ভুল হয়। জায়গামত হাত পড়ে না, তাই আবার রোগ দেখা দেয়।

কেষ্টদা—Potentisation (শক্তিকৃতকরণ) মানে কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Potentisation (শক্তিকৃতকরণ) মানে active dose-এ (সক্রিয় মাত্রায়) পরিণত করা। হোমিওপ্যাথি হল theraphy of doses (মাত্রাসমন্বিত চিকিৎসা)।

কপাল সম্পর্কে কথা ওঠায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—Brain impression (মস্তিষ্ক লেখন) কে কপাল বলা যায়। মস্তিষ্ক লেখাই মানুষের চলনাকে নিয়ন্ত্রিত করে তার ভাগ্য সৃষ্টি করে।

১৭ই ফাল্গুন, মঙ্গলবার, ১৩৫৫ (ইং ১।৩।৪৯)

বেলা আটটার পর শ্রীশ্রীঠাকুর গোলতাঁবুতে এসে বসেছেন। গাছে গাছে নতুন পত্রপল্লবের সমারোহ। আকাশে বাতাসে, সূর্য্যকিরণে, আমের মঞ্জরীতে, পাখীর কূজনে, মধুমক্ষিকার গুঞ্জনে বসন্ত সমাগম বিঘোষিত। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), বীরেনদা (মিত্র), উমাদা (বাগচী), কান্তিদা (বিশ্বাস) প্রভৃতি তাঁর স্নেহসরস আনন্দমধুর সান্নিধ্যে পরম পুলকিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্যে বললেন—বীরেন যদি শাশ্বতী, সপ্তিতীর বাণীগুলি মাথায় ও চরিত্রে গেঁথে ফেলে, আর ওর সঙ্গে উমা, গোপেন এরা কয়েকজনে মিলে যদি visitor-দের (দর্শকদের) attend

( দেখাশোনা ) করে, ভাল করে গল্পটল্প করে, ভাল হয়। Defect (ত্রুটি) গুলি সেরে ফেলতে হয়, আর অভ্যাস ইত্যাদি ঠিক করতে হয়। বীরেন একাজ পারবেও ভাল।

বীরেনদা ( মিত্র )—আমার ঘুরেটুরে বেড়াতে বেশ ভাল লাগে।

কেষ্টদা—ভাল লাগাটা যদি কারও জন্য না হয়, তবে কাজ হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কারও জন্য করতে করতে আবার সেটাই স্বভাব হয়ে দাঁড়ায়।

যতীনদা ( দাস ) আসতেই শ্রীশ্রীঠাকুর পরম উৎসাহ সহকারে হোমিওপ্যাথি প্রসঙ্গে আলোচনা সুরু করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—একটা কথা মনে রাখা দরকার—ওষুধ দেওয়া চাই similar ( তৎসদৃশ ), same ( তা ) নয়। পেটের ব্যথা দেখে যে আমি ভাটির পাতা দিয়েছিলাম, ভাটির পাতা খেয়ে যদি ঐরকম হত, সেখানে ভাটির পাতা দিলে কাজ হত না। সেখানে same ( তা ) হত। আর একটা কথা। সব aggravation ( বাড়া ) সারার দিকে নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে রোগ বেড়েই চলে। কোন্ বাড়াটা সারার দিকে, আর কোন্‌টা রোগেরই বৃদ্ধি তা বোঝা চাই। আর দেখতে হবে aggravation-এ ( বাড়ায় ) রোগীর system ( শরীর বিধান ) যেন ছিঁড়ে না যায়। হোমিওপ্যাথরা এলোপ্যাথদের মত রোগজীবাণুগুলিকে সরাসরি মারতে চায় না। কিন্তু প্রতিরোধশক্তি বাড়িয়ে দেয়, যার ফলে, হয় সেগুলি শরীর থেকে বেরিয়ে যায়, নয় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

জনৈক দাদা আজ কদিন থেকেই শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে বারবার তার নানা সমস্যার কথা বলছিলেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরও তাকে যা করণীয় সে সম্বন্ধে বারবার বলছিলেন। তৎসত্ত্বেও দাদাটি আজও সেই একই কথা জিজ্ঞাসা করায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার মনে হয় আমার কথাগুলি তোমার মাথায় ধরে নি। আমি যা' বলেছি তা তুমি করবে না এবং suffer করবে (কষ্ট পাবে)। আবার বলি, নামধ্যান ঠিকমত কর। কাউকে ফাঁকি দিও না। ভাল ব্যবহার কর। যাতে মানুষের তোমার

প্রতি শ্রদ্ধা হয়, তেমন করে চল। তাহলে পেরে যাবে। মানুষ পড়ার সময় তাড়াতাড়ি পড়ে। উঠতে দেরী লাগে। মানুষের দুর্দ্দশা যে তৎক্ষণাৎ দূর হয়, তা ত না। স্বভাব না বদলালে, কেউ টাকা দিলে, কিম্বা কিছু করলে তাতে দুর্দ্দশা ঘোচে না। চলন চরিত্র ঠিক করলে ধীরে ধীরে অবস্থারও পরিবর্ত্তন হয়। চল, কর, তবে ত হবে?

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কোন রোগী আসলে রোগের বৈশিষ্ট্য এবং রোগীর বৈধানিক বৈশিষ্ট্যগুলি দেখতে হয়, দুইদিক দিয়েই খাটে এমনতর একটা ওষুধ যদি পাওয়া যায়, তাহলে ত ভালই। সেই ওষুধই দিতে হয়। তা' যদি না পাওয়া যায় তবে প্রথমটা রোগের বৈশিষ্ট্যমত ওষুধ দেওয়া ভাল, তাতে ফল না পেলে রোগীর বৈধানিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ওষুধ দিতে হয়। Anatomy (শারীরস্থান) ভাল করে জানতে হয়।

প্রসঙ্গতঃ আর একটা কথা বলি। লাল, নীল, হলদে, বেগুনী, সবুজ, কালো ইত্যাদি নানা রঙের শিশির মধ্যে জল দিয়ে সেই শিশিগুলি রোদে রেখে দিতে হয়। পরে ভাল করে নাড়িয়ে সেই জল খাইয়ে বিভিন্ন রকমের অসুখ সারান যেতে পারে। একে বলা হয় ক্রমোপ্যাথি। কোন্ রোগে কোন্ রংয়ের শিশির জল উপকারী বাস্তবে পরীক্ষা করে দেখতে হয়। এ সম্বন্ধে গবেষণা করে দেখা যেতে পারে। সূর্য্যই বিশ্ব-প্রাণের উৎস। সূর্য্যকিরণের মধ্যে রয়ে গেছে সাতটা রংয়ের সমাবেশ। প্রত্যেকটা রংয়েরই অবদান আছে প্রাণীর দেহে। কোন্‌টার কী বিশিষ্ট কাজ সে সম্বন্ধে ভাবা ও পরীক্ষা করে দেখা ভাল। যে কোন মতই চিকিৎসা করা যাক, জিনিষটা এমনভাবে আয়ত্ত করতে হয়, যাতে রোগীই যেন বলে দেয় সে কী ওষুধ চায়। চিকিৎসকের nervous system (স্নায়ু বিধান) খুব তুখোড় হওয়া চাই, যাতে রোগীকে দেখামাত্র সে বোধ করতে পারে তার ভিতর ও বাইরের অবস্থাটা কী।

বিভিন্ন প্রকারের অজীর্ণ প্রসঙ্গে কথা উঠলো। সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—শালপানি, গনিয়ারী, কুলেখাড়া, ভৃঙ্গরাজ, কালমেঘ,

গুলঞ্চ, কুরচি ও হরিদ্রা প্রত্যেকটি এক সিকিমাত্রা নিয়ে আধসের জলে সিদ্ধ করে আধপোয়া থাকতে নামাতে হবে। এই পাচন ঈষদুষ্ণ অবস্থায় সেবন করা বিধি। ধারাবাহিকভাবে বেশ কিছুদিন এটা খেলে ভিতর থেকে অজীর্ণ রোগের প্রতিকার হতে পারে। অবশ্য কোন ওষুধই সবার ক্ষেত্রে সমভাবে উপযোগী হয় কমই।

আজ বিকালে প্রফুল্লদা (চ্যাটার্জ্জী) শ্রীশ্রীঠাকুরকে এসে জানালেন—খগেনদা ( তপাদার ) সারাদিন না খেয়ে আছেন এবং বাড়ীর লোকের সঙ্গেও দুর্ব্যবহার করেছেন। তিনি এর কারণস্বরূপ যা' জানান, তাতে আরো কয়েকজন জড়িত হয়ে পড়েন। শ্রীশ্রীঠাকুর সংশ্লিষ্ট সবাইকে ডেকে শুনে মিলে খগেনদার রাগ ও দুঃখের বাস্তব কারণ সম্বন্ধে সঠিক তথ্য অবগত হন। প্রকৃতপক্ষে বাস্তব ব্যাপার যা এবং প্রফুল্লদা সে সম্বন্ধে যা বলেন—দুইয়ের মধ্যে অনেক ফারাক।

শ্রীশ্রীঠাকুর তখন প্রফুল্লদাকে বললেন—তোমার কথা শুনেই যদি আমি কোন প্রতিবিধান করতে যেতাম, এত ডাকাডাকি করে সব না শুনতাম, তাহলে কি রকম অবস্থা দাঁড়াতো? একটা ব্যাপার সঠিক নির্দ্ধারণ না করে অমনি আমার কাছে এসে যা তা জানালে। ওর কাছে তুমি সরাসরি জিজ্ঞাসা করতে পারতে। তুমিই নিজেই শুনেমিলে adjust ( নিয়ন্ত্রণ ) করতে পারতে। তোমরা ঋত্বিক মানুষ। মানুষ নিয়ে তোমাদের কারবার। তোমাদের এমনতর অভ্যাস ভাল না, যাতে জটিলতা, মনোমালিন্য, ভুল বোঝাবুঝি, বিরোধ ও অশান্তি বেড়ে যায়, তার নিরসন হয় যাতে, তাইই তোমাদের করা লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর খগেনদাকেও তার অন্যায়ের জন্য ভৎ'সনা করলেন এবং তখনই গিয়ে খেতে বললেন।

খগেনদা—একজন আমার কাছে কিছু টাকা পাবে। সে টাকা না দিয়ে খাব না প্রতিজ্ঞা করেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর অপ্রসন্নভাবে বললেন—আমি তোমাকে বলছি, তার থেকে তোমার খেয়ালী প্রতিজ্ঞা বড় যদি হয়, তাইই কর, খেয়ো না।

আপনি যখন বলছেন, তখন খাব। এই বলে খগেনদা খেতে গেলেন্।

২০শে ফাল্গুন, শুক্রবার, ১৩৫৫ ( ইং ৪।৩।৪৯ )

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে আশ্রম প্রাঙ্গণে তাঁবুর পাশে একখানি চেয়ারে বসে আছেন। কেস্টদা ( ভট্টাচার্য্য ), শ্রীশদা ( রায় চৌধুরী ), কান্তিদা ( বিশ্বাস ), বীরেনদা ( মিত্র ) প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত। তিনি প্রীতমনে সবার সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন। কথার পর কথা উঠছে।

কান্তিদা—হরিনাম কোন্ সময় থেকে আসলো? হরিনামের মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কথাটা হলো হরির নাম। যিনি আমাদের ত্রিতাপ-জ্বালা হরণ করেন, মনের ইন্দ্রিয়মুখী, প্রবৃত্তিমুখীভাব হরণ করেন তিনিই হরি। সব মহাপুরুষই সেদিক থেকে হরি। হরিনাম কথাটা গৌরাঙ্গ-দেবের সময়ে বোধহয় প্রথম আসে।

কেস্টদা—রামনাম সত্য—এ-কথার মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয় রং বীজের সঙ্গে রামনামের সম্পর্ক আছে। রাম নাম সত্য মানে রাম নামে সত্যের ভাব অর্থাৎ সত্তার ভাব আছে। এই নামের অনুশীলনে সত্তা পুষ্ট হয়, সমৃদ্ধ হয়।

অনুভূতি সম্পর্কে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—দশম্ দ্বারের পরে সোহং পুরুষের বোধ হয়। সোহং পুরুষের স্তরে যখন মন ওঠে তখন নিজের সত্তা সব কিছুর সঙ্গে identified ( একীভূত ) হয়ে যায়। তার পর আসে সত্যলোক। এখানে সত্তার অসাধারণ জ্যোতির্ম্ময় প্রকাশ অনুভব করা যায়। তা ভেদ করে যেতে হয় অলখ লোক, অগম লোক, অনামী লোকে। এগুলি যেন causal mechanism ( কারণীভূত মরকোচ )-এর plane ( স্তর )।

এরপর সুরেনদা ( বিশ্বাস ), যতীনদা ( দাস ) ও প্রকাশদা ( বসু ) আসলেন।

ভজন সম্বন্ধে কথা ওঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বামদিক থেকে যে শব্দ আসে তা প্রবৃত্তির এলাকার। ওদিকে বিশেষ নজর দিতে নেই। ডানদিকের শব্দে মনোযোগ দিলে ভাল হয়। ওটা ঊর্দ্ধদিকে নিয়ে যায়। বামদিকের শব্দে নজর দিলে বহির্ম্মুখী এলোমেলো কর্ম্মচাঞ্চল্য বেড়ে যায়। কালের রাজত্বে ঘোরা হয়। উপরের দিকে উঠতে থাকলে পট করে ছেড়ে দিতে নেই। ক্রমাগত চালিয়ে যেতে হয়। তখন ঐ ঊর্দ্ধমুখী টান যেন পেয়ে বসে। সেই তালে পড়ে অনেক এগিয়ে যাওয়া যায়। মাঝে মাঝে নীরস লাগে। বিশেষ কিছু আসে না। তবু অভ্যাস ছাড়তে নেই। ওঠা-নামা আছেই। কিন্তু নিষ্ঠাসহকারে লেগে থাকতে হয়। সদগুরু হলেন খুঁটি। তাঁতে well-adhered (সুসংসক্ত) না হলে ভেঙ্গে যায়। উপনয়নের ঘরে ব্রহ্মচারীদের হাতে যেমন একখানা লাঠি দেয়। লাঠি ছাড়া চলতে নেই। সর্ব্বদা সঙ্গে করে রাখতে হয় ঐ লাঠি। জীবনের পথে চলতে সদগুরু হলেন ঐ লাঠি। ঐ লাঠি হাতে না থাকলে বৃত্তিগুলি কখন যে কী করে বসে তার ঠিক নেই। বৃত্তিগুলি না থাকলে মানুষ হয়ে দাঁড়ায় subman (অপমানুষ), আর বৃত্তিগুলি প্রবল হলে মানুষ হয় disintegrated (বিশ্লিষ্ট, বিভক্ত)। মানুষের দরকার adjusted (নিয়ন্ত্রিত) হওয়া, কিন্তু তা হতে পারে না, যদি কঞ্চুষের মত ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠাপন্ন হওয়ার বুদ্ধি না থাকে। আমার জীবনে যা কিছু হয়েছে তা মাকে খুশী করবার তীব্র নেশা থেকেই হয়েছে। ঐইই সম্বল।

কেষ্টদা—অনুভূতি সম্পার্কে বলতে গিয়ে যেখানে ইষ্টের বর্ণনা দিয়েছেন, সেটার তাৎপর্য্য কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হুজুর মহারাজকে আমি ছেলেবেলা থেকে ঐভাবে ভাবতাম। কোন্ সময় থেকে যে হুজুর মহারাজের ছাপ আমার মাথায় পড়েছে, আমি নিজে ঠিক জানি না। পৈতার পর হুজুর মহারাজ এসে স্বপ্নে ভজন দিয়ে গেলেন। সরকার সাহেবের দর্শন যখনই পেয়েছি, সে সঙ্গে হুজুর মহারাজ থাকতেনই। ন্যাংটো অবস্থায় বিষ্ণুর আবির্ভাব

হলো। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। আমি আর সুরেন সান্যাল একসঙ্গে শুয়েছিলাম। অন্ধকার রাত। তখনও ঘুম আসেনি। হঠাৎ বিষ্ণুমূর্তির আবির্ভাবে তাঁর রূপের আলোয় ঘর আলোময় হয়ে গেল। বারবার দেখলাম সেই অপরূপ মোহন মূর্তি। কানের কুণ্ডলটা নড়ছে, সেটা এখনও চোখে ভাসে। বারবার বললাম তুমি যদি সত্য হও একবার হাত নাড়। তখন হাত নাড়লেন। জাগ্রত, জীবন্ত মূর্ত্তি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। দর্শন, শ্রবণ, অনুভূতি যেগুলি হয়েছে, সেগুলি যোলআনা বাস্তব, কল্পনার বিন্দুবিসর্গ নেই তার মধ্যে। আমি ত বইটই পড়ি নি। তবে Science ( বিজ্ঞান ) ও অন্যান্য বিষয়ে যা কিছু বলেছি বা বলি তা ঐ সব প্রত্যক্ষ অনুভবের দাঁড়ায় দাঁড়িয়ে।

পরে, তখন পূজনীয় বাদলদা ও বড়দা প্রভৃতি ছিলেন। হাউজারম্যানদা ও হেনরী ইত্যাদি আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Physicist ( পদার্থবিদ ), Chemist ( রসায়নশাস্ত্র বিদ ), ডাক্তার ইত্যাদির জন্য লিখেছ?

হাউজারম্যানদা—হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সবরকমের মানুষ আমাদের মধ্যে থাকলে আমরা self-sufficient family ( স্বয়ং-সম্পূর্ণ পরিবার ) হতে পারি।

অদূরে একদল পাখী কিচিরমিচির করছিল।

হাউজারম্যানদা—ওগুলি কী পাখী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের দেশে ওকে বলে শালিক। ওদের কথা বলতে শেখালে কথা বলতে পারে। ও ময়নারই একটা variety ( রকমারি ), organic adjustment ( বৈধানিক সমাবেশ ) প্রায় এক। Group ( শ্রেণী ) এর মধ্যে কিছুটা আলাদা থাকে, তার দরুন, variety ( রকমারি ) হয়। যেমন কাঞ্চন ফুল লালও হয়, সাদাও হয়। Organic adjustmant-এ ( বৈধানিক সমাবেশে ) একটু difference ( পার্থক্য ) থাকায় এই variation ( পার্থক্য ) হয়। একেই বলে বর্ণ।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যার পর মাঠে ইজিচেয়ারে বসে তামাক খাচ্ছিলেন।

বেশী গরমও না, ঠাণ্ডাও না, চমৎকার আবহাওয়া। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), সুশীলদা ( বসু ), শ্রীশদা ( রায় চৌধুরী ), হাউজারম্যানদা, বিজয়দা ( মজুমদার ) প্রভৃতি উপস্থিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর নিজে থেকে বললেন—মানুষের জীবনের basic (মূল) জিনিষ হলো প্রেষ্ঠে সুকেন্দ্রিক হওয়া। যারা সুকেন্দ্রিক হতে পারে না, তাদের ভাব বোধ, জ্ঞান বা জানাগুলি ভূমায়িত হ'তে পারে না। সুকেন্দ্রিক হওয়াটা কতকগুলি করণীয়ের মধ্য দিয়ে হলে সেটা স্থায়ী হয়। ঐ করাগুলিই হলো আচরণীয় নীতি। যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি পালন করে চলতে অভ্যস্ত হলে সুকেন্দ্রিকতা স্বতঃ হয়ে ওঠে। ওর ভিতর দিয়েই জীবন সার্থক হয়ে ওঠে। মানুষের চরম সার্থকতা কী তা' মানুষ বোঝে না। রামকৃষ্ণঠাকুরের কাছে কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করত জীবনের উদ্দেশ্য কী? তিনি বলে গেছেন—ঈশ্বরলাভই মানবজীবনের উদ্দেশ্য। এই মূল কথাটা সম্বন্ধে বোধ আসলে হয়ে গেল।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন, হওয়ার মধ্যে পাওয়া থাকে।

প্রফুল্ল—যারা বৃত্তিকেন্দ্রিক হয়, তারা কি ভূমায়িত হতে পারে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা হয় কি করে? ওতে মানুষ আত্মকেন্দ্রিক হয়। সে দুনিয়ায় নিজের জালে জড়িয়ে ঘুরপাক খায়। সে ভূমায়িত হলে হয়ত পাকা চোরা কারবারী হয়। সবার স্বার্থে স্বার্থান্বিত হওয়া, তার জীবনে আর ঘটে ওঠে না। যে যেখানে আত্মদান করে, তার পরিণতিও হয় তেমনতর।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে গোলতাঁবুতে বসে একটা বাণী দিলেন যার প্রথম লাইনে ছিল—যাদের গুণের আবরণে দোষ থাকে, সেই প্রসঙ্গে মেণ্টুভাই জিজ্ঞাসা করলেন—গুণের আবরণে দোষ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেমন তুমি হয়ত বিড়ি খাওনা, সিগারেট খাওনা, মিঠে মিঠে কথা বল, মানুষকে service ( সেবা ) দাও, কিন্তু ভিতরে হয়ত আছে অন্য বুদ্ধি।

মেণ্টু—ধরা যায় কিভাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—জহুরী হলে বোঝা যায়। Intention ( অভিপ্রায় )

দেখে ধরা যায়। সব কাজের মধ্যে ঐ intention ( অভিপ্রায় ) থাকে। দোষ মানে কিন্তু এখানে দোষপ্রাণতা, দুষ্টবুদ্ধি, দোষপ্রিয়তা। বদ-মতলব ভিতরে পেয়ে বসে থাকে। পরিস্থিতির চাপে পড়ে বা সাময়িক প্রবৃত্তির বশে কোন ভুল করল—এমনতর নয়। এরা যত ক্ষতি করে, চোর, গুণ্ডা, বদমায়েস অত ক্ষতি করতে পারে না।

কিছু সময় চুপচাপ কাটল। তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ বললেন—ভগবানের দয়ায় পড়ার সময় ছোটবেলায় গোপাল লাহিড়ীর মুখ দিয়ে 'Do unto others as you would be done by'—কথাটা বেরিয়ে যাওয়ায় আমি একটা পথ পেয়ে গেলাম। আমার মাথায় একটা দ্বন্দ্ব ছিল—কোন্‌টা পাপ, কোন্‌টা পুণ্য, কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ, বুঝব কিভাবে? যেটা এক সময়ে এক ক্ষেত্রে ভাল, তাইই অন্যসময়ে অন্যক্ষেত্রে মন্দ—সুতরাং কোথায় কী করণীয় তা বুঝব কি করে? তখন ঐ কথাটা পেয়ে আমার মাথায় ঢুকে গেল। যেন একটা সমাধান পেলাম। যে বইটায় ছিল সে বইটার নাম এখন আমার মনে নেই। বহুদিন মনে করে রেখেছিলাম।·········সবকিছুই নিজের পরে ফেলে দেখলে ঠিক ঠিক বোঝা যায়, এইটেই জীবনচলনার পথে বাস্তব কথা।

২১শে ফাল্গুন, শনিবার, ১৩৫৫ ( ইং ৫।৩।৪৯ )

বেলা গোটা দশেকের সময় শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁবুর পাশে প্রাঙ্গণে চেয়ারে বসে সবার সঙ্গে হাসিমুখে কথাবার্তা বলছেন। উমাদা (বাগচী), কাশীদা ( রায় চৌধুরী ), মহিমদা ( দে ), হরেনদা ( বসু ), ভগীরথদা ( সরকার ) প্রভৃতি কাছে আছেন।

কথা প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ভগবান মানেই ভগ অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, জ্ঞান, যশ, শ্রী, বৈরাগ্য,—এই ষড়ৈশ্বর্য্য যাঁর আছে এমন মানুষ। ভগবানে আত্মা আছেন। ব্রহ্ম আছেন। কিন্তু নিরাকার আত্মা বা ব্রহ্ম ও ভগবান এক কথা নয়। আত্মাকে উপলব্ধি করেছেন, ব্রহ্মকে সাক্ষাৎকার করেছেন যিনি, তাঁকে কই ভগবান। ভগবান আত্মা

বা ব্রহ্মেই বিরাজ করেন, তাঁতেই বসবাস করেন, থাকেন, কিন্তু আত্মা বা ব্রহ্ম নৈর্ব্যক্তিক। ভগবান কিন্তু ব্যক্তি। তাই বলি, ভগবান বশিষ্ট, ভগবান মনু, ভগবান রামচন্দ্র ইত্যাদি। এদের ভিতর দিয়েই আমরা দেহধারী মানুষ আত্মা বা ব্রহ্মকে পাই।

"ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেম্ববস্থিতঃ॥"

(আমি ইন্দ্রিয়ের অগোচর ও অব্যক্তমূর্তি, আমার দ্বারা এই সমগ্র বিশ্ব পরিব্যাপ্ত। সমস্ত ভূত আমাতে অবস্থিত, কিন্তু আমি তৎসমুদয়ে অবস্থিত নহি)।

আত্মা বা ব্রহ্মের নিরপেক্ষ অস্তিত্ব আছে, কিন্তু জগতের কোন বস্তুরই স্বাধীন সত্তা নেই। জলকে আশ্রয় করেই নৌকো থাকে ও চলে, আবার নৌকোর মধ্যেও জল থাকে, কিন্তু নৌকো জলের অপরিহার্য্য আশ্রয় নয়।

উমাদা—গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—আমার আত্মা ভূতগণের ধারক ও উৎপাদক। কিন্তু তাদিগেতে অবস্থিত নয়। এ কথার মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর মুখে হাত দিয়ে—ধর আমার এই গোঁফ, গোঁফ ত আমি নেই। আমার মুখ, মুখ ত আমি নেই। আমার হাত বা পায়ে আমি complete (সম্পূর্ণ) হয়ে নেই।

কাশীদা—'ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি' মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মেরই সাকার মূর্ত্তি। নিরাকার ব্রহ্মকে পেতে গেলে তাঁকে আশ্রয় করেই পেতে হয়।

কাশীদা—তিনিই কি সেই?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনি তৎ-সংস্থ। তবে ব্রহ্ম ওখানেই শেষ হয়ে গেলেন না। ব্রহ্মবিৎ হলেন —way to Brahma (ব্রহ্ম পাওয়ার পথ)। নীহার কণার প্রতিফলনের মধ্য দিয়ে সূর্য্য দেখি। সূর্য্য কিন্তু ওখানেই finished (নিঃশেষ) হয়ে যাচ্ছে না।

হরেনদা—মানুষ বলে কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মন আছে তাই বলে মানুষ। কিন্তু মনটাই মানুষটা নয়।

কথা প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—পুরুষ প্রকৃতির মধ্য দিয়ে বহুতে সৃষ্ট হয়েও তাইই থাকে।

প্রফুল্ল—'স্ব-অয়নস্যূত বৃত্ত্যভিধ্যান তপস্যায় গতি ও অস্তি অধিজাত হইল'—এখানে আপনি বৃত্তি মানে প্রকৃতি বলেছেন। বৃত্তির অর্থ কি এখানে কামনা বলে ধরা যায় না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ কামনা না থাকলে কি সেদিকে যায়? মেয়ে ছেলের প্রতি আকৃষ্ট না হলে কি মেয়ে ছেলেতে উপগত হয়?

কথা প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—'সত্যং, শিবং, সুন্দরম্' বলে তার মানে সপরিবেশ অস্তিত্ব, বিদ্যমানতা বা সত্তাকে অক্ষত, অক্ষুন্ন, সুষ্ঠু, উন্নত, অবাধ ও সার্থক করে তোলাই মঙ্গলজনক ও আদরণীয়। সচ্চিদানন্দ বলে—সৎ মানে অস্তি, বিদ্যমানতা, চিৎ মানে বোধশক্তি, সাড়া দেওয়া ও নেওয়ার ক্ষমতা, আর আনন্দ মানে বৃদ্ধি। এই গুলির যুগপৎ সমন্বয় ও সঙ্গতি চাই। চেতনা ও আনন্দের বিকাশ ও বিস্তারের ভিতর দিয়েই সত্তা সার্থকতা লাভ করে।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল বাংলোর সামনের বারান্দায় এসে বসলেন।

জনৈক ভাই—মানুষ যে শাপ দেয়, তাতে কী হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ বৃত্তিবিরোধ হলেও শাপ দেয়, সত্তায় ব্যথা লাগলেও শাপ দেয়। সত্তায় ব্যথা লেগে শাপ দিলে মুশকিল আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যার পর ভক্তবৃন্দ-পরিবেষ্টিত হয়ে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে ইজিচেয়ারে উপবিষ্ট। চারদিকে আলো জ্বলছে। মাঝে মাঝে গাছের ছায়া। আলো আঁধারির মাঝে নাতিশীতোষ্ণ সন্ধ্যায় অনেকেই আশ্রম প্রাঙ্গণে স্বচ্ছন্দে পরিভ্রমণরত। ওয়েস্ট এণ্ড বাড়ীতে খোল করতাল সহযোগে তুমুল কীর্ত্তন চলছে। এই উদ্দাম আনন্দ-সঙ্গীত সবার প্রাণে ভাবভক্তির আবেশ সৃষ্টি ক'রছে।

পূজনীয় বাদলদা ও অধ্যাপক মণিদা ( চক্রবর্ত্তী ) শ্রীশ্রীঠাকুরের সামনে একখানি নীচু বেঞ্চিতে বসে আলাপরত।

কথা প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ইষ্টপ্রাণতায় মানুষের being-টা ( সত্তাটা ) moulded ( বিন্যস্ত ) হয়, বৃত্তিগুলি adjusted (নিয়ন্ত্রিত) হয়। Personality ( ব্যক্তিত্ব ) integrated ( সংহত ) হয়, প্রজ্ঞার উদ্ভব হয়। তুমি আলাদা মানুষ হয়ে যাবে। সাধারণ মানুষের মত তোমার জানাগুলি বিচ্ছিন্ন থাকবে না, সেগুলি পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক হয়ে তোমাকে শক্তিমান করে তুলবে। সেই শক্তির বলে তোমার এই বিদ্যা নিয়েই বহু কঠিন কাজ কৃতিত্বের সঙ্গে করতে পারবে।

মণিদা—পাতঞ্জলে আছে জাত্যন্তর পরিণতির কথা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Rebirth ( জন্মান্তর ) হয়ে যায়। Religion ( রিলিজিয়ন )-কে বলা যায় দ্বিজাধিকরণ। ধর্ম্ম এক, ঈশ্বর এক, তাঁর বার্ত্তিক সব এক। একই সর্ব্বত্র। দ্বিজাধিকরণের পরিবর্ত্তনের ফলে তুমি যদি পূর্ব্বতন প্রেরিত পুরুষকে না মান, তার মানে তুমি নূতন যাঁকে গ্রহণ করলে বলছ, তাঁকেও মান না। কারণ পূর্ব্ববর্ত্তীরই পরিণতি তিনি। তার মানে ধর্ম্ম মান না, ঈশ্বর মান না।

মণিদা—বোধ আর বোধিতে কী তফাৎ ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বোধিতে প্রতিষ্ঠিত হলে তখন যা কিছুর concentric meaningful adjustment ( সুকেন্দ্রিক সার্থক বিন্যাস ) হয়, সঙ্কল্প বিকল্প থাকে না।

মণিদা—ভবিষ্যৎ তো আমাদের অজ্ঞাত। হয়তো একটা ট্রেন-দুর্ঘটনা হ'ল। কত পণ্ডিতও সেখানে বিপন্ন হন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ concentric ( সুকেন্দ্রিক ) হলে তার intuitive faculty ( অন্তর্দৃষ্টি ) বেড়ে যায়। পাতঞ্জলে আছে 'তস্মিন্ নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞত্ববীজম্।' বিষয় বা ব্যাপারের মধ্যে পড়লে, প্রাজ্ঞ পুরুষ তার অন্তর্নিহিত তত্ত্ব ও তথ্য বুঝতে পারেন, জানতে পারেন, অনুভব করেন। স্বতঃই তাঁর বোধের কাছে অনেক কিছু প্রতিভাত হয়।

মণিদা—তিনি কি বৈজ্ঞানিক সমস্যার বিশদ সমাধান দিতে পারেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, পারবেন না কেন ? বাস্তব ব্যাপার ত ? খুব ভাল করে করতে পারেন। আমার মত মানুষেই কত বলেছি, আর তেমন মানুষ হলে তো কথাই নেই। তিনি করেন তাঁর মত করে। তাঁর ভাষায় তিনি বলেন।

মণিদা—সোমেশবাবু খুব বড় বড় অঙ্ক নির্ভুল ভাবে করে দিতেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনি করেন তাঁর মত করে। তোমার নিয়মে হয়ত না করতে পারেন। আবার সে ভাবে করাও তাঁর পক্ষে অসম্ভব নয়। তিনি যেভাবে করেন, তার মধ্যেও একটা নিয়ম আছে। ঋষিদের আমলে কত কত করেছে। অন্তর্দৃষ্টি খুলে গেলে তার থেকে সব পারে।

২২শে ফাল্গুন, রবিবার, ১৩৫৫ ( ইং ৬।৩।৪৯ )

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে তাঁবুর পাশে ছায়ায় চেয়ারে উপবিষ্ট। পূজনীয় বড়দা এবং কেষ্টদা ( ভট্টাচার্য্য ), সুশীলদা ( বসু ), কাশীদা (রায় চৌধুরী), দক্ষিণাদা ( সেনগুপ্ত ), সুধীরদা ( বসু ), সুরেনদা ( শূর ), নগেন ভাই ( দে ) প্রভৃতি উপস্থিত।

একজন দয়ালবাগের সৎসঙ্গী ( জনৈক রাজার গুরু ) আসলেন। তাঁর সঙ্গে যিনি এসেছিলেন তিনি এ কথা বললেন। তাঁরা উভয়ে প্রণাম করলেন। তাঁদের বসার জন্য একখানি বেঞ্চ এনে দেওয়া হ'লো। শ্রীশ্রীঠাকুর প্রীতিভরে বললেন—আপনাদের দেখে আমার খুব ভাল লাগছে।

সৎসঙ্গী দাদাটি বললেন—আমরা আপনার দর্শন পেলাম, সে আমাদেরই মহাভাগ্য।

পরে কথা প্রসঙ্গে তিনি বললেন—এক জায়গায় গিয়ে ছিলাম। সেখানে পণ্ডিতরা "আর-এস" মত মানেন না। আমি বুঝিয়ে দিলাম—এটা শাস্ত্রীয় ব্যাপার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে মানে সে করে। যে মানে না, সে করে না। বোঝে না, তাই মানে না।

উক্ত দাদা—পাতঞ্জলে যে ব্রহ্মনাদ যোগ আছে, তা থেকেই সুরতশব্দ যোগ হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর সায় দিলেন। একটু সময় চুপ থেকে বললেন—আমি বলি রাজার গুরু ত উনি আছেন—আমি চাই উনি রাজগুরু হয়ে উঠুন। ······যারা করে, তারা জানে। বই পড়ুক বা নাই পড়ুক, তাদের কাছে সত্য প্রতিভাত হয়। না করলে বোঝা যায় না। আসল জিনিস করা। প্রেম না হলে আবার করা হয় না। করাটা কেন্দ্রায়িত হওয়া চাই, তবেই তা ভূমায়িত হয়। অনুভূতিহীন বাচকজ্ঞানে কোন কাজ হয় না। মাঝখান থেকে জানার অহঙ্কার হয়, যা প্রকৃত জ্ঞানের অন্তরায়। সনাতন মত মানেই সন্তমত। যার সুরতের tension (টান) যত বেশী, সে তত এগোয়, আর তা যার যত ঢিলে, complex-এ (প্রবৃত্তিতে) সে তত জড়িয়ে থাকে।

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা! সুরত কী?

সৎসঙ্গী দাদা—আত্মা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সুরতকে জীবাত্মা বলে। আমাদের মধ্যে বীজ-কোষ ও ডিম্বাণু মিলিত হ'য়ে—জাইগট গঠিত হয়,—সুরত অর্থাৎ cohesive urge (সংসক্তিমূলক আকূতি) দিয়ে। নচেৎ জৈবী-সংস্থিতির সংস্থানই হয় না। সুরত অর্থাৎ টানটা ভগবৎপ্রদত্ত জিনিস। যেমনতর তার ব্যবহার, অবস্থানও মানুষের তেমনতর। এটাই ত সনাতন সত্য। মূলের সঙ্গে যার মিল আছে, যার খেই ঠিক আছে সে ত সনাতন হবেই। একে তুমি যে কোন নামই দাও, মাল একই থাকবে। যাদের মন দুর্ব্বল তারা গুরুভক্ত হতে পারে না। মন দুর্ব্বল, মানে সুরত দুর্ব্বল। আগুন যেমন উপযুক্ত ইন্ধন দিলে পরে বাড়ে, সুরতে তেমনি ইন্ধন দিলে বাড়ে। সুরতে ইন্ধন দেওয়া মানে গুরুর নির্দ্দেশ মত চলা। গুরু মানে সদগুরু, সত্যলোকের সঙ্গে যাঁর নিত্য সংশ্রব।

সত্য তাই, যা সত্তাকে পরিপুষ্ট করে। সৎসঙ্গ মানে সতের সঙ্গ। যারা সত্তাকে চায়, ভালবাসে, তারা এক জায়গায় মিলিত হলে তাকেই বলে সৎসঙ্গ। হ্রীং ক্লীং প্রভৃতি আসল সৎনামেরই রূপান্তর। সৎনামকে অবলম্বন করে যখন সাধনপথে অগ্রসর হই, অগ্রগতির পথে আপনা আপনি বিভিন্ন স্তরের বীজ, নাদ ও জ্যোতির অনুভূতি লাভ হয়। করলে পর হয়। কবীর সাহেব ত লেখাপড়া জানতেন না। গুরু নানক কি লেখাপড়ার উপর নির্ভর করেছেন ?

সৎসংগী দাদা—আজকাল অনেক ধার্মিক লোক বাহ্যিক নিয়ে প'ড়ে থাকে। ভিতরে সাধন নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের অন্তরে গুরুভক্তি যত দুর্ব্বল হয়, তত বাহ্যিক নিয়ে মত্ত হই। আর গুরুভক্তি দৃঢ় হলে বহিরঙ্গ সাধন যা' তা'ও গুরুরই পরিপূরণ মানসে করি, তাই তা' ভক্তিরই পোষণ করে। ক্ষুধা থাকলে, খাদ্য হজম হবে। তাতে পুষ্টি পাবে। তা না থাকলে হজমও হবে না, পুষ্টিও পাবে না। কর্ম্মও তেমনি ঈশ্বরানুরাগ থাকলে চারিত্রিক বিকাশ ও সাধনার সহায় হয়, নচেৎ তা বোঝা হ'য়ে, ভার হয়ে আমাদের আবদ্ধ করে রাখে।

সৎসঙ্গী দাদা—শুনেছি, ঐ সব পণ্ডিতরা নাকি সৎসঙ্গীদের উপর দুর্ব্যবহার করেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পণ্ডিত হ'লে উপদ্রব করতো না।

সৎসঙ্গী দাদা—ব্যবসা টিকবে না। রোজগার বন্ধ হবে। সেই ভয়ে করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সত্য পথে চললে রোজগার বেশী হয়। সাধু রোজগার হয়। সত্যকে খণ্ডন করলে, স্বার্থের খাতিরে ভেদ বুদ্ধির প্রশ্রয় দিলে, তা হয় না। ফাঁকির পয়সা আর ভালবাসার পয়সা ঢের তফাৎ। ফাঁকির পয়সা খেলে শরীর, মন প্রবৃত্তি-ঝোঁকা হয়। সাত্বত সম্বেগ স্তিমিত হতে থাকে।

প্রাণায়াম সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রাণায়াম মানে প্রাণের শান্তি। নাক টিপলেই প্রাণায়াম হয় না। যদি বিধিমত না করে, প্রাণায়ামের পরিবর্ত্তে ব্যারাম হয়। ভক্তিতে আপনা আপনি প্রাণায়াম হয়। জীবনীশক্তি বেড়ে যায়। প্রাণায়াম করি, যোগ করি, ভক্তি ছাড়া হয় না। যোগের বজ্রলেপই হলো ভক্তি। ভক্তিযোগ যার আছে, জ্ঞান তাঁর স্বাভাবিক। যারা নিঃশ্বাস নিয়ন্ত্রণ করে প্রাণায়াম করতে চায়, এবং জ্ঞান যোগ সম্বন্ধীয় গ্রন্থ অধ্যয়ন ও আলোচনা করে যারা মহাসমাধি চায়, দু দলেরই ফল একই রকম হয়। যাঁরা সদগুরু, তাঁদের ভিতর পূর্ব্ববতন সদগুরুরা সজাগ থাকেন। তাঁকে যদি পূজা করি সর্ব্বদেবতারই পূজা হয়। তাঁকে বাদ দিয়ে কারও পূজা হয় না। সেই জন্য আছে 'সর্ব্ব দেবময়ো গুরুঃ'।

সৎসঙ্গী দাদা—সৎসঙ্গীরা দেবতা মানে না বলে পণ্ডিতরা বলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা বেশী করে মানি। শুধু বাহ্যিকভাবে মানি না, তার সত্তা সহ মানি।

সৎসঙ্গী দাদা—শক্তি আর শক্তিমান এক কিনা এই সম্বন্ধে এক জায়গায় কথা উঠেছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দয়া কি দয়াবান থেকে আলাদা?

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর প্রস্রাব করতে গেলেন। সেখানে থেকে উঠে বড়াল বাংলোর বারান্দায় এসে চৌকিতে বসলেন। পণ্ডিতভাই, বীরেনদা (মিত্র), দক্ষিণাদা (সেনগুপ্ত), সুরেনদা (সেন), কান্তিদা (বিশ্বাস), মহিমদা (দে), হরিদাসদা (সিংহ) প্রভৃতি অনেকে এসে জমা হলেন। সৎসঙ্গী দাদাটিও আসলেন। তিনি বললেন—যদি কোন ধর্ম্মে ব্রহ্মজ্ঞানী না থাকে, তাহলে তার জীবনী শক্তি কোথায়? ড্রাইভার না থাকলে ইঞ্জিন চালায় কে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেই জন্য ব্রহ্মবিৎ গুরুদের মধ্যে যারা ভেদ করে তাদের সিদ্ধি হয় না। ভক্তি ব্যভিচারী হয় তখন। আমাদের সেই জন্য আছে সদগুরুদের ভিতর ভেদ করতে নেই। তিনি যখনই আসেন

দেশকাল পাত্র হিসাবে আসেন, আর, যেখানে যেমন করা লাগে তেমন করেন। কবীর বড় না নানক বড়—এ কথা নয়। সব এক। এক প্রদীপের থেকে যেমন ৫ প্রদীপ ধরান যায়। একই আগুন—এও সেই রকম। সব সদ্‌গুরুই বৈশিষ্ট্যপালী, আপূরয়মাণ। আমি মনে করি তাঁরা সনাতন। বার বার আবির্ভূত হ'য়ে কালের থেকে, পতনের থেকে আমাদের উদ্ধার করেন। তাঁর দয়াতেই এই সব আবির্ভাব হয়। এঁদের মধ্যে ভেদ করার অর্থ হয় না।

যখনই বর্ত্তমান আসেন—সনাতন সংবাদ নিয়ে, তাঁর মধ্যে পূর্ব্বতন থাকেন। তাঁকে না মেনে যারা পূর্ব্বতনের দোহাই দিয়ে চলে, তারা সেই পূর্ব্বতনকেও মানে কিনা সন্দেহ। উত্থানও হন না ওতে। শাস্ত্র বিকৃত হয়। বর্ত্তমান সদ্‌গুরুর ভিতর দিয়ে পূর্ব্বতনদের বচনের সার্থকতা বোধ করি। নচেৎ বৃত্তিমাফিক তাঁদের বচনের অর্থ ক'রে নিই। সদ্‌গুরু বৃত্তির উপরের এলাকার মানুষ। তাঁরা স্বতঃই জীবন্মুক্ত।

সৎসঙ্গী দাদা—আপনার মা'র সম্বন্ধে জানতে ইচ্ছা করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শুনেছি মা আট বছর বয়সে অলৌকিকভাবে নাম পেয়েছিলেন। পরে হুজুর মহারাজের কাছ থেকে নাম নেন। মা'র খুব ভক্তি ছিল হুজুর মহারাজের উপর। যখন আমাদের অবস্থা খুব খারাপ হ'য়ে গিয়েছিল, তখন তিনি মাকে এত সাহায্য করেছেন, চিঠিতে কত উৎসাহ দিয়েছেন। লিখেছিলেন তুমি ঘাবড়ে যেও না, আমি আসছি তোমার কাছে। আমি কোন কেতাব টেতাব পড়ি নি। জানি না কিছু। আমি খুব মুর্খ আদমী। বুঝি না কিছু।

সৎসঙ্গী দাদা—বাল্মিকীর কেমন করে হ'লো?

শ্রীশ্রীঠাকুর—শ্রদ্ধা চাই। নচেৎ হয় না। একটা গল্প আছে—রামলক্ষ্মণ যাচ্ছিলেন, নৌকায় পার হ'লেন। নৌকা সোনা হয়ে গেল। আবার যেতে যেতে ভেকের গায় পা লাগায় সে মুতে দিল। তখন লক্ষ্মণ বললেন—এ কেমন হলো? রামচন্দ্র বললেন—ভেকের ভেকবুদ্ধি। শুধু পণ্ডিত হ'লে হয় না। যদি ভেকবুদ্ধি না যায় কিছু হয় না, আবার

তা ঘুচে গেলে, মানুষ সোনা হয় যায়। ভেকবুদ্ধি আমাদের সবারই অল্পবিস্তর থাকে। তিনি দয়াল। তাঁর দয়ার বার্ত্তা যিনি নিয়ে আসেন, তাঁর সঙ্গ, সেবা, পরিচর্য্যা যত করব, ততই তা' ছুটে যাবে।

সৎসঙ্গী দাদা—অবতারের বিভিন্ন রূপ কেন? যেমন মৎস্য, কূর্ম্ম ইত্যাদি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যখন যে রূপে প্রয়োজন, environment (পরিবেশ) যখন যেমন, তখন সেই আকারে আসেন। কিন্তু যিনিই আসুন, দয়ালেরই বার্ত্তা নিয়ে আসেন সবাই। তিনি এক, আর চিরদিন এক কথাই কন—নানা রকমে। মৎস্য অবতারে মৎস্যের মত করে ব'লে গেছেন সেই কথা। যখন যেমন, তখন তেমন। তাঁর চিরকালের কথা হ'লো—উৎসমুখীনতার কথা, ভালবাসার কথা, সেবার কথা, আত্মনিয়ন্ত্রণের কথা, সপরিবেশ সত্তা সম্বর্দ্ধনার কথা।

সৎসঙ্গী দাদা—কাল আর দয়াল আলাদা কেন? আগের সব নাকি কালের অবতার?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কাল এসেছে কল্ ধাতু থেকে, তার মানে গতি। আর আছে সৎ, যার মুলে আছে অস্-ধাতু অর্থাৎ বিদ্যমানতা, সৎ, সত্তা, স্থিতি, অস্তি—একই ব্যাপার। স্থিতি না থাকলে গতি থাকে না। যে অবতারই হউন সতে স্থিতি চাই, নচেৎ সুষ্ঠু গতি হয় না। স্থিতির কোলে আসীন হ'য়ে তারা গতির রাজ্যে বিচরণ করেন—গতিকে স্থিতিমুখী, কারণমুখী, দয়ালমুখী করার জন্য। যে গতি সুকেন্দ্রিক নয়, তাই কাল অর্থাৎ প্রবৃত্তি। তা' আমাদের বদ্ধ করে। যে গতি সদ্গুরুতে কেন্দ্রায়িত তা কিন্তু কাল নয়। তা আমাদের মুক্তিরই সাথীয়া।

সৎসঙ্গী দাদা—শ্রীকৃষ্ণ নিজে বলেছেন—তিনি স্বয়ং কাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অর্থাৎ আমিই কাল হয়েছি। শ্রীকৃষ্ণের স্থিতি কিন্তু সৎপুরুষে, তিনি স্বয়ং সৎপুরুষ, তিনিই নিত্যসত্তা। গতির ভিতর দিয়ে তাঁর নানা পরিণতি হয়েছে। সৎবাদ দিয়ে কালের অস্তিত্ব নেই। কাউকে ফেললে হয় না। শ্রীকৃষ্ণই সেই যুগের সন্ত। রামচন্দ্রের যুগে

রামচন্দ্রই সন্ত। সন্ত মতে আসল যাঁরা, কেউ বাদ জান না। রাধা শব্দের প্রবর্ত্তক স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। সেই জন্য তাঁর হাতে বাঁশী দেয়—যা কিনা অন্তরের সুরের বাইরের রূপ। সন্তমতে কোন অবতারই বাদ পড়েন না। তাঁদের কথা না থাকলে আমরা সন্তমত বুঝতে পারতাম না। যেমন বলেছেন আমি কাল, তেমনি বলেছেন, গাছের মধ্যে আমি অশ্বত্থ, সাপের মধ্যে আমি পর্পরাজ বাসুকি। আরো কত কী! যা-কিছু সৃষ্টি হয়েছে সবই তিনি। তিনি বলেছেন, যখনই ধর্ম্মের গ্লানি হয়, তখনই তিনি জন্মগ্রহণ করেন। সদ্‌গুরুও তাই। যেখানে গ্লানি হয়, সেখানেই আসেন। তাঁর কাজেই ওই। শব্দ তত্ত্বের মূল যা'—তখন থেকেই দিতে আরম্ভ করেছেন শ্রীকৃষ্ণ। বলেছেন শব্দের মধ্যে আমি একাক্ষর প্রণব। অবশ্য রামচন্দ্রের সময় থেকেই পাওয়া যায়।

শুনেছি ভগবতে রাধা ব'লে গোপিনী নেই। আমি বুঝি, রাধা মানে সেরা সৃষ্টিরচয়িতা শক্তি। শব্দের থেকেই সব। কতরমের শব্দ শোনা যায়। ওঁ অনুভূতির পূর্ব্বে দারুণ বম্ বম্ শব্দ হয়। দুনিয়াটা যেন ফেটে চৌচির হ'য়ে যাবে। কিছু থাকবে না, সব ধ্বংস হ'য়ে যাবে। সত্তাকেও বিলুপ্ত ক'রে দেবে। এমন শব্দ, সব যেন টুকরো টুকরো হ'য়ে, রেণু রেণু হ'য়ে উড়ে যাবে। সে কি ভীষণ অবস্থা! ভয় বলি, সত্তার ভয় যে কী তখন বোঝা যায়। সত্তা বুঝি এই মুহূর্ত্তে গুঁড়িয়ে দিল। তখন বোঝা যায় দয়ালের দয়া, যে দয়ায় টিকে আছি এই দুনিয়ায়। ওঁ অনুধাবনে রং আসে। রং এ মনোনিবেশ করলে পিকলু বাঁশীর মত শব্দ হয়। দোল আসে। এক অবস্থায় motion and cessation (গতি এবং বিরতি) এর মত বোধ হয়। স্বামীর অনুভূতি যেন to and fro (একবার সামনে একবার পেছনে হচ্ছে)—এমনতর বোধ করা যায়। ইলেকট্রিক ব্যাটারি দিলে যেমন শব্দ পাওয়া যায় না, ভিতরে বোধ হয়। রাধাও ঐ রকম সত্তা দিয়ে মালুম হয়। শেষ দিকে আসে একটা পরম শান্ত অবস্থা।

আমাদের এই সৎনাম সব মন্ত্রের বীজস্বরূপ। সব বীজের সত্তা হ'লো কম্পন। আর, কম্পনের গঠনতন্ত্র অনুভব করা যায় এই নামের

মধ্যে। রেডিও তে যেমন শর্ট ওয়েভ, মিডিয়াম ওয়েভ এবং নানা মিটার আছে অনুভূতির রাজ্যেও সেই রকম সব আছে। এগুলি ফালতু কথা না, এগুলির সত্তা আছে। যে সাধন করে সেই বুঝতে পারে। হ্রীং, ক্লীং ইত্যাদি স্তরে স্তরে কত শব্দ এবং তার সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতি ভেসে ওঠে। আর একটা কথা,—পরীক্ষা করতে গেলে সদ্‌গুরুকে ধরা যায় না। কামনা নিয়ে গেলেও তাঁকে পাওয়া হয় না। কামনা ত্যাগ ক'রে ধরলে তখন তাঁকে পাওয়া যায়। কামনা নিয়ে তাঁতে যুক্ত হ'তে গেলে কামনার সঙ্গে যুক্ত হই, তাঁতে যুক্ত হ'তে পারি না। নিষ্কামের কথা কয়, তার মানে গুরুই আমার একমাত্র কাম্য হবেন, অন্য কোন কামনা থাকবে না। তখনই তাঁকে পাওয়া যাবে।

কালের অবতার সম্বন্ধে আবার কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কাল মানে শাতন, যা বিচ্ছিন্ন করে, ভেদ সৃষ্টি করে, ক্ষয় করে, পতিত করে। বধ করে, ছেদন করে। শাতন থেকে এসেছে শয়তান। শয়তানের অবতার পূর্ব্ববতনকে মানে না। মানলেও ভেদবুদ্ধির পরিপূরণের জন্য মানে। ভেদ ছেদ সৃষ্টি করে। প্রকৃত অবতার পূর্ব্বতনকে মানেন এবং তাঁদের পরিপূরণ করেন। এই দেখে বুঝতে হয় দয়ালের বার্ত্তিক, না শয়তানের বার্ত্তিক। হজরত রসুলের মধ্যে শব্দ-জ্যোতির কথা আছে। তাঁর মধ্যে ভেদের কথা নেই। ঐক্যের কথা আছে। তিনি সৎ দলের মানুষ। জিন্নাকে বলব ভেদ দলের। ভগবান বলতে হিন্দুর আলাদা, মুসলমানের আলাদা, তা নয়। ধর্ম্ম যখন বলব, তখন হিন্দুর পক্ষে এক, মুসলমানের পক্ষে অন্য, তা নয়। অবতার পুরুষদের কাজ অজ্ঞকে বিজ্ঞ করা, ছোটকে বড়করা। বিজ্ঞকে অজ্ঞ করা নয়, বড়কে ছোট করা নয়। বৈশিষ্ট্যকে নষ্ট করতে চায় শয়তান, বাড়াতে চায় সৎ। সৎপুরুষ নিজে সৎ কিনা, তাই তিনি সৎই চান, ঐক্য চান। জীবন চান, সম্বর্দ্ধনা চান, মরণকে মারতে চান। শয়তান চায় ছেদ করতে। ভেদ করতে, পতিত করতে। সৎ আসেন সাধুর পরিত্রাণের জন্য। শয়-তান চায় সাধুর বিনাশ। এইগুলি দেখে বোঝা যায় কার স্বরূপ কী!

অনামী নাম প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সৎনাম অনামী। কারণ এটা সত্তা দিয়ে বোধহয় মাত্র। শব্দ হিসাবে কানে এমনটা শোনা যায় না।

সৎসঙ্গী দাদা—সৎনামকে বিকৃত করে এর পরিবর্ত্তে অন্য জোড়া-তালি দেওয়া নামেও কোথাও কোথাও দীক্ষা দেওয়া হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কালের রকমই এমনতর। তা সবটার মধ্যে গলদ ঢোকায়। শ্রীকৃষ্ণ কালের অবতার নন। শিশুপাল প্রভৃতি ছিল কালের অবতার। শিশুপাল আবার কৃষ্ণের মত ভঙ্গী করতো। কৃষ্ণ সেই কালের কাল হলেন। কালের ধর্ম্ম বৃত্তিতন্ত্র। সতের ধর্ম্ম সত্তাতন্ত্র, দুটো উল্টো। নকলগুরুরা শয়তানের দূত। তারা করে না, কয়। সতের ধুয়ো ধ'রে, কালের অর্থাৎ প্রবৃত্তির সেবা করে।

সৎসঙ্গী দাদা—ক'দিন থাকতে পারলে আনন্দ হতো। তাঁর দয়ায় আসা হ'লো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দয়াল যদি দয়া ক'রে আবার নিয়ে আসেন, খুশী হব।

সৎসঙ্গী দাদা—তাঁর দয়া।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেখানে আমাদের মেহের থাকে, সেখান থেকে আমরা মেহের পাই।

সৎসঙ্গী দাদা—'ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন'। সন্তমত ও পথ তিনগুণের পার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শ্রীকৃষ্ণ যে কালের অবতার নন, তার প্রমাণ ওখানে। সেই একই কথা repeat ( পুনরুক্তি ) করেছেন নানা রকমে।

সৎসঙ্গী দাদা—কেউ কেউ প্রশ্ন করেন সন্তসদগুরু পেলে নাম করার প্রয়োজন কি ? আমরা বলি নামে আত্মার খোরাক হয়। সদ্‌গুরু পেলে তাঁর সঙ্গ, নচেৎ সাধুসঙ্গ, কিম্বা প্রেমী সঙ্গেও আত্মার খোরাক হয়। এ কথা ঠিক ত ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রেমীসঙ্গ মানে সত্তাপ্রেমীর সঙ্গ। বৃত্তিপ্রেমীর সঙ্গ নয়।

সৎসঙ্গী দাদা—অনেকে বলে তোমরা মানুষের পূজা কর। আমরা বলি সদগুরুর দেহ ত কুল মালিকের মন্দির।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি।

এরপর উক্ত দাদা প্রণাম ক'রে বিদায় নিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় তক্তপোষে পূত শুভ্র শয্যায় উপবিষ্ট। কেষ্টদা ( ভট্টাচার্য্য ), সুশীলদা ( বসু ), ২ বীরেনদা ( ভট্টাচার্য্য ও মিত্র ), উমাদা ( বাগচী ) প্রভৃতি অনেকে উপস্থিত।

কেষ্টদা—দীর্ঘদিন ব্রাহ্মণের অদর্শন হেতুনাকি দ্বিজ পাতিত্ব প্রাপ্ত হয়!

শ্রীশ্রীঠাকুর—সচল থাকে নাত, তাই প্রবৃত্তিপন্থী হয়ে পড়ে।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর মাঠে ইজিচেয়ারে উপবিষ্ট। কেষ্টদা, সুশীলদা, হাউজারম্যানদা, হেনরী প্রভৃতি উপস্থিত।

প্রফুল্ল দোভাষীর কাজ করছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর হেনরীকে জিজ্ঞাসা করলেন—মানুষের জীবনে ভগবানের প্রয়োজনীয়তা কী? তুমি কি মনে কর?

হেনরী—সেটা মানুষটার উপর নির্ভর করবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সার্ব্বজনীন প্রয়োজন কী?

হেনরী—চালক এবং আশ্রয় হিসাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ তা ঠিক। তবে বিবর্ত্তিত হবার জন্য আমার বাইরে কোন উপযুক্ত কেন্দ্র যদি না থাকেন এবং তাঁতে যদি আমার আগ্রহ ও ক্ষুধা না থাকে, স্বাভাবিক বিবর্ত্তন বিকৃত হ'য়ে যায়। এই হ'লো কেন্দ্র এবং আশ্রয়ের গুরুত্ব। আমার মনে হয়, সব জীবের মধ্যেই এটা আছে। প্রবৃত্তির ধরণ অনুযায়ী এক এক জীবের এক এক রকম দেহ হয়েছে। তাই সব জীবেরই বিবর্তনের জন্য আদর্শের প্রয়োজন আছে। হেনরী! তোমার কী মত এ বিষয়ে?

হেনরী—মানুষ ছাড়া অন্য জীবের ক্ষেত্রে এমনতর প্রয়োজনের কথা আমি বুঝতে পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের ভিতরে হ'লে সবার ভিতরেই আছে। দেখাও যায় তাই।

কেষ্টদা—সচেতন প্রচেষ্টার আগে থেকেও ত বিবর্ত্তন হয়ে আসছে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয়, গাছেরও চেতনা আছে।

কেষ্টদা—আমাদের যে অর্থে চেতনা আছে, ওদেরও কি তাই ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওদের ওদের মত ক'রে আছে।

কেষ্টদা—ধূলিকণার জীবন আছে যখন বলি, তখন সেটা কি মানুষ ও অন্যান্য জীবের জীবন থাকার মত ব্যাপার ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেও চেষ্টা করে নিজের সত্তাকে বাঁচিয়ে রাখতে। জীবনের বৈশিষ্ট্যই আছে, তার মত ক'রে।

হেমরী প্রজনন সম্বন্ধে কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এর পিছনেও আছে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার আকূতি। তোমরা যদি পাঁচ ভাই হও, তবে তোমাদের প্রত্যেকেই তোমার বাবার এক একটি নিবাসস্থল, যেখানে তোমার বাবা আশ্রয় করে নিয়েছেন, তোমার মার সাহায্যে। অর্থাৎ পুরুষ প্রকৃতির সহযোগিতায় বেঁচে থাকে। সন্তানের মধ্য দিয়ে পিতা ও মাতা উভয়েই কিন্তু অস্তিত্বকে প্রলম্বিত করে। অস্তিত্বের ক্রমাগতি বলতে মৃত্যুর পর নূতন দেহলাভ এবং পিতামাতার ভিতর দিয়ে চুঁইয়ে আসা—এই দুটোই বোঝায়। যীশুখ্রীষ্ট যেমন বলেছেন—Elijah is come again (এলিজা আবার এসেছে)—এটাও সত্য, আবার পিতামাতার থেকে একজনের জন্মলাভ এও সত্য।

কথা প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আত্মাকে অবলম্বন ক'রেই সত্তা। সত্তা পরিবেশ থেকে পোষণ নেয় তার মত ক'রে। এই পোষণ নেবার জন্যই ছ'টি প্রবৃত্তি। বিভিন্ন প্রবৃত্তি ও ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যখন সত্তা পরিবেশ থেকে আত্মসংরক্ষণী পোষণ সংগ্রহ করতে পারে না, তখন তা বিশ্লিষ্ট হ'য়ে যায়। যখন আমরা প্রবৃত্তিতে অভিভূত হই, তখন সত্তা ক্ষয় করি।

কেষ্টদা—বিজ্ঞানে বলে, একটা গঠন ভেঙ্গে না গেলে, বিবর্ত্তন হয় না। যা যায়, তা চলেই যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যখন এই শরীর দিয়ে প্রকৃতি থেকে লওয়াজিমা নিতে পারে না, তখন তা ভেঙ্গে যায়।

কেষ্টদা—দেহপরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়েই বিবর্ত্তন হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—জীবন চায় অব্যাহত থাকতে। বাড়তে চায় বটে, তবে থেকেই বাড়তে চায়। Continuity (ক্রমাগতি) বজায় থেকে বাড়তে পারলে খুশী হয়। কিংবা স্মৃতিবাহী চেতনা পেলে খুশী হয়। অমৃতত্বের আকাঙ্ক্ষা মানুষের চিরন্তন।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে গোল তাঁবুতে কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), সুশীলদা (বসু) প্রভৃতিকে বললেন—সাধনার সময় এক এক স্তরের পর আকাশ দেখা যায়। এক একটা ক্লান্তির স্তর আসে। তখন যেন সঙ্কোচন হতে থাকে, তার পর আসে বিস্তার। নূতন আকৃতি, নূতন জীবন এসে পড়ে। একটানা প্রসারণ হয় না। আকুঞ্চনের পর প্রসারণ, প্রসারণের পর আকুঞ্চন—এই রকম হ'তে থাকে। বঙ্কনাল দ এর মত, বঙ্কনাল বড় জবর জায়গা। ত্রিকুটী ভারি আরামদায়ক।

২৩শে ফাল্গুন, সোমবার, ১৩৫৫ (ইং ৭।৩।৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে তাঁবুর পাশে ছায়ার মধ্যে চেয়ারে উপবিষ্ট। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), সুশীলদা (বসু), বীরেনদা (মিত্র) প্রভৃতি উপস্থিত।

কথা প্রসঙ্গে সুশীলদা বললেন—শ্রীঅরবিন্দ বলেন—দেহে ভাগবত চেতনার অবতরণ ঘটলে, আমাদের এই দেহই অমর হ'য়ে যাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—উচ্চতর স্তরের উচ্চতর চেতনা যখন আমাদের মনকে অধিকার করে, তখন আমাদের শরীরও নিয়ন্ত্রিত হয় তদনুপাতিক। এই আমি যা বুঝি। তার বেশি বুঝি না।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর উত্তর দিকের বারান্দায় এসে বসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর দূরে একটা গাছের দুটো ডালের পানে চেয়ে বললেন—এখান থেকে দেখে মনে হচ্ছে যেন একটা 'রা' form (গঠন)

ক'রে আছে উল্টোভাবে। অনেককে সেটা দেখতে বললেন। অনেকেই ঠিক পেলেন।

তখন প্রফুল্লকে দেখতে বললেন। সে দেখেও ধরতে পারল না।

তখন শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বিশ্লেষণাত্মক ও সংশ্লেষণাত্মক এই দুরকমের বুদ্ধি মানুষের ঠিক না থাকলে হয় না। এটা দেখাই চাই, ওতে সংশ্লেষণাত্মক বুদ্ধি একটু বাড়বে।

শ্রীশ্রীঠাকুর তখন প্রফুল্লকে একবার ঐ গাছতলায় পাঠালেন। তখনও ঠিক তার মালুম হল না। অকৃতকার্য্য হ'য়ে গাছতলা থেকে ঘুরে আসার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বিরক্ত না হয়ে আর একবার তাকে ভাল করে বুঝিয়ে দিলেন। সে ভাল ক'রে নজর ক'রে দেখে জিনিষটা ধরতে পারল। তখন শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে এসে হেসে বলল—এত সোজা, বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। আমি এত সময় আবোল তাবোল কঠিন করে কল্পনা করছিলাম, তাই ধরতে পারছিলাম না।

শ্রীশ্রীঠাকুর হাসতে লাগলেন—পরে বললেন—দেখলি ত ?

প্রফুল্ল—খুব সোজা। এত সময় না দেখাটা বেকুবী হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রত্যেকটি জিনিস realize ( উপলব্ধি ) করতে পারলে অমনি সোজা। ধর্ম্মও অমনি সোজা। ওর চাইতে সোজা আর কিছু না। জুয়োচুরি করা বরং ঢের কঠিন। জুয়োচুরি যে করে, সে বোঝে, বুকের ভিতর কেমন করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর স্নান করতে গেলেন। স্নান করে উঠে প্রফুল্লকে আর একবার বললেন—এখন দেখতো দেখতে পাস কি না ?

প্রফুল্ল—হ্যাঁ! এর মাঝে আর একবার গিয়ে দেখে এসেছি। স্পষ্ট দেখা যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রত্যয় হ'লে ঐ রকম হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর ভোগের পর বড়াল-বাংলোর ঘরে বসে নিম্নলিখিত বাণীটি দিলেনঃ—

বিষম পরিণয়ে

বীজের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য-সমাবেশী সংযোগ

বিকৃত ক'রে দেয়,—

ফলে, বংশপ্রবাহ চিরদিনের মত খুঁতো হয়েই চলে।

এই বাণী দেবার পর পড়া হ'লো।

তখন শ্রীশ্রীঠাকুর কথাচ্ছলে সুশীলদাকে বললেন—আপনার ছেলে ও মেয়ে উভয়ের মধ্যেই আপনার বীজ-কোষ ছেলের বীজকোষ ও মেয়ের ডিম্বাণু সৃষ্টি করবে। তাই আপনার বিয়ে সঙ্গতিশীল না হলে, আপনার বংশবৈশিষ্ট্য বিকৃত হ'য়ে যাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে বড়াল-বাংলোর মাঠে ইজিচেয়ারে বসে কেষ্টদা ( ভট্টাচার্য্য ), জ্ঞানদা ( চক্রবর্তী ), সুশীলদা ( বসু ), কান্তিদা ( বিশ্বাস ), বঙ্কিমদা ( রায় ), প্রকাশদা ( বসু ), হরেনদা (বসু), রত্নেশ্বরদা (দাশশর্ম্মা), পেণ্টুভাই ( বসু ) প্রভৃতির সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা করছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথা প্রসঙ্গে বললেন—আমরা belly-centric ( পেট-কেন্দ্রিক ) হ'য়ে গেছি, সত্তা-centric ( সত্তা-কেন্দ্রিক ) নই, তার সঙ্গে যদি থাকে অহঙ্কার তা হ'লে যা হয়, তাই হচ্ছে। জাতি শিশ্নোদর-পরায়ণ হলে বাঁচা কঠিন।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রফুল্লকে জিজ্ঞাসা করলেন—ইদানীং যে সব গদ্যবাণী দিয়েছি, তার সংখ্যা কত ?

প্রফুল্ল—আজ বিকাল সাড়ে তিনটার সময় যে বাণী দিয়েছেন তার ক্রমিক সংখ্যা হলো ১২০৭।

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কয়েকটা লোক জোটান লাগবে। তাদের অজচ্ছল খাটা লাগবে। লেখাগুলি ঠিকমত adjust ( বিন্যাস ) ক'রে পরিবেষণ করা লাগবে। আর fund ( তফিল ) create ( সৃষ্টি) করা লাগবে—চেষ্টা চরিত্র করে যদি কিছু দানা বেঁধে তোলা যায়।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর গোলতাঁবুতে এসে বসলেন। প্রকাশদা জনৈক দাদার বিষয়ে বললেন—সে আমাকে এমনভাবে একটা কথা জিজ্ঞাসা করলো যে আমার মোটেই ভাল লাগলো না। যেন আমার সম্বন্ধে অমূলক সন্দেহ পোষণ করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাকেই বলা উচিত ছিল—তোমার প্রশ্নের ধরণ আমার মোটে প্রীতিপ্রদ লাগলো না। আমি তেমন খুশী হলাম না। তুমি যে একটা সন্দেহমূলক দৃষ্টি নিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করছ, এটা ঠিক না।

হিন্দু কোড বিল সম্বন্ধে কথা প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এই বিল পাশ হ'লে কালে কালে বহু পরিবারে মেয়েদের স্বামী থাকবে না। পুরুষের স্ত্রী থাকবে না, ছেলে পেলের মা থাকবে না। পুরুষ নিরুপায় হবে বেশি। তাদের মৃত্যু বরণ করার মত দুরবস্থা হবে।

আমরা ইচ্ছা করলে এর প্রতিবিধান করতে পারতাম। কাঠবিড়ালীও সাগর বেঁধেছিল, কিন্তু আমরা করলাম না। এক সময় হয়ত এর বিরুদ্ধে কথাই বলতে দেবে না। হয়ত তেমনতর ভাবধারা-সমন্বিত সাহিত্যেও হাত পড়বে। তবে লোকতান্ত্রিক দেশে তা না হওয়াই উচিত।

হরেনদা—আপনার দয়ায় আমরাই পারব আপনার ইচ্ছা পূরণ করতে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বলি ত সবাই, কিন্তু আমরা sincere (আন্তরিক) নই।…তোমরা যে কষ্ট করতে পার না। ছেলেপেলেদের পেটের ব্যবস্থা করা নিয়েই ডুবে আছ। গরু নিয়ে লাগলে, তাও পারলে না। আদৎ কথা, আমরা belly-centric (পেটকেন্দ্রিক) হ'য়ে আছি। তাই ইষ্টপ্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠাই হয়ত বেশী ক'রে করি। এই ত অবস্থা, কেউ গরু, কেউ গাধা, কেউ ঘোড়া, কেউ পেট, কেউ মান যশ, কেউ টাকা, কেউ আরাম আয়াস, এই সব ধাঁধায় আছি। প্রাণপাত করে কেউ কি লেগেছি? আর শুধু প্রাণপাত করলেই ত হয় না। চাই success (কৃতকার্য্যতা)। …স্বাস্থ্য ও মন আমার যদি তেমনতর থাকত, দেশে দেশে ঘুরতে পারতাম। তা হ'লে হয়ত বা হ'তো।

মেন্টুভাই—বেশেও ত মানুষের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে, আমার কি রকম বেশ হলে শ্রদ্ধাকর্ষী হয়? কি রকম মানায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—শ্রদ্ধাকর্ষী ত নয়—শ্রদ্ধার্হ। তোমার চালচলন, করা, বলা এমন হবে যে মানুষ তোমাকে শ্রদ্ধা করে সুখী হয়। তখন যে বেশপর, তাতেই মানাবে।

পালিতদা—আমার স্ত্রী আজ ৩ বছর মারা গেছে, কিন্তু এখনও ত ভূলতে পারি না, প্রায়ই মনে পড়ে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার ত মনে হয়, মনে পড়াই ভাল। সে ভাল বেসেছিল, অতো করেছে তোর জন্য, মনে পড়াই ত স্বাভাবিক, ওতে দোষ কী? যাকে ভালবাসা যায় তাকে কি ভোলা যায়?

পালিতদা—কিন্তু ঐ চিন্তা যে কাজকর্ম্ম খতম করে দিতে চায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভগবানের কাম করা লাগে, সে সার্থক হয় যাতে। আমার ত ভূলতে ইচ্ছা করে না, আমার যারা গেছে তাদের ভূলতে ইচ্ছা করে না।

বিনোদদা (দাস)—আমি বহুদিন থেকে দেখছি, যখন যাজনে যাব, তখন হয়ত খদ্দের আসল, এইভাবে একটা করতে গিয়ে আর একটায় বাধা পড়ে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাজন প্রসঙ্গ আসলে যাজন করবে। খদ্দের-প্রসঙ্গ আসলে খদ্দের-প্রসঙ্গ করবে। খদ্দেরের সঙ্গে কাজের মধ্য দিয়েও যাজন হয়। যাজন মানে এ নয় যে 'আমার ঠাকুর ভগবান' ইত্যাদি কথা। তোমার ব্যবহারে মানুষ উদ্দীপ্ত হয়ে তোমার প্রতি সশ্রদ্ধ হয়ে ওঠা চাই, সেইটেই যাজন।

বিনোদদা—অনেক সময় কাউকে হয়ত কথা দেওয়া থাকে—তার সঙ্গে যাজনে যাব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কোন কাজে জড়িয়ে না পড়লে, আসতে চেষ্টা করব—এইভাবে কথা দিলে হয়।

২৪শে ফাল্গুন, মঙ্গলবার, ১৩৫৫ (ইং ৮।৩।৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর দুপুরের আগে গোল তাঁবুতে বসে একটি বাণী দিলেন—সেই বাণীর সূত্র ধরে কেষ্টদা জিজ্ঞাসা করলেন—প্রিয় যদি প্রীত না হন, তবে মানুষ ভোগ করতে পারে না কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অত্যন্ত স্থূল যৌন উপভোগের ক্ষেত্রেই ধরুন। অংশীদার উপভোগ করছে এতেই কিন্তু আনন্দ পায়। যেমন ব্রেস্ট হ্যাণ্ডলিং-এ (স্তনপীড়নে) যে আনন্দ আরো কত নরম জিনিষও ত আছে।

ওতে আনন্দ পায়। তার কারণ মনে করে ওতে তার অংশীদারের সুখ হচ্ছে, ঐ ভেবেই সুখী হয়।

যেমন আপনি এম্ এ-তে সোনার মেডেল পেয়ে এলেন, বাড়ীতে আসবামাত্র আপনার বাবা লাঠি নিয়ে তাড়া করলেন, তখন আপনার কেমন লাগে? সোনার মেডেল কি বিষাক্ত হয়ে ওঠে না? ঐ রকম আর কি!

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর প্রাঙ্গণে ভক্তবৃন্দ পরিবেষ্টিত হয়ে একখানি ইজিচেয়ারে বসে আছেন। এমন সময় স্থানীয় এক ভদ্রলোক দেখা করতে আসলেন। পাকিস্তানের হিন্দুদের দুরবস্থা সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা যা করছি, নেতারা যা করছেন, তাতে বিনষ্টির ক্ষেত্র সৃষ্টি হচ্ছে। দেশ ভাগ যখন হলো তখন প্রথম বিপর্য্যয় হলো, তারপর দেশকে পাশ্চাত্ত্য ছাঁচে ঢালার চেষ্টা থেকে আরো বেশী গহীন অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে। আমাদের মুনি-ঋষিরা কী করে গেছেন—কতখানি প্রজ্ঞা ও ভূয়োদর্শন নিয়ে,—তা ভেবেও দেখলাম না। সব বাতিল করে দিলাম, এক কলমের খোঁচায় সব নস্যাৎ করে দিলাম—প্রতিলোম চলল এন্তার, বৈশিষ্ট্যকে ফেললাম ভেঙ্গে,—এসব কি শুভলক্ষণ?

উক্ত ভদ্রলোক—যুগোপযোগী পরিবর্ত্তন চাই। পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হবে। যুগধর্ম্ম বাদ দিয়ে চলা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনি বাঁচতে চান কিনা, বাড়তে চান কিনা, যেমন করে বাঁচতে পারি, বাড়তে পারি, তাই করাই সংস্কৃতি। যারা স্বল্প-সংস্কৃত, তাদের সুসংস্কৃত করতে চান, না যারা সুসংস্কৃত তাদের স্বল্প-সংস্কৃত করতে চান? কোনটা চান আপনি? আজ যদি আপনাকে বলে লেখাপড়া ছেড়ে মেথর হও, সেই কাজ কর, মেয়ে বিয়ে দাও তাদের সঙ্গে। সেই যুগধর্ম্ম মানতে চাই? না, তাকে সম্বর্দ্ধনার পথে টেনে নিতে চাই? শতকরা ৯০ জন যদি অসংস্কৃত হয়, তবে বাকী দশজন কি তাদের উন্নত সংস্কৃতি ত্যাগ করে তাদের দলে ঢুকে পড়বে? না তাদের উন্নত করে তুলতে চেষ্টা করবে? কোন্‌টায় লাভ?

উক্ত ভদ্রলোক—আগে আমরা ভারতবর্ষকে পৃথিবী মনে করতাম। এখন অবস্থা অলাদা দাঁড়িয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাই মনে করি, পারিপার্শ্বিক থেকে সেই লওয়াজিমা নিতে চাই, যা বাঁচাবাড়াকে তুখোর করে তোলে। অধিকাংশ যদি শূদ্র হয়, শূদ্রকেও বাঁচাবাড়াব পরিপোষণী করে নিতে চাই ত ! না আর কিছু ?

উক্ত ভদ্রলোক—আমরাও ত নামে বামুন কাজে শূদ্র।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধরলাম তাই। কিন্তু পরিবেশ যদি বাঁচাবাড়াকে পরিপুষ্ট না করে, তখন সে পরিবেশকে কী করা ? আমার ভিতর বামুনের ইনষ্টিংকট্ (সংস্কার) যদি থাকে এবং শূদ্র পরিবেষ্টিত যদি থাকি, তবে তাদের এরর (ভূল) রিমুভ (দূর) করে বাঁচার অনুকূল করে নেওয়াই ত হবে আমার ইন্টারেস্ট (স্বার্থ)। পরিবেশকে বাঁচাবাড়ার অনুকূল করতে হবে। এ্যাকটিভলি এডুকেটেড (সক্রিয়ভাবে শিক্ষিত) করতে হবে, যাতে প্রত্যেকের বাঁচাবাড়া পরিপুষ্ট হয়। পারিপার্শ্বিক বাদ দিয়ে বাঁচতে পারি না, একলা স্বর্গ সৃষ্টি করতে পারি না। সে সাহায্য করতে পারে আমার বাঁচাবাড়ায়, তেমন করে নিতে হবে। তা না করে উল্টো যদি তাদের দোষের অনুকরণ করি, তাতে ত সকলেরই ক্ষতি !

উক্ত ভদ্রলোক—আমাদের কথা কে শোনে ? অনেকটা নেতাদের কথা শুনে চলতে হয় নিজেদের মাথা খাটিয়ে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাই করি, পারিপার্শ্বিককে যদি পরিশুদ্ধ না করি সে কাজে বাঁচাতে পারবে না। যে কাজে বাঁচাতে পারবে না তাতে যোগ দেওয়াও পাপ।

ভদ্রলোক বিদায় নিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় কেষ্টদার সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে বললেন—সমাজতন্ত্র বলতেই আমার মনে হয় বর্ণাশ্রম।

কেষ্টদা—পাশ্চাত্য সমাজ অর্থের মানদণ্ডের উপর প্রতিষ্ঠিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বর্ণাশ্রম অর্থের মানদণ্ডের উপর দাঁড়ায় না। দাঁড়ায় ইন্‌ষ্টিংকটিভ লেবার (সহজাত সংস্কারসম্মত শ্রম)-এর উপর, ব্যবহারের

উপর, মানুষের যোগ্যতার উপর। কথাটা বর্ণাশ্রম—ওর মধ্যে শ্রম আছে।

রাত্রে শ্রীশ্রীঠাকুর গোলতাঁবুতে বিশ্রামরত। কান্তিদা (বিশ্বাস) জিজ্ঞাসা করলেন—ত্রিতাপজ্বালা মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক জ্বালা। ইষ্ট নিষ্ঠা আছে, কিন্তু এমনতর আগ্রহ নেই, যাতে তাঁর ইচ্ছা-অনুযায়ী পুরোপুরি চলতে পারি, তাতে একটা জ্বালা হয়, সেইটে আধ্যাত্মিক দুঃখ। শরীরকে যদি পরিচালিত করতে না পারি, মনকে যদি পরিশুদ্ধ করতে না পারি, তাহলেও জ্বালা সেটা আধিভৌতিক জ্বালা। কর্ম্মের ফলে ব্যাগটা চুরি করে নিয়ে গেল। সেটা আধিদৈবিক জ্বালা, যেটার কারণ হিসাবের মধ্যে নেই। আধ্যাত্মিকে গোল হলে সবটায় গোল হয়ে ওঠে। এক কথায় ত্রিতাপ জ্বালা মানে শরীর-মন-আত্মার যাবতীয় ক্লেশ।

কান্তিদা—আত্মা মানে কি চৈতন্য বলা যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আত্মা মানে নিয়ত গমনশীল সত্তা। আর চিৎ মানে চেতনা।

২৫শে ফাল্গুন, বুধবার, ১৩৫৫ (ইং ৯।৩।৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে গোলতাঁবুর পাশে চেয়ারে উপবিষ্ট। অশ্বত্থ গাছে বসে একটা পাখী বড় সুন্দরভাবে ডাকছে। মৃদুমধুর স্নিগ্ধ দখিনা হাওয়া বইছে। শ্রীশ্রীঠাকুর বসন্তের প্রাকৃতিক শোভা দেখছেন আর কান খাড়া করে পাখীর ডাক শুনছেন। প্যারীদা (নন্দী), কালী দা (সেন), উমাদা (বাগচী), বীরেনদা (ভট্টাচার্য্য), অরুণ (জোয়ার্দার) প্রভৃতি অনেকে উপস্থিত।

কালীদা—সব সময়ই যে মানুষ গুরুজনকে ধরে বড় হয়, তা কি ঠিক? নিগমানন্দ স্বামী স্ত্রীকে খুব ভালবাসতেন, তার থেকেই ত তাঁর উন্নতি শুরু হলো!

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে তাঁর সুরতের সম্বেগ ছিল। এবং সুরতের সম্বেগের দরুণ তিনি স্ত্রীকে গভীরভাবে ভালবাসতেন। কিন্তু স্ত্রীকে

ধরেই তাঁর জীবনের উন্নতি ইয়েছে, একথা বলা চলে না। কারণ, তিনি স্ত্রীতেই আবদ্ধ থাকেন নি। তিনি শ্রেয়কে খুঁজেছেন, তাঁকে গ্রহণ করেছেন, তাঁকে কেন্দ্র করেই তাঁর জীবন ভূমায়িত হয়েছে—তা' যতটুকুই হয়ে থাক্। যেখানে মানুষের সত্যিকার উন্নতি কিছু হয়েছে, সেখানে শ্রেয়কে ধরেই হয়েছে, শ্রেয়কে না ধরে হতে পারেনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় বাইরে ইজিচেয়ারে বসে পূজনীয় খেপুদা ( চক্রবর্ত্তী ) এবং কেষ্টদা ( ভট্টাচার্য্য ), ভোলানাথদা ( সরকার ) প্রভৃতির সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন—আমাদের সব কথা পরিষ্কার করে তুলে ধরে জওহরলাল প্রভৃতির সঙ্গে পত্রালাপ করা ভাল, যাতে দেশের উন্নতির জন্য ইষ্ট, ধর্ম্ম, কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের প্রয়োজনীয়তা কী, সে সম্বন্ধে তাঁরা অবহিত হতে পারেন।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মেয়েকে যে সম্পত্তি দেবার ব্যবস্থা করেছে, এমন হওয়া অসম্ভব নয় যে কোন কোন মেয়ে স্বেচ্ছায় বেরিয়ে যাবে এবং আইনের বলে তার স্বনির্বাচিত স্বামী বাড়ীর উপর চড়াও হয়ে বহু অনাচার চালাবে। সেখানে বসে যদি সে হিন্দু ঘরের বিধবার সামনে গরু জবাই দেয়, তাহলেও ত' বলার কিছু থাকবে না। কোন্‌টা যে কতদূর গড়াতে পারে, তার খতিয়ান যদি ইয়াদে না থাকে, তাহলে ত মুস্কিলের কথা। তাই বলি, টাকা জোগাড় করেন। আর ভাবধারাগুলি জনসাধারণের মধ্যে দোয়ারে ছড়ান। তাতে দেশ ফ্লাডেড ( প্লাবিত ) হয়ে যাবে। প্রত্যেকের জীবনের ক্ষুধা, মনের ক্ষুধা, শরীরের ক্ষুধা সবই পূরণ হবে।

২৬শে ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার, ১৩৫৫ (ইং ১০।৩।৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর ভ্রমণান্তে সন্ধ্যায় বড়াল বাংলোর প্রাঙ্গণে ইজিচেয়ারে এসে বসেছেন। শুক্লাদশমী তিথি, চাঁদনী রাত, মৃদুমধুর ফাল্গুনী হাওয়া বইছে, বেশ উপভোগ্য। বহু দাদা এবং মা উপস্থিত আছেন।

আসাম থেকে আগত একটি মা বলছিলেন—আমার ছেলে দীক্ষা নিয়ে প্রথম কিছুদিন করেছিল, এখন কিছু করে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইষ্টভৃতি করাস্। আর তোর পর নেশা জমান দরকার। তোর উপর খুব নেশা হওয়া চাই। তাহলে দুষ্টুমি যতই করুক, পরে ভাল হওয়ার আশা থাকে।

একটু পরে হাউজারম্যানদা ও হেনরি আসলেন। অন্যান্য কথার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এখানে এই সময় পয়জনাস স্নেক্ (বিষাক্ত সাপ), বিছে এইসব খুব বেরোয়। সাবধানে চলাফেরা করো। ...... আচ্ছা তোমাদের কাছে টর্চ্চ আছে ত ?

হাউজারম্যানদা—না!

শ্রীশ্রীঠাকুর—টর্চ্চ নিয়ে চলা ভাল। মৃত্যুর সঙ্গে সব সময় লড়াই করে জীবনকে বাঁচাতে হয়। তাই ওয়েল ইকুইপ্‌ড্ (ভালভাবে প্রস্তুত) থাকাই ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর গোলতাঁবুতে বিছানায় বসে মায়া মাসীমা, সুশীলামা, হেমপ্রভামা ইত্যাদির সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন—জন্ম না হলে নাকি মানুষের উন্নতি হয় না। মানুষ মৃত্যুকালীন ভাব ধরেই নাকি থাকে। তার থেকে উন্নতি চাইলে মানুষ হিসাবে জন্ম নিতে হয়। জন্মাতে হলে প্রথমে যাওয়া লাগবে বেটাছেলের মাথায়, সেখানেও অনেকে আছে। তারপর যাওয়া লাগবে মেয়েলোকের পেটে, সেখানেও পাড়াপাড়ি ব্যাপার। অসংখ্য শুক্রকীটের মধ্যে মাত্র একটাকে গ্রহণ করবে, তাও সব সময় নয়। কতবার কত জায়গায় ঘুরে যে জন্ম পেতে হয়! ও অবস্থায়ও একটা শরীর থাকে, তাকে কত কষ্ট পেতে হয়। সেই কষ্ট বোধহয় স্মরণ থাকে। তাই মানুষ বোধহয় মরতে চায় না।

সুশীলামা—তখন কি মন থাকে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—শরীর যখন থাকে, তখন মন থাকে।

হেমপ্রভামা—মানুষ কি মরে মানুষই হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সধারণত হয়, তবে আবার অন্যরকমও হয়, যেমন জড়ভরত হরিণ হয়েছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর মাসিমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—ভগবান পাওয়া কাকে বলে জান ত ?

মাসিমা—তুমি বল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যতখানি তাঁর হই ততখানি তাঁকে পাই। ভগবৎ প্রাপ্তি হলে তার জলুষ ফুটে ওঠে। ভগবদ্ভাতি ফুটে ওঠে চরিত্রে। প্রাপ্তির জীবন যাদের তাদের রিফ্লেক্‌স্ ( প্রতিবর্ত ) থাকে। ভালমন্দ, সুখ দুঃখ সবই তাদের থাকে, কিন্তু কোনটায় তারা আবদ্ধ হয় না। সবটার উপরে থাকতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর মাসিমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—ভাগবতে বিয়ে থাওয়ার কথা আছে ?

মাসিমা—হ্যাঁ, তুমি যেমন বল, তেমনি অনুলোম প্রভৃতির কথা আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অনুলোম হলে জন্মটা উঁচুই হতে থাকে। সমাজও উঁচু হতে থাকে। প্রতিলোমে নীচু জন্ম পায়। সমাজও নীচু হতে থাকে।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সাধনা, ভেক্লু ওদের প্রাপ্তির মতই জীবন ছিল। ওদের শিখাল কে ? অথচ এমন চলনচরিত্র পেল কোথা থেকে ? মানুষের পোঁদ ঘ'সে ঘসে হয় না। আর, ওরা জন্ম থেকেই অমন ভাব পেল কোথায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর এইবার মাসিমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—মরে গেলেও যে থাকে, তা কি বুঝতে পার ?

মাসিমা—আমার ত মনে হয় থাকে।...তুমি ভাল করে বল, বুঝিয়ে দাও।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ থাকে। ফুরিয়ে যায় না।

সুশীলামা—মরে গেলে ত স্থূল দেই পুড়িয়ে ফেলে দেয়, তারপরে তাকে দেখা যায় কিভাবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তখনও ত একটা দেহ থাকে, সেটা সূক্ষ্ম। আমিও বোধ করতে পারি আমার সূক্ষ্ম দেহ দিয়ে। মানুষ যে স্বপ্ন দেখে, তার পিছনেও একটা সত্য থাকতে পারে।

সুশীলামা—স্পর্শের বোধ পর্য্যন্ত কেমন করে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বোধটা হয়ত মনে।

শৈলেশদা (ব্যানার্জ্জী)—জন্ম যতদিন হয় না, ততদিনই বোধহয় স্পিরিটটা ঐভাবে আসতে পারে। জন্মালে বোধহয় পারে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—স্পিরিটটা সবসময়ই আসতে পারে, জন্মেও পারে, না জন্মেও পারে।

প্রফুল্ল—সেটা একদেহে আসলে, সেখানে থেকে যায় কি করে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি যেমন স্বপ্নে দিল্লী ঘুরে আসলে। তোমার মনোময় দেহ হয়ত বাস্তবই সেখানে গেল। ওর সঙ্গে তথ্যের একটা মিল থাকতে পারে। আর একজনও হয়ত সেইটে বোধ করল সেইসময়। মানস দেহের পক্ষে ত দিল্লী দেওঘর দূর নয়। যেমন রেডিওতে কলকাতার এইমুহূর্তের কথা এখনই এখানে ব'সে শোনা যায়।

সুশীলামা—আচ্ছা, অনেকে বাড়িতে মরলে খুব কাঁদে, অনেক বাড়িতে বেশী কাঁদে না। যা' ব্যবস্থা করার করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কারও হয়ত ব্যথা প্রধান। কারও বোধ প্রধান। বোধের মধ্যেও ব্যথা থাকে—ভাবে কেঁদে করবনে কী? আবার হয়ত মমতাও কম থাকতে পারে।

সুশীলামা—এখানে কিছু করলে কি বিগত আত্মার কাছে পৌঁছায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—শ্রাদ্ধ। শ্রদ্ধায় দানের কথা বলে।

সুশীলামা—আমার ওগুলিতে আবার তত বিশ্বাস হয় না। ভাবি সে যে ভাব নিয়ে গেছে, তাই নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, দান করলে কী হবে? আর কোন পথ নেই?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আর এক রাস্তা ভগবানের কাছে প্রার্থনা।

২৭শে ফাল্গুন, শুক্রবার, ১৩৫৫ (ইং ১১।৩।৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে তাঁবুর পাশে ছায়ার মধ্যে ইজিচেয়ারে উপবিষ্ট। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), শৈলেশদা (ব্যানার্জী), প্যারীদা (নন্দী), কালীদা (সেন), যামিনীবাবু (সিংহ) প্রভৃতি উপস্থিত।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর যামিনীবাবুকে বললেন—আমি বলি সুস্থ থাকুন, সুদীর্ঘজীবী হন আর আমার ইনস্টিটিউশন ( প্রতিষ্ঠান ) যেমন ছিল, তেমনি আবার করে দিন খেটেপিটে।

সুস্থ থাকার প্রধান জিনিষ হলো সদাচার পালন। আপনি যে যেখানে সেখানে খান না সেটা খুব ভাল। কোথায় থেকে কোন ব্যাকেটরিয়া ঢোকে ঠিক কি ? আর, সদাচার মানে শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক সদাচার, যাতে শরীর, মন, আত্মা তিনই অক্ষুন্ন থাকে।

যামিনীবাবু—আচ্ছা স্থানমাহাত্ম্য আছে না ? যেমন পাহাড়ের কাছে, কি সমুদ্রের কাছে, কি বিরাটের সংস্পর্শে ? যেখানে গেলে আপনা আপনি মনের পরিবর্তন হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, আমার ওখানে পদ্মার কাছে আশ্রম ছিল। পদ্মার দিকে চেয়ে কথা বেশী বলতে পারতাম না। মনের তরঙ্গ যেন স্তব্ধ হয়ে আসত। কথা বলতে গেলে পদ্মার দিকে পিছন ফিরে বলতে হতো। ঐরকম প্রভাব।

যামিনীবাবু—মনের দুর্ব্বলতা ত খুব খারাপ জিনিষ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মনের দুর্ব্বলতা খারাপ। কিন্তু আছেই। প্রবৃত্তি-অভিভূতি থাকে বলেই মন দুর্ব্বল হয়। আর্জ (আকূতি) যার যত বেশী তার দুর্ব্বলতা তত কম।

যামিনীবাবু—মনের চাঞ্চল্য ত যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মনের চাঞ্চল্য বরাবরই থাকে, কিন্তু মানুষের মন যত কেন্দ্রায়িত হয়, এ্যাডযাস্টেড ( নিয়ন্ত্রিত ) হয়, ইনটিগ্রেটেড (সংহত) হয়, তত মিনিংফুল এ্যাডযাস্টমেণ্ট ( সার্থক বিন্যাস ) হয়, প্যারসোনালিটি ( ব্যক্তিত্ব ) গ্রো করে ( গজায় )। এসবের বেসিস (ভিত্তি) হলো তাঁতে ভক্তি। ভক্তিতে মন স্থির হয়। আমি অদ্বৈতবাদীই হই, জ্ঞানবাদীই হই, সাংখ্যযোগীই হই, ভক্তি ছাড়া উপায় নেই। তাঁর প্রতি টান যখন প্রবৃত্তি টানের চাইতে বড় হয়, তখনই প্রকৃত কাজ হয়। ভক্তি ছাড়া পথ নেই। তাই আছে—'অদ্বৈতং ত্রিষুলোকেষু, নাদ্বৈতং গুরুণা সহ।'

যামিনীবাবু—মুক্তি কিসে হবে বলুন ত!

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওই হলো মুক্তি, মুক্তি থাকে বৃত্তিভেদী ভক্তির কোলেই। ভক্তিতে চতুর্ব্বর্গ ফল দাসীর মত মানুষকে অনুসরণ করে। ওতে একটা ভালবাসাময় জীবন গড়ে ওঠে। মানুষও জ্ঞানদীপ্ত হয়ে ওঠে তা দিয়ে। পরিবেশ শুদ্ধ মুক্তির দিকে চলে তার সান্নিধ্যে।

যামিনীবাবু—ঠিক ধারণা হয় না, যেমন পলিটিক্স্ করতে সত্য মিথ্যা সব লাগে। এসবের সামঞ্জস্য কোথায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাদের গোড়ায় ঐ কেন্দ্রায়িত টান নেই, যাদের অখণ্ড ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় নি, তারা পলিটিক্স্ও করতে পারে না। পলিটিক্স্-এর মধ্যে আছে পূরণ, বাঁচা বাড়ার পূরণ, তাকেই বলে ধর্ম্ম। যাদের আদর্শানুরাগ আছে, তারা পালিটিকস-এর মধ্যে ধর্ম্মই করে—সবকিছুর ভিতর দিয়ে মানুষের বাঁচা বাড়ার ব্যবস্থা করে, যা দিয়ে অস্তিত্বের পরিপোষণ হয়, তাকে মিথ্যা বলা যায় না, তা সত্যই।

যামিনীবাবু—নিঃস্বার্থ দান ও জনস্বার্থসেবা ত দেখা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শিবাজী রামদাসের শিষ্য, লেখাপড়া জানে না। বেপরোয়া যুবক। কিন্তু রামদাসের প্রতি ছিল তার হাড়ভাঙ্গা টান। তাঁর খুশির জন্য পরিশ্রম করত অসম্ভব। কিন্তু এত পরিশ্রমেও ক্লান্ত নয়। রামদাসের কথাগুলি যেন সে গিলত। সম্বল তার ঐ টান। রামদাস শিবাজীর উপর রীতিমত কঠোর ছিলেন। খুব শাসন করতেন। এই শিবাজীই হলো ছত্রপতি শিবাজী, সম্রাট শিবাজী। সম্রাট হয়ে দানপত্র করে দিল সব গুরুর নামে তারপর ভিক্ষার ঝোলা নিয়ে গুরুর পিছে পিছে চলল। নদীর ধারে গিয়ে পাক করল। গুরুর প্রসাদ খেল। গুরুর কাছে কথা কওয়ার ক্ষমতা ছিল না। যে-শিবাজীর তরবারি কত রামদাসকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলতে পারত, সেই শিবাজী তাঁর কাছে ভয়ে কাঁপত। রামদাস তাকে বললেন—তুই আমার প্রতিনিধি হয়ে শাসন করবি। গেরুয়া পতাকাকে প্রতীক করে রাজ্য চালাবি। প্রজা-সাধারণের কারও যেন এতটুকু কষ্ট না হয়। সে তখন কেঁদে ফেলে তাই শিরোধার্য্য

করে নিল। এহেন শিবাজী আপনাদের দেশের রাজ্যেশ্বর। তার যে গ্রহণ তা গ্রহণ নয়। ওকে স্বার্থ কয় না। ও হলো গুরুপূজা। অমনটা হলেই পারে। অতোখানি আত্মসমর্পণ না হলে নিঃস্বার্থ হওয়া যায় না।

যামিনীবাবু—স্বার্থের জন্য, আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য দান খুব দেখা যায়। বিড়লা ইত্যাদি কত করছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেইজন্য ও দানের প্রতিষ্ঠা নেই। বিড়লা যে এত দান করছেন, কিন্তু মানুষের মনের মধ্যে তিনি স্থান পাচ্ছেন কমই।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে গোলতাঁবুতে বসে কর্ম্মীদের মাসোহারা নেওয়ার অপকারিতা সম্বন্ধে বলছিলেন।

প্রবোধদা—ওটা উঠিয়ে দিলেই ত হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমিই ত কাত হবে আগে।

প্রবোধদা—কাত হয়ে সংগ্রাম করে আবার সোজা হয়ে দাঁড়াতে হয়ত পারব। আর যদি নাই পারি, আমার মত কয়েকজন না হয় গেলামই। যোগ্যব্যক্তি অবশ্যই আসবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার চাইতে যোগ্য হওয়ার চেষ্টা করাইত ভাল। প্রলোভনের শিষ্য হলে আলাদা কথা। কিন্তু ইষ্টের আশ্রিত হলে তাঁর কথা, তাঁর চাহিদা, তাঁর চরিত্র কিছুটা মূর্ত্ত হবেই তার মধ্যে।

কাশীদা (রায়চৌধুরী)—ইষ্ট সম্বন্ধে কিছুটা স্বার্থান্বিত হওয়া সত্ত্বেও কর্ম্মীরা পরস্পর স্বার্থান্বিত হয় না কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অতোটুকু ফাঁক।

কাশীদা—প্রত্যেকে নিজে হয়ত আপনার কাজ করতে চায়, কিন্তু পরস্পর সাহায্য করে না কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে অহং-এ স্বার্থান্বিত।

২৮শে ফাল্গুন, শনিবার, ১৩৫৫ (ইং ১২।৩।৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে তাঁবুর পাশে ছায়ায় ইজিচেয়ারে সুখাসীন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), উমাদা (বাগচী), বীরেনদা (ভট্টাচার্য্য), সুরেনদা (বিশ্বাস) প্রভৃতি উপস্থিত।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ভাব মানে চিন্তা নয়। ভাব কি রকম! আমার যেমন রামকৃষ্ণঠাকুরের প্রতি ভাব হ'লো। তার মানে তাঁর গুণগুলি আমি অনুরাগের সঙ্গে ভাবছি এবং সেগুলি আমার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী আমার চরিত্রে মূর্ত্ত করে তুলছি, তাকেই বলে তাঁর প্রতি ভাব হওয়া।

প্রফুল্ল—নেহাৎ জৈবপ্রয়োজনের জন্য ইষ্টের কাছ থেকে যদি কেউ কিছু গ্রহণ করে, সেটা কে কি অর্থের প্রলোভন বলা যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের জীবনের একটা ক্ষুধা থাকে। সেই ক্ষুধায় করা অর্থাৎ যাঁকে ভালবাসে, তাঁর পরিপূরণের জন্য কাজ করা, আর এই কাজ কর, এতটাকা পাবে, সেই আশায় করা—এই দুটো করা আলাদা। টাকার জন্য কাজ করলে মানুষ টাকা-কেন্দ্রিক হয়। নিঃশর্ত ভালবাসার দান গ্রহণ অবশ্য অন্য জিনিষ। আগেরকার দিনে মানুষ গুরুগৃহে থাকত, ভিক্ষা করে এনে গুরুকে খাওয়াত, গুরুকে খাইয়ে তাঁর প্রসাদ গ্রহণ করত। মা যেমন সন্তানের সেবা করে, তার মধ্যে কোন প্রলোভন নেই, কিন্তু কেবল লোভের বশবর্ত্তী হয়ে থাকলে অন্যরকম হয়ে যায়। শুচিতা থাকে না। কাজ কর বলে টাকা পাও, এটা যদি হয়, তবে টাকার জন্য কাজ করছ—এমনতর হয়। টাকার সঙ্গে কাজের সম্পর্ক হয়ে দাঁড়ায়। তোমাকে যদি বলা হয় ১৫০ টাকা পাবে, খাতা লেখ, তাহলে ১৫০ টাকার জন্যই তোমার খাতা লেখাটা হয়ে দাঁড়ায়। টাকার উপর কাজটা dependent (নির্ভরশীল) হয়। কিন্তু তুমি কিছু পাও আর নাই পাও সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে, এই কাজ না করে পার না বলে যদি নিজের আগ্রহে, অন্তরের টানে সেরাবুদ্ধি থেকে অর্থাৎ তোমার ইষ্টের পরিপূরণ, পরিপোষণ ও পরিরক্ষণের ইচ্ছা থেকে এই কাজ কর—উপচয়ে,—তবেই ঠিক ঠিক কাজ করা হয়। মুখ্যতঃ ঐ আবেগ নিয়ে profitably (লাভজনকভাবে) কাজ করলে নিজ প্রয়োজনপূরণও বাকী থাকে না। উপচে যায়, ভরে যায়, সেটা প্রসাদ হয়। তাতে সহ্য, ধৈর্য্য, উৎসাহ ও অধ্যবসায় থাকে অক্ষত, কৃতজ্ঞতা হয়ে ওঠে স্ফূর্ত ও উচ্ছল। দাবী দাওয়ার কোন বালাই থাকে না।

শৈলেশদা ( ব্যানার্জি )—ইষ্টের কাজ করলে ত মানুষ পড়তে পারে না। বেড়েই ওঠে। কিন্তু অনেকে বলে—"যে করে আমার আশ, তার করি সর্বনাশ"—সে কথা কি ঠিক ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে ইষ্টার্থে কাজ করে, তার ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ আপনিই আসে। আমার মনে হয়—

যে করে আমার আশ
তার কাটে বৃত্তি ফাঁস—

এই হল ঠিক কথা।

কালীদা—কোন গুরু যদি ভোগবিলাসী হন, তাঁকে দেখে মানুষের কি হবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—গুরু মানে সদ্গুরু অর্থাৎ ব্রহ্মবিৎ। জনকঋষি যেমন ছিলেন। কত মুনি-ঋষি তাঁর কাছে যেতেন আত্মোন্নয়নের জন্য। তাঁর কাছে যাঁরা যেতেন, তাঁদের উপকার বই অপকার হত না। তুমি ল্যাংটা হয়ে থাকলেই যে তোমার বৃত্তি কাটল, কিম্বা সার্ট গায় দিলে যে বিলাসিতা হল, তা নয়। প্রকৃত সাধুরা নোংরাও হন না, বিলাসীও হন না। তাঁরা একটা সহজভাবে চলেন। প্রয়োজনের অতিরিক্তের ধার ধারেন না তাঁরা, আবার প্রয়োজনকেও উপেক্ষা করেন না।

কালীদা—বৃত্তিফাঁস কাটে কি করে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বৃত্তিফাঁস মানে ওর মধ্যে আটকে থাকি। ও ছাড়া আর কিছু বুঝি না। তা adjusted ( নিয়ন্ত্রিত ) হয় গুরুর প্রতি টানে।

কালীদা—গুরুভক্ত যে তার ভোগের আকাঙ্খা যায় কি করে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সত্তার বিরোধী যে ভোগ, তা সে করে না। ভাবে মারা পড়ব। ত্যাগ ফ্যাগ কেউ কিছু করে না। সত্তার বিরোধী যা তা নিজের স্বার্থেই বাদ দেয়।

কালীদা—একজন ত্যাগী লোক যদি ৫০ টাকার একটা জামা পরে, তারও ত অহঙ্কার হতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে ভাবে যে অতো দামী জামার প্রয়োজন কী! তাই তা বাদ দিয়ে চলে। প্রয়োজন হলে পরেও। মানুষের মতামত তার চলনার নিয়ামক নয়।

শৈলেশদা—গিরীশবাবুর বকলমা জিনিষটা কী? কেমন করে সম্ভব হলো?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার adherence ( নিষ্ঠা )-টাই তাকে অমন করে adjust ( নিয়ন্ত্রণ ) করেছিল। ওই adherence ( নিষ্ঠা )-টাই আদত জিনিষ। তাতে আর তোমাতে তফাৎ এই যে, তার যতখানি adherence (নিষ্ঠা) আছে, তোমার তা নেই। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন—তোমারও অনেক জন্ম গত হয়েছে, আমারও অনেক জন্ম গত হয়েছে, তোমাতে আমাতে প্রভেদ এই যে আমি সেগুলি জানি, কিন্তু তুমি জান না।

কালীদা—শত্রুভাবে সাধন নাকি তাড়াতাড়ি সফল হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি বুঝি না। শত্রুতার মধ্যে আছে পতন, পাতন, ছেদন। তার মানে ঐ দিকেই গতি হয়।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর বারান্দায় এসে বসলেন। তাঁকে কাগজ পড়ে শোনান হল। তারপর প্যারীদা জিজ্ঞাসা করলেন—প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল ত ভোগ করতে হয়, কিন্তু এ জীবনেই কি তা কাটে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—শুধু ত প্রারব্ধের ফল আমরা ভূগি না, বর্তমানের কর্মফলও ভূগি। প্রারব্ধ কর্মফল সঞ্চিত হয়ে থাকে, প্রবণতা হিসাবে। সেইটে আমার বর্তমানের কাজ প্রভাবিত করে, এইভাবে গড়িয়ে চলে। এই নিয়ে চলে জীবন। তার ফলে আসে সুখদুঃখভোগ। নিয়তির মধ্যে আবার আছে পারিপার্শ্বিক। যার আকূতি ও নিয়ন্ত্রণ যত বেশি, সে আবার পারিপার্শ্বিককে ততখানি নিয়ন্ত্রণ করে অনুকূল ক'রে তুলতে পারে। অবশ্য পরিবেশ যদি আদৌ সহযোগিতা না করে, সেখানে সে অপারগ। মানুষ ইচ্ছা করলে অনুশীলন ক'রে এই জীবনেই তার প্রবৃত্তি-প্রবণতা বদলাতে পারে। মানুষ প্রারব্ধের উপর জয়ী হয় তখনই যখনই ইষ্টের পরে টান প্রবৃত্তির টানের থেকে বেশি হয়। ইষ্টের প্রতি যার সুরতের আকূতি থাকে জোর, তার প্রবৃত্তির উপর আধিপত্য হয়। সে কোন

প্রবৃত্তির অধীন হয়ে—'ও যা!' বলে আপশোষ করে না। পরিবেশের উপরও তার আধিপত্য হয়।

প্রফুল্ল—দেশ ভাগ কেন হলো? সকলের কি এক পাপ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাই না? তোমরা করেছ কী, যে এটা হবে না?

ননীমা—ভগবানের বিষয় সম্পত্তি নষ্ট হবে কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাঁর বিষয় সম্পত্তি মানে ত আমরা। তাঁতে বিষয় সম্পত্তি আছে। কিন্তু বিষয়-সম্পত্তিতে তিনি নাই।

ননীমা—ন্যায়পথে কষ্ট পায়, অন্যায়পথে উন্নতি হয় কেন? ন্যায়পথে চলে অভাব কষ্ট ছাড়ে না কেন? সামান্য প্রয়োজনটুকু মেটে না কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিকারের ঠেলায় সাময়িক ঠেলে ওঠে। ওরা ঐশ্বর্য্য-কামী হয়ে ঐশ্বর্য্য আহরণ করে তাই হয়। আর এরা ঐশ্বর্য্য চায় না। তাই হয় না, এমনিতেই যতটুকু হবার হয়। তোমাদের বিষয় হয়েও বিষয়ী হও না, ওদের বিষয় হয়ে বিষয়ী হয়। আগেকার অভাব আর এ অভাবে তফাৎ আছে। কিছু না থাকলেও, এখন তাতে ক্লিষ্ট করে তোলে না। তখন থেকেও ক্লেশের ভাব যেত না। অভাববোধ পীড়াও দে এখন কম। হয়ত কাপড় ছিঁড়ে গেছে, কাপড়ের অভাবের কথা সব সময়ে তোমার মনকে ভাবিত করে রাখে না। যখন নিতান্ত অচল অবস্থা হয়, সেই সময় কোনভাবে জোগার করে নাও। দেখ পরমপিতার দয়ায় তোমাদের জুটেও যায়। দিন চলে যায় একভাবে। পাকিস্তানে সব হারিয়ে কতজনে একেবারে ধ্বংস হয়ে গেছে। তোমরা তা হওনি। এখনও সোজা দাঁড়িয়ে আছ।

বেলা ১১ টা ৫০ মিনিটে শ্রীশ্রীঠাকুর নিম্নলিখিত বাণীটি দিলেন—
বৃত্তির খাতিরে যারা ভালবাসে, তোয়াজের একটু খাঁকতিতেই অসন্তুষ্ট হয় বা বিগড়ে যায় তারা।

বাণীটি দেবার পর শ্রীশ্রীঠাকুর ভিতরের দিকের জলভরা চৌবাচ্চায় স্নান করতে গেলেন।

রাঙ্গামা বললেন—টান ত দেখা যায় না, প্রত্যেকেই ত তোয়াজ না পেলে বিগড়ে যায়।

মঙ্গলামা—প্রকৃত টানওয়ালা একজন বেঁচে থাকলেও ত হয়, অন্যলোক থাকায় লাভ কী !

রাঙ্গামা—একজন বাঁচায় কী লাভ—আমরা পাঁচজনে বাঁচতে যদি না পারি !

শ্রীশ্রীঠাকুর—ব্যাপারটা হল গিয়ে নিজেকে ধরে ফেলা। নিজেকে ধরে ফেলতে পারলেই adjusted ( নিয়ন্ত্রিত ) হয়ে যায়।

রাঙ্গামা—আমি একা ভাল হয়ে বেঁচে লাভ কী ? যদি অন্যকে ভালভাবে বাঁচান না যায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভালভাবে বাঁচাতে পারা যায় কাকে ? যে ভগবানে অনুরক্ত তাকে। নতুবা ভগবান একদিনেই সকলকে ঐভাবে বাঁচাতে পারতেন।

ভোগের পর শ্রীশ্রীঠাকুর প্রফুল্ল কে বললেন—এ সবগুলি দিচ্ছি, যাতে প্রত্যেকে নিজেকে চিনতে পারে। মানুষকে চিনতে পারে।

প্রফুল্ল—এগুলি আত্মবিশ্লেষণের সহায়ক।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মসংশোধনেই ত জিনিষ। আমরা যে কেবল পর-বিশ্লেষণ করি। যার আত্মবিশ্লেষণ থাকে, সে নিজেকে শুধরে নিতে পারে।

ভোলানাথদা (সরকার) আসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—উদ্দেশ্য ও আদর্শের জন্য আত্মোৎসর্গ যাদের স্বতঃ—এমনতর অন্তত ১১ জন কর্মী সত্বর প্রয়োজন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে বড়াল-বাংলোর প্রাঙ্গণে ইজিচেয়ারে বসে কেষ্টদাকে বলছিলেন—পঞ্চবর্হি ও সপ্তার্চ্চির মত অমন allround ( সর্বতোমুখী ) জিনিষ আর হয় না। বর্ণাশ্রমটা হল materialised emancipation ( বাস্তবায়িত মুক্তি )।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে বেড়াতে বেরিয়ে পূজনীয় বাদলদার বাড়িতে আসলেন। পূজনীয় খেপুদা, বড়দা এবং কেষ্টদা ( ভট্টাচার্য্য ), বীরেনদা (ভট্টাচার্য্য), বিজয়দা (রায়) প্রভৃতি সঙ্গে ছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বাদলদার বাড়িতে এসে বাইরে একখানি চেয়ারে বসলেন।

কেষ্টদা Mill-এর Essay on Human Understanding, নাস্তিক্যবাদ, কম্যুনিজম্ ইত্যাদি সম্বন্ধে কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নাস্তিক্যবাদের মানে আমি বুঝি না। আমি আছি তাই কার্য্যকারণ সম্পর্কে অনেক কিছুর অস্তিত্বের সঙ্গে আমি জড়ান। ঈশ্বর হলেন সেই পরম অস্তিত্ব, যা সব কিছু অস্তিত্বের উৎস। সেই পরম

অস্তিত্বকে না মানলে প্রবৃত্তিগুলি বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়, জ্ঞান সুবিন্যস্ত হয় না, বোধ একসূত্রসঙ্গত হয় না। বিভিন্ন বিষয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক কী, সত্তা ও প্রবৃত্তিগুলির সম্বন্ধ কী, তা পরিষ্কার বোঝা যায় না। আসে শিশ্নোদর-পরায়ণতার দাসত্ব। বোঝে না যে যৌন সম্বেগ ও ক্ষুধার অস্তিত্ব আছে মানুষের অস্তিত্বকে পুষ্ট করার জন্য। আমি যদি বাদ পড়ি, আমার অস্তিত্ব যদি বাদ পড়ে, তবে উপভোগ দাঁড়ায় কোথায়? ঈশ্বর-আনতি বাদ দিলে প্রবৃত্তি-আনতি প্রবল হয় ও তা শেষপর্যন্ত সত্তাক্ষয়ী হয়ে ওঠে।

কেষ্টদা—জীবজন্তুর যদি ঈশ্বরের প্রয়োজন না হয়, তবে মানুষের প্রয়োজন হবে কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওদের মধ্যে যে Conception of existence (অস্তিত্ব সম্বন্ধীয় ধারণা) আছে তাতেই চলে যায়। মানুষ সব সময় চায় উন্নততর ও সূক্ষ্মতর বিন্যাস, তার জন্যই এটা বিশেষ করে দরকার। অবশ্য পশুদের মধ্যে এ আকূতি যে আদৌ নেই, তা বলা চলে না। তা না থাকলে তাদের বিবর্তন হয় কি করে? তাই, ওদের মধ্যেও ওদের মত করে হয়ত আস্তিক্যবুদ্ধি আছে, যা আমরা ধরতে পারি না।

কেষ্টদা—ধর্মের সঙ্গে সম্পর্ক নেই, এমনতর হাজারো রকমের দর্শন থেকে আজগবী সব বাদের সৃষ্টি হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্ক নেই, এমনতর সব দর্শন বা বাদ দিয়ে কী হবে?

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর ওখান থেকে এসে রাত্রে বড়াল বাংলোর মাঠে জ্যোৎস্নার মধ্যে ইজিচেয়ারে বসলেন। মণিমামা (ভট্টাচার্য্য), শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), সতীশদা (দাস), নরেনদা (মিত্র), দেবেনদা (রায়), সুধীরদা (দাস), নীরদদা (মজুমদার) প্রভৃতি কাছে ছিলেন।

কথাপ্রসঙ্গে মণিমামা বললেন—৭০০ বছরের মুসলমান রাজত্বে যা ক্ষতি না করেছে, ২০০ বছরের ইংরেজ রাজত্বে, তার চাইতে বেশি ক্ষতি হয়েছে। আমাদের যা কিছু সব খারাপ, আমরা আজ এমনতর ভাবতে শিখেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের কৃষ্টি কী, আমরা কী, তাই আমরা বুঝি না। Conception (ধারণা)-ই নেই। তাই নানা ism (বাদ) শিকড় গাড়ছে।

এরপর হাউজারম্যানদা আসলেন। উইলিয়াম জেমস্-এর পৌত্র ড্যানিয়েল জেমস্ শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্য বড় দিনের উপহার হিসাবে মধু পাঠিয়েছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সেই কথা বললেন এবং জেমস্-এর কাছে ভাল

করে চিঠি লিখে দিতে বললেন। বললেন—It is honey of heart (এটা হৃদয়ের মধু), সেই জন্য আমার এ ভাল লাগে। এমন করে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে পত্রালাপ করতে হয়, যাতে তোমার প্রতি তাদের শ্রদ্ধা হয়।

পরে বললেন—জেম্স্-এর লেখা কি আজকাল পড়ান হয়?

হাউজারম্যানদা—Philosophy (দর্শন), Psychology (মনোবিজ্ঞান) ইত্যাদি যারা পড়ে তাদের পাঠ্য হিসাবে পড়ান হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কিছু Science (বিজ্ঞান) ও সঙ্গে পড়া ভাল। Science (বিজ্ঞান)-এর ভিতর দিয়ে Philosophy (দর্শন) ভাল করে উপলব্ধি করতে পারে। Science (বিজ্ঞান) হলো Systematised—knowledge of matter and through matter (বস্তুর মাধ্যমে প্রাপ্ত বস্তুসম্বন্ধীয় বিধিবদ্ধ জ্ঞান), যার ভিতর দিয়ে কার্য্যকারণপরম্পরা অনুধাবন করা যায়। Real philosophy is the science of all sciences, that goads one both analytically and synthetically to the final cause of things i.e. the absolute. (প্রকৃতদর্শন হলো সমস্ত বিজ্ঞানের বিজ্ঞান, যা কিনা বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ-সহকারে মানুষকে বস্তুর চরম কারণ অর্থাৎ অখণ্ডের দিকে চালিত করে)।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে গোল তাঁবুতে এসে বসেছেন। উমাদা (বাগচী), কাশীদা (রায়চৌধুরী), হরিদাসদা (সিংহ), রাঙ্গামা, ননীমা, বোনামা প্রভৃতি আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সুনিয়ন্ত্রিত বহু বিবাহের ফলে মেয়েরা উঁচুঘরে পড়ে এবং তাতে প্রজননও ভাল হয়। আবার বহুবিবাহ না থাকলে প্রতিলোম হতে পারে এবং তাতে কৃষ্টিঘাতী মতবাদের আমদানী বেশি হতে পারে।

পরে কথাপ্রসঙ্গে রাঙ্গামা বললেন—আজকাল সর্বত্রই একতার অভাব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Common Ideal (অভিন্ন আদর্শ) না থাকায় অনৈক্য আজ প্রবল। মুসলমানদের অন্য দোষত্রুটি থাকা সত্ত্বেও ঐটে অর্থাৎ এককে মানা আছে।

—:০:—